পূর্ব ভারত
(PURVA BHARAT)
মানুষ ও সংস্কৃতি
ISSN 2319-8591

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ১ জুলাই, ২০২৪

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

যোগাযোগের ঠিকানা

ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,

পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

ইমেল- eastindiansocietyapd@gmail.com

Website : https:\\eastindiansociety.org

দূরভাষ: - 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক),

9434494655 (সহ সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

পূর্ব ভারত

Copyright 2023 ©
All Rights Reserved by
East Indian Society for the Studies of Social Sciences.

The "East Indian Society for the Studies of Social Sciences" was established more than a decade ago; and its official journey was flagged off on the 5th of April, 2011, when it was registered under the societies Registration Act (West Bengal XXVI, 1961) with the Reg. No. S/1L/ 79269 (2011-2012) of the Government of West Bengal. It is a Non-Government and nonprofit organization pledged to carry on the mission of research in social sciences with India in general and Eastern-India in particular as the main theme in its objective of interdisciplinary explorations. As a part of multi-faceted social activities of the society, two biannual peer reviewed Journals namely "East Indian Journal of Social Sciences" (in English language) & "Purva Bharat" (Manus O Sanskriti) in Bengali Language with ISSN are being published regularly. Seminars and debates on significant topics are held as many times as financially possible in a year.

পূর্ব ভারত

(PURVA BHARAT)

মানুষ ও সংস্কৃতি

(ISSN 2319-8591)

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গবেষণা পত্রিকার কোন প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশের কোনরূপ পুনঃপ্রকাশ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকাশক
ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস
গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)
শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

প্রকাশ কাল ডিসেম্বর, ২০২২
©ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রচ্ছদ
স্বাধীন ঝা

মূদ্রণ
বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন
৯৪৩৪৬৩৩০০৫

সংগ্রহ মূল্য
ব্যক্তিগত (বার্ষিক) ৭০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)
প্রতিষ্ঠান (বার্ষিক) ১১০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)

প্রাপ্তিস্থানঃ ড. সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২
দূরভাষ: - 9434630784(সভাপতি),7407018862(সম্পাদক),
9434494655(সহ সম্পাদক), 9733134588(কর্মসমিতি সদস্য)

পূর্ব ভারত

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

কার্য নির্বাহী সমিতি

সভাপতি
ড. সুলেখা পন্ডিত

সহ-সভাপতি
পুষ্পজিৎ সরকার

সম্পাদক
সুজয় দেবনাথ

সহকারী সম্পাদক
জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ
অনুপ রঞ্জন দে
কৌশিক চক্রবর্তী

মুখ্য সম্পাদক
ড. সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সহযোগী সম্পাদক

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

ড. অখিল সরকার,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ , নদীয়া

ড. সুভাষ সিংহ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

পরীক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর (ড.) দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
পূর্বতন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় , পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) রূপ কুমার বর্মণ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মাধবচন্দ্র অধিকারী
পূর্বতন ডিন কলা অনুষদ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) কার্তিক চন্দ্র সুত্রধর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মনোশান্ত বিশ্বাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) পলাশ মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) সোমদত্তা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) শ্রাবণী ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

সম্পাদকীয়

জুলাই-আগস্টের মেঘলা আকাশের নীচে, বৃষ্টিভেজা দিনে, সবুজ প্রকৃতির কোলে এই গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও, সে বিষয়ে তৎপরতার সদিচ্ছা সাফল্য লাভ করেনি। সম্পাদনার কাজ সহজ সরল থাকে না বিভিন্ন কারণে। উপযুক্ত প্রবন্ধের প্রাপ্তি ও নির্বাচন কঠিন। যাইহোক, সবকিছুর উত্তরণ ঘটিয়ে আবার 'পূর্ব ভারত', ৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পাঠকদের হাতে। সে কারণে সম্পাদকমন্ডলীর মাননীয় সদস্যদের সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে স্বাধীন ঝাঁ সর্বতোভাবে স্বমেধাশ্রম নিয়োজিত করে পত্রিকার শেষ পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করেছেন।

আবারও সকল আগ্রহী গবেষকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রইল এই পত্রিকায় লেখার বিষয়বস্তু যথাসম্ভব পূর্ব-ভারত এবং ন্যূনকল্পে ভারতকেন্দ্রিক রাখার জন্যে। আমাদের লক্ষ্য এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মানুষ, নৃতাত্ত্বিক বিভিন্নতা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা। পূর্ব ভারতের মানুষ হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের আদি ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা-কেন্দ্রিক প্রবন্ধ বেশি গুরুত্ব পাবে আগামী সংখ্যায়। অরুণাচল থেকে মেঘালয় এবং ডুয়ার্স -এই বিশাল অঞ্চল বহু জনজাতির বাসভূমি। পরবর্তী সংখ্যায় সে বিষয়ে উপযুক্ত রচনা সমাদৃত হবে। অজানিত ইতিহাস সকল সময় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। প্রত্নপ্রমাণিত কিংবা প্রাচীন গ্রন্থ-প্রমাণিত রচনা পরিগৃহিতির পরশ পাবে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী-কেন্দ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা অনুবন্ধনে থাকবে। লেখকদের স্মৃতিগর্ভে এই বিষয়গুলি সৃজনশীলতায় গতিপ্রাপ্ত হলে সমৃদ্ধ হবে পূর্ব ভারতের পরবর্তী সংখ্যা। সেই আলো বিকশিত হবার আশায় থাকবো।

সুলেখা পন্ডিত

আলিপুরদুয়ার।
১২ নভেম্বর ২০২৩

পূর্ব ভারত

সূচীপত্র

১১
ড. নাজু হাঁসদা
আদিবাসী জীবনে পরিবর্তনঃ ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা
উত্তর পূর্বভারতে সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস

২৪
কমলেশ রায়
উত্তববঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার:
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষন

৩৩
ড. অমিতাভ কাঞ্জিলাল
কথাসাহিত্যের সামাজিকতা - উপন্যাস সাহিত্যের
সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বাস্তবতা

৫৬
লাকী কর
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও তৎকালীন সমাজ:
একটি নারীবাদী বিশ্লেষণ

৭০
মন্দিরা পাল
বৌদ্ধধর্মে নারীর স্থান

৭৫
মুহাম্মদ ইসহাক
বেগম রোকেয়া(১৮৮০-১৯৩২): বাংলার নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষা

পূর্ব ভারত

৮৪
মল্লিকা রায়
রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধ: রংপুর

১০১
প্রিয়াঙ্কা দত্ত
উনিশশো চল্লিশের দশকের নব্যবাস্তববাদী চেতনা ও ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোকে নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটির একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

১১১
সঞ্জীব পাত্র
জলামুঠা রাজবাড়ীর ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

১২৬
সায়ন দেবনাথ
সুন্দরবনের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী উপেক্ষিত এক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জীবনচর্যা

১৪২
বিদ্যাভারতী হালদার
বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: প্রসঙ্গে বাগদি সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের রূপরেখা

১৫৩
ড. সমিত ঘোষ
উত্তরবঙ্গে গান্ধিজি এবং সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৫৯
ইন্দ্রজিৎ মন্ডল
পুস্তক পর্যালোচনা

আদিবাসী জীবনে পরিবর্তন : ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তর পূর্বভারতে সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস

ড. নাজু হাঁসদা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ :
বলাবাহুল্য যে, একটা দীর্ঘ সময় অবধি ভারতের ইতিহাসে আদিবাসীদের পরিবর্তনহীন সামাজিক ও পৃথক একমাত্রিক সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনা করা হত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তন ও প্রতিবেশীদের সাথে ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গুলি উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়পর্বে আদিবাসী ইতিহাসের নানান দিক গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবথেকে চর্চিত হয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তার কারণ ছিল মূলত তাদের ঐতিহাসিক গণসংগ্রাম (যা 'হুল' নামে পরিচিত) এবং পরবর্তীতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের গভীর প্রভাব। যাইহোক, উনবিংশ শতকে সাঁওতালদের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার প্রভাব বিংশ শতক জুড়ে ব্যাপক রুপ নিয়েছিল। আসলে, ভাষা-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সাঁওতাল জাতির অভূতপূর্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরণ বিংশ শতকে পূর্বভারতে অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে তাদের অগ্রণী ভূমিকার প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছিল। অথচ ঔপনিবেশিক পর্বে অথবা স্বাধীন ভারতে এই ক্ষেত্রটি সঠিকভাবে ইতিহাসের চর্চায় স্থান পায়নি। তাই বর্তমান প্রবন্ধটিতে মূলত চেষ্টা করা হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক সময় থেকে আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় কি ধরনের পরিবর্তনের ধারা এসেছিল তা আলোচনা অথবা মিশনারী প্রভাব মুক্ত হয়ে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ভাষা-সাহিত্যের উন্নয়ণের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার বিকল্প ভাষ্য তৈরীর ইতিহাস অনুসন্ধান করা।

সূচকশব্দ : পূর্বভারত, ঔপনিবেশকতা, আদিবাসী, সাঁওতালি সমাজ ও পরিবর্তন

মানব সভ্যতার উত্তরণের ইতিহাস হল পরিবর্তনের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের ধারা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে, যা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের সভ্যতায় বৈচিত্র্যময়তা বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের ইতিহাসকে অধ্যয়ণ করলে বোঝা যাবে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল তবে তার গতি ছিল শ্লথ কারণ অন্যান্য আধিপত্যকারী জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসীরা প্রকৃতি-নির্ভর

জীবনযাপনে অত্যধিক অভ্যস্ত থাকায় উদ্ভাবনী কৃৎকৌশল বা প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ কম ছিল। যাইহোক, উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল যার প্রভাব আদিবাসীদের ওপরও পড়েছিল। কারণ সর্বগ্রাসী ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তাদের স্বতন্ত্র ও চিরাচরিত আর্থ-সামাজিক জীবনে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বহিরাগত বা 'দিকু'দের হাতে শোষিত, অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হতে হতে আর্থ-সামাজিকভাবে সাঁওতাল জাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৫-৫৬ সালে সংগঠিত সাঁওতাল গণসংগ্রাম ছিল দীর্ঘ ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।[১] এছাড়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা থেকে তারা ছিল বহুক্রোশ দূরে এবং তাদের নিজস্ব (সাধারণভাবে পরিকাঠামোসহ প্রচলিত) শিক্ষার ধারা না থাকায় আধুনিকতার নিরিখে বা দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে তারা পিছিয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের মধ্যে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কাজের সূত্রপাত ঘটতে থাকে, মূলত খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা কিছু পরিষেবামূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছিলেন। এই মিশনারীদের প্রভাবে শিক্ষিত হয়ে সাঁওতালদের একটা অংশ নিজ ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল। বাকী বড়ো অংশই আধুনিক শিক্ষার বাইরে থাকায় তাদের আর্থ-সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের গতি ছিল কম। যাইহোক, বর্তমানে আমরা দেখি যে, পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে আর্থ-সামাজিক নানান ইস্যুতে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই অগ্রণী ভূমিকায় থাকে। এছাড়া তাদের ভাষা সাহিত্যেরও অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে চলেছে যার শুরুটা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে । এবার প্রশ্ন হল যে, সাঁওতাল জাতির জাগরণে তাদের নিজস্ব উদ্যোগ বা তাগিদ কিভাবে ও কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এসেছিল? এক্ষেত্রে যারা মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের ঐতিহাসিক অবদান মূল্যায়ণের দাবী রাখে।

প্রথমেই বলতে হয় যে, সাঁওতালরা হল ভারতের প্রাচীন অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুন্ডারী শাখার জনগোষ্ঠী[২] যারা ভারতে অনার্য সভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক। তাদের সমৃদ্ধ মৌখিক ভাষা সাহিত্যের সম্ভার সমাজে ধারাবাহিক ছিল এবং এই ভাষাই সকল সাঁওতাল জনগণকে সংবদ্ধ রখেছিল। কারণ, সাঁওতালরা নিজ ভাষার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল।[৩] কিন্তু সাঁওতালি ভাষার কোনো লিপি না থাকায় দীর্ঘকাল প্রামান্য লিখিত সাহিত্যের বিকাশ বা প্রথাগত কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। অথবা জাতির ইতিহাসকে পূর্ণতা পায়নি। ফলত উনিশ শতকের শুরুতে যখন পূর্বভারতে বিশেষ করে বঙ্গ সমাজে যখন ঔপনিবেশিক সুযোগে আধুনিকতার ঢেউ উঠেছিল তখনও আদিবাসী সাঁওতালরা প্রাচীন জীবনযাপন ও শ্রুতিনির্ভর পরম্পরা বজায় রেখেছিল।

আদিবাসী প্রসঙ্গ

মানব সভ্যতার ইতিহাস হল সংমিশ্রণ ও বৈচিত্রময়তার আখ্যান আর ভারত হল এই সংমিশ্রণের প্রধান ধাত্রীভূমি।[৪] আসলে ভারতবর্ষের আদি ইতিহাস অনুযায়ী আদিবাসীরা জিনগতভাবে সমগ্র ভারতীয় জনসংখ্যার ভিত্তিস্থাপনকারী। বর্তমানে এই আদিবাসী জনগণ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশের অধিক অথচ আধুনিক ভারতে আদিবাসী ও অন্যান্য তফসিলি মানুষদের 'আলাদা' বা হীনদৃষ্টিতে দেখার প্রবনতা

লক্ষ্যণীয়। আসলে ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আধিপত্য স্থাপনকারী জনগোষ্ঠী গুলির উন্নয়নের তুলনায় আদিবাসিন্দাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থা। তবে, প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত আদিবাসীরা নিজেদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখেছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের দরুণ ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল যার কেন্দ্র ছিল কলকাতা তথা বাংলা। যেখানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা পরিবর্তন দেখা যায় আধুনিকতার নিরিখে।[৫] প্রাথমিকভাবে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ঘটেছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে এবং ইংরেজদের সহযোগীতায় আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে একশ্রেণীর বাঙালি লোকজন কলকাতা শহর কেন্দ্রিক নাগরিক সামাজিক জীবনধারা গড়ে তুলেছিল।[৬] এই শ্রেণীর শিক্ষিত অংশই বাংলার সমাজ সংস্কার ও ভাষা সাহিত্যের উত্তরণ ঘটিয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নবজাগরণের সূচনা করেছিল যা ক্রমশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। এরাই বাঙালি ভদ্রলোক নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তবে তাঁরা প্রধানত ছিলেন বঙ্গ হিন্দু সমাজ কাঠামোর উচ্চবর্ণভূক্ত মানুষজন। অন্যদিকে, বঙ্গ সমাজের বৃহত্তর অংশই বিশেষভাবে নিম্নবর্গের মানুষেরা দীর্ঘকাল এই ধরনের উন্নয়ণ বলয়ের বাইরে ছিল। একই রকমভাবে, মূলত বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নিরিখে পিছিয়ে ছিল এবং বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য [৭] থাকলেও কালের স্রোতে অসংখ্য আদিবাসী নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে অন্যান্য প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বা হিন্দু জাতপাত ভিত্তিক সমাজকাঠামোর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।[৮] অবশ্য পূর্বভারত তথা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী সাঁওতালরা সামাজিক সংগঠণের ধারাবাহিকতার জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যাইহোক, ভারতীয় সভ্যতার নির্মাণকার আদিবাসীরা ক্রমশ পরবর্তী সময় পর্বে আগত জনগোষ্ঠীগুলির আধিপত্যবাদের ফলে প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল। এই পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী করা যায় তাদের দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভাবনী কৃতকৌশলের অভাব ও লিখিত জ্ঞান চর্চার প্রতি অনাগ্রহী মনোভাবকে যা তাদের ধারাবাহিক উন্নয়ণকে ব্যহত করেছিল। তবে প্রকৃতিনির্ভর এই জনগোষ্ঠীগুলি চিরাচরিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করে নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে যে আলোচনা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল মূলত লিখিত প্রামান্য দলিলের অভাবকে দায়ী করে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ধারা থাকলেও তা ছিল মৌখিক পর্যায়ে অর্থাৎ কোনো লিখিত রূপ ছিল না, যা তাদের সামগ্রিক উত্তরণের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল।

ভারতের ইতিহাসের আলোচনায় আদিবাসী প্রসঙ্গ খুবই সীমিত এবং যেটুকু আছে তা মূলত ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিরোধী বিদ্রোহ ও গণসংগ্রাম হিসাবে। অর্থাৎ ভারতের বহুত্ববাদী বা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিতে অবিচ্ছেদ্য অংশ আদিবাসীদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক উত্তরণের আখ্যান মূলধারার ক্যানভাসে উপেক্ষিতই আছে। যাইহোক, সাঁওতালরা হল পূর্বভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের বলত 'খেরওয়ার' বা 'খারওয়ার'।[৯] সাঁওতাল পরগণা জেলায় সাফাহড় আন্দোলনের

মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।[১০] বর্তমানে শিক্ষা ও লিখিত ভাষা-সাহিত্যে যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ লগ্নে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে তা উন্নতরূপ ধারণ করেছিল। এই সময় মিশনারী প্রভাবের বাইরেও সাঁওতাল লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছিল যে ধারাটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাহিত্যিক রামদাস টুডু, সাধু রামচাঁদ মুর্মু, মঙ্গল চন্দ্র সরেন, পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ও কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু প্রমুখরা।

মিশনারীদের অবদান

উনিশ শতক ছিল বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যখন আধুনিকতার নানান দিকের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই শতকেই নব্য শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী নিজেদের উচ্চবর্গীয় সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং অন্যান্য দিকুরা আদিবাসীদের শোষণ ও বঞ্চিত করতেই তৎপর থাকত। অন্যদিকে, তৎকালীন সরকারও প্রান্তিক জনগণের উন্নয়ণে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে আধুনিকতার অন্যতম সোপান শিক্ষার প্রসার আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়নি। তবে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের ফলে তাদের সমাজ সংস্কৃতির নানা দিক আলোকিত হয়েছিল।[১১] সাঁওতাল অধুষ্যিত বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৩৬ সালে বালেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট ফরেন মিশন সোসাইটি।[১২] এছাড়াও চার্চ মিশনারী সোসাইটি, নর্দান ইভানজেলিক্যাল লুথারন চার্চ, মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি, রোমান ক্যাথলিক মিশন ও লন্ডন মিশনারী সোসাইটির কার্যকলাপ সাঁওতালদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১৩] এই মিশনগুলির কেন্দ্র ছড়িয়েছিল মেদিনীপুর থেকে সাঁওতাল পরগণা জেলার বিভিন্ন জায়গায় যেমন ভীমপুর, বেনাগরিয়া, পখুরিয়া, সারেঙ্গা ও তালঝারি মিশনের নাম বিশেষ স্মরণীয়। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, মিশনারীরা সাঁওতালদের সঙ্গে সহজে সংযোগ স্থাপনের জন্য তাদের ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীদের কর্মকান্ডের সূচনা হলেও ক্রমশ তারাই সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতা অনুধাবন করে লিখিত ধারা শুরু করেছিলেন।[১৪] এক্ষেত্রে রেভাঃ জেরেমি ফিলিপস (Rev. J. Phillips) দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যেহেতু তিনি ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলায় সাঁওতালি গান ও ছড়ার বই প্রকাশ করেন। তবে, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত 'An Introduction to the Santali Language' নামে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষার গ্রন্থটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৬ সালের পর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছিল সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল তাদের ঐতিহাসিক গণসংগ্রাম যা 'সাঁওতাল হুল' নামে পরিচিত। প্রায় এই সময় থেকেই ক্রমাগত খ্রিষ্টান মিশনারীরা বাংলার পশ্চিম অংশ জুড়ে বিশেষত্ব সাঁওতাল পরগণা জেলায় বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেনাগরিয়া মিশন, পোখুরিয়া মিশন, তালিঝাড়ি মিশন ও মহুলপাহাড়ি মিশন প্রভৃতি। আদিবাসী তথা সাঁওতালদের জীবন ও সমাজ সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে মিশনারীরা তাদের ভাষা

ও সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করেছিলেন এবং সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের মাধ্যম হিসাবেও মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বেশ কিছু মিশনারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন-, Rev. E.L. Puxley, Rev. A. Campbell, Rev. W. T. Stores, Rev. E. C. Johnson, Rev. L.O. Skrefsrud, Rev. H.P. Borresen, Rev. F. T. Cole, Rev. P. O. Bodding প্রমুখরা। ১৮৬৮ সালে রেভাঃ ই. এল. পুক্সলি প্রকাশ করেন 'A Vocabulary of Santali Language' গ্রন্থটি যা ছিল তাঁর সংগৃহিত সাঁওতালি শব্দের প্রথম লিখিত ভান্ডার।[১৫] তবে মিশনারীদের মধ্যে সাঁওতালদের সম্পর্কে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সবথেকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রেভাঃ লারস ওলসেন স্ক্রেফস্রুড। এই জাতির উন্নয়ণে তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সাঁওতাল জনগণের নিকট কেরাপসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৭ সালে Rev. Skrefsrud রোমান হরফে 'হড়কোরেন মারে হাপরামকো রেয়া কাথা' নামে সাঁওতালি ভাষায় সর্বপ্রথম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন[১৬], যা তৎকলীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একটি ঐতিহাসিক কাজ। এই গ্রন্থটি তিনি লিখেছিলেন কলেয়ান গুরু নামে একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী সাঁওতাল কতৃক বর্ণিত আখ্যানের উপর ভিত্তি করে। এর মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষায় সমাজের ইতিহাস লিখনের ধারার সূচনা হয়েছিল যা নিঃসন্দেহে সাঁওতাল জাতির উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও তিনি তাঁর পরম সহযোগী বিরাম হাঁসদার সাহায্যে আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আদিবাসী লিখিত জ্ঞানচর্চার নতুন এই ধারাকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যান রেভাঃ পল ওলাভ বোডিং যার লেখা অসংখ্য বই সাঁওতাল জাতির অমূল্য সম্পদ। ১৮৯০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময়কাল রেভাঃ বোডিং সাঁওতাল পরগণায় কর্মজীবন সম্পন্ন করে নিজ জন্মভূমি নরওয়েতে ফিরে গিয়েছিলেন। তবে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি সাঁওতাল জনগণের জন্য রেখে যান তাঁর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার। বলা যায় এই সকল মিশনারীদের সরাসরি প্রভাবে বহু সাঁওতাল লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল যারা নিজ গোষ্ঠীর লিখিত সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের ছড়া, প্রবাদবাক্য, সঙ্গীত, লোককথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন যেমন- দুলা হেমব্রম, ডেডেম হাঁসদা, কালু মারান্ডি, নুকা মারান্ডি, শিমোন বাস্কে, চৈতন্য হেমব্রম কুমার, খুদিয়া মারান্ডি, জালপা সরেন, বেঞ্জামিন সরেন প্রমুখরা।[১৭] মিশনারী প্রভাবের লক্ষ্যনীয় দিক ছিল এই যে, ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা। একইভাবে বাইবেলের বিভিন্ন বিষয় ধর্মান্তরিত সাঁওতাল লেখকদের লেখার উপাদান হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল সাঁওতাল পরগণা জেলা, ফলে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই জেলায় সাঁওতাল লেখকদের মধ্যে মিশনারী প্রভাব জোড়ালোভাবে পড়েছিল। আসলে, ঔপনিবেশিক শাসেন সহায়তার উপড় মিশনের কার্যকলাপ অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল কারন উভয়ের পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বার্থে একটি সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখত।[১৮] ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীদের কর্মযাত্রা শুরু হলেও ক্রমশ তাঁরা সাঁওতালদের মৌখিক জ্ঞানচর্চার ধারাকে লিখিত রূপ দান করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নিজস্ব উদ্যোগের সূচনা

ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় যে, উনিশ শতক ছিল সাঁওতাল জাতির ইতিহাসেও একটি বিশেষ সময় পর্ব। কারণ এই সময়কালে অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যেও পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার এবং সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যের উন্নয়ণ ইত্যাদি ছিল প্রধান। অবশ্য মিশনারীরা ছিলেন সাঁওতালি ভাষাসাহিত্য লিখিতকরণের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। আসলে, সাঁওতালদের সমৃদ্ধশালী মৌখিক ভাষাসাহিত্য থাকলেও তার কোনো লিখিতরূপ বা নিজস্ব লিপি না থাকায় জাতির কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল ছিল না বা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমানের অভাব ছিল। ফলস্বরূপ প্রথমদিকে, মূলত মিশনারীদের প্রভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল লেখক গোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অন্যদিকে, এই মিশনারী প্রভাব বলয়ের বাইরে সাঁওতাল লেখকদের নিজস্ব উদ্যোগে একটা স্বতন্ত্র ধারাও তৈরী হচ্ছিল যার সূচনা হয়েছিল মূলত লেখক মাঝি রামদাস টুডুর লেখার মাধ্যমে যাঁর লেখা 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি' সাঁওতালি ভাষায় ও বাংলা হরফে ১৮৯৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৯] ১৮৫৪ সালের ২রা অক্টোবর তিনি জন্মে ছিলেন সিংভূম জেলার কাড়ুওয়াকাটা গ্রামে (ঘাটশিলার কাছে) এবং বাল্যকাল থেকেই নিজ সমাজের ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। সমকালীন পরিস্থিতিতে সাঁওতালদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সজাগ এবং আত্মজাগরণের পথ নির্মান করার কাজে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে তাঁর কর্মকান্ড বিষয়ে খবর পেয়েছিলেন প্রখ্যাত বাংলা ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নিজ জাতির উত্তরণে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[২০] পরবর্তী প্রজন্মের উৎথানের মধ্য দিয়ে রামদাস টুডুর এই কার্যধারা উন্নত রূপ ধারণ করেছিল। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন সাধু রামচাঁদ মুর্মু, পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, মঙ্গলচন্দ্র সরেন ও সারদাপ্রসাদ কিস্কু। মিশনারী প্রভাব বলয়ের বাইরে আত্ম উন্নয়ণের এই ধারার লেখাপত্রগুলির অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সাঁওতাল জাতির চিরাচরিত ধর্ম সংস্কৃতির পুনৎর্থান ঘটানো। কারণ তৎকালীন ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় আদিবাসী সাঁওতালদের অবস্থান বিবেচিত হত প্রাচীন ও সভ্যতার নিরিখে পশ্চাদপদ। এই অবস্থায় অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম অনুসারী হয়ে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছিল। আবার অনেকেই সাফাহড় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।[২১] ফলে সাঁওতালদের সামাজিক সংহতি (জুমিদ) বিনষ্ট হতে থাকে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত নিজস্ব লিপি না থাকা জাতির উন্নয়ণে ছিল অন্যতম প্রধান সমস্যা। তবে, সাঁওতাল ভাষা সাহিত্য উন্নত করার মাধ্যমে নিজ জাতির চিরাচরিত ধর্মীয় জীবন ও আত্মমর্যাদা পুনর্দ্ধার এবং সমাজের ঐতিহাসিক দলিল তৈরী করা সময়ের দাবী ছিল। এই রকম অস্থির সময়পর্বে, সাধু রামচাঁদ মুর্মুর আবির্ভাব এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। ১৮৯৭ সালে মেদিনীপুর জেলার কামারবাঁদি গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[২২] তিনি নিজ জাতির উত্তরণের জন্য কলম ধরে ছিলেন এবং ধারাবাহিক সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাঁওতালদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে

চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গণসঙ্গীত 'দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীরদ' ক্রমেই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনিই সর্বপ্রথম সাঁওতালদের চিরাচরিত প্রকৃতি নির্ভর ধর্মকে 'সারিধরম' নামে লিখিত রূপ দান করেছিলেন অর্থাৎ তৎকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজ ধর্মের প্রতি জনগণের মনোযোগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে নিজ সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে গান, কবিতা লিখতে থাকেন যেমন- সারিধরম সেরেঞ, অলদহ অনড়হেঁ, লিটা গোডেৎ, সংসার ফেন্দ নাটক, ঈশরড় ইত্যাদি।[২৩] এছাড়া মাতৃভাষায় পড়াশোনার প্রধান অন্তরায় দূর করার জন্য তিনি স্বতন্ত্র একটি লিপি উদ্ভাবন করেন ১৯২৩ সালে যা 'মঁজ দাঁদের আঁক 'নামে পরিচিত। অবশ্য তিনি নিজে এই হরফে সাহিত্য চর্চা করলেও সেটি জনপ্রিয় করে যেতে পারেননি মূলত আর্থিক অনটনের জন্য। তবে সাঁওতাল জাতির উন্নয়ণে তাঁর প্রয়াস অনস্বীকার্য। তাঁর সাহিত্য সাধনাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল 'সাধু রামচাঁদ মুরমু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' নামে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। এছাড়া ১৯৯৭ সালে এই কালজয়ী কবির জন্ম শতবর্ষে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে তাঁর রচনাবলীর নির্বাচিত লেখাপত্র একত্রিত করে 'সাধু রামচাঁদ অনল মালা' নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়।[২৪] সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলায় সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে লেখকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রশংসার দাবী রাখে।

আধুনিক সময়ে সাঁওতাল জাতির উত্তরণে সবচেয়ে বেশী আলোড়ন জাগানো নামটি হল পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। ১৯০৫ সালের ৫ মে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ জেলার ডাহারাডি গ্রামের এক অতিসাধারণ পরিবারে।[২৫] লক্ষ্যণীয় যে, সেই সময় ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তথা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল এবং দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তাসত্ত্বেও তৎকালীন বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উড়িষ্যা ও বিহারে শিক্ষার মাধ্যম ছিল যথাক্রমে বাংলা, ওড়িয়া ও হিন্দি। ফলে আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না অর্থাৎ কঠিন ভাষা সমস্যার মধ্য তাদের দিয়ে পড়াশুনা করতে হত। এই সমস্যার সমুখখীন হয়েছিলেন রঘুনাথ স্বয়ং যদিও তিনি কঠোর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। কিন্তু তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য এই সমস্যা দূর করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করতে চেয়েছিলেন। তিনিও অনুধাবন করেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে উন্নত করা সম্ভব যেমন বাঙালিদের অগ্রসরতার ক্ষেত্রে মূল কারণ ছিল বাংলা ভাষা সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতিসাধন, এই সময়ে যা স্বর্ণযুগে পরিণত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে বিরাজমান। অন্যদিকে, সাঁওতাল সমাজ বিহারে হিন্দি, বঙ্গে বাংলা ও উড়িষ্যায় ওড়িয়া হরফে শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্যছিল। ফলত মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার অভাব সাঁওতাল জাতির ঐক্য ও উন্নয়ণের অন্তরায় ছিল। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের তাগিদ নিয়েই তিনি ১৯২৫ সালে আবিস্কার করেন সাঁওতালি ভাষার জন্য অলচিকি হরফ যা এক নবযুগের সূচনা করেছিল বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে, ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় ওড়িয়া ভাষা মাধ্যমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি সমস্যার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন এবং

দেখেন যে, প্রাচীন এই ভাষার হরফ না থাকাটাই প্রধান সমস্যা। এই আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন ১৯২৪ সালে। যাইহোক, হরফ আবিস্কার করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, তা উন্নত ও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। জীবন সংগ্রামের পাশাপাশিই নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য এক নতুন উত্তরণের পথ নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য এ্রপ্রসঙ্গে প্রায় সমকালীন আর একজন লেখক সাধু রামচাঁদ মুর্মুর উদ্যোগের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে তিনি সেই হরফ সর্বত্র প্রচার করতে পারেননি। কিন্তু রঘুনাথ মুর্মু লিপির উন্নতি ও প্রচার-প্রসারে বিশেষ যত্ন ও কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯২৪-৩৩ সাল পর্যন্ত তাঁকে স্থায়ী কর্মজীবনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩৩ সালে তিনি ময়ুরভঞ্জের বরামতারিয়া মডেল U.P. School এ Industrial শিক্ষক হিসাবে জীবন শুরু করেছিলেন।[২৬] পরে তিনি এই স্কুলেরই প্রধানশিক্ষক হয়েছিলেন। পেশাগত জীবনে কর্তব্য পালনের মাঝেই তিনি হরফ নিয়েও ছিলেন সজাগ তার প্রমান পাওয়া যায় ১৯৩৮ সালে, যখন তিনি কাঠের ছাপাযন্ত্র তৈরী করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ময়ুরভঞ্জ জেলার বারিপাদায় একসভায় তিনি তাঁর লিপি ও ছাপাযন্ত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। এই সভার পর থেকেই মূলত 'অলচিকি' প্রচার শুরু হয়েছিল।[২৭] তিনি জামশেদপুরের খেরওয়াল জারপা সমিতিরও সহযোগীতা পেয়েছিলেন। ফলত কলকাতায় স্বদেশী টাইপ ফাউন্ড্রিতে পথমবার তাঁর লিপি টাইপ করিয়েছিলেন। এছাড়া মুনিরাম বাস্কের তত্ত্বাবধানে চাঁদান প্রেস স্থাপিত হলে অলচিকি হরফ মূদ্রণের কাজে গতি এসেছিল।[২৮] ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালের পর থেকেই তিনি হরফ পরিচিতির জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচনা করতে শুরু করেছিলেন যেমন শিশুপাঠ্য 'অল চেমেদ', 'অল উপরুম', 'পারশি পহা', 'পারশি অপাৎ', এছাড়া ব্যাকরণ বই 'রণড়', গণিত বই 'এলখা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা অগ্রগতির পাশাপাশি সমাজকে সচেতন এবং আধুনিক চিন্তায় জাগ্রত করার জন্য তিনি লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত জনপ্রিয় নাটকগুলি হল- 'দাড়েগে ধন', 'বিধু চাঁদান', 'খেরওয়াল বীর', 'সিধু কানু' ইত্যাদি মঞ্চস্ত হওয়ার সাথে সাথে ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সাঁওতাল জনগণকে আলোড়িত করেছিল। ১৯৪৬ সালে তিনি চাকরী থেকে স্বেস্ছাবসর নিয়ে পুরোদমে তাঁর লিপির সাহায্যে ভাষা-সাহিতচর্চা ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল নানান ঘটনার সংমিশ্রণ, বিশেষ করে ১৯৩৮ সালে ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'আদিবাসী মহাসভা' নামক সংগঠন গড়ে ওঠা ও জয়পাল সিং মুন্ডার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।[২৯] স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্যায়ে নানা সংঘাত আদিবাসী সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। শেষপর্যন্ত আসে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই অগাষ্ট যখন স্বাধীন ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটে ও তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে এক উন্নত ভারতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের সাংবিধানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের রূপরেখা তৈরী করা হলেও বাস্তবায়নে অগ্রগতি লক্ষ্যনীয় গতি ছিল না। যাইহোক, স্বাধীন ভারতেও রঘুনাথ মুর্মু অলচিকি প্রচার এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছিলেন। এছাড়াও আঞ্চলিকতার ভেদাভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ সাঁওতাল জাতি গঠনে তিনি ছিলেন অবিচল। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে,

নিজস্ব লিপির ব্যবহার সার্বিক হয়ে উঠলে পূর্বভারতে আদিবাসী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠবে।[৩০]

সমকালীন ঝাড়খন্ড আন্দোলনেরও তিনি সাক্ষী ছিলেন তবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন ভাষা চর্চা ও লিপি প্রচারের কাজে। আসলে, আঞ্চলিকতার উর্ধে উঠে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির উন্নয়ণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একক প্রচেষ্টার তুলনায় সামাজিক জাগরণ ও জনমত গঠনের জন্য দরকার সামাজিক গণসংগঠনের এবং তাই ১৯৬০ সালে গড়ে তুললেন 'Adivasi Socio-Educational and Cultural Association' (ASECA) নামে সামাজিক সংগঠন। খুব তাড়াতাড়ি এই সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামে বিস্তার লাভ করে। প্রায় একই সময়ে গড়ে ওঠে 'All India (Adivasi) Santal Council' নামে আর একটি সংগঠন, ফলে ক্রমশ সাঁওতালি ভাষার লিপি হিসাবে অলচিকি ব্যবহারের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল যা সামাজিক জাগরণের পরিচয় বহন করে।[৩১] ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে ১৯৭৯ সালের ২ রা জুন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সরকার অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও আভ্যন্তরীন নানা বিরোধও ছিল বর্তমান কারণ শিক্ষিত জনগণের অধিকাংশই বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা ও লিপি ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকার ফলে এই হরফের ব্যবহার বা সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনে সকলে একমত হতে পারেনি। আবার মুন্ডাসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি অলচিকিকে মেনে নিতে সম্মত হয়নি। বিতর্কের ধারা থাকলেও সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি নিয়ে আন্দোলনও জারি ছিল। বিভিন্ন সংগঠন, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ভাষা চর্চার আন্দোলন জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল।[৩২] অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারী পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মারা যাওয়ার পরও তা বজায় ছিল।[৩৩]

এই ধারায় নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেনের অবদানও স্মরণযোগ্য। ১৮৯৯ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করছিলেন অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদার নিকট টুয়াপাহাড়ী গ্রামে। তাঁর পিতা মাতা ছিলেন যথাক্রমে সুব্বা ও সামিয়া সরেন। তাঁর পিতার পরিচিতির কারনে গ্রামসংলগ্ন টোলে তিনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এরপর মেধাবী ছাত্র হিসাবে কামারবাঁদি উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে ১৯১৩ সালে ভীমপুর মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্য এবং খ্রিষ্ট ধর্মের আগ্রাসন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি অখ্রিষ্টান সাঁওতালদের প্রতি মিশনারীদের বৈষম্যমূলক আচরণ অনুধাবন করেছিলেন। এছাড়া তিনি হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্মের বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন যা তাঁর চিন্তার সার্বিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তিনি সমসাময়িক সময়কালে নিজ সমাজের অবনত অবস্থা সম্পর্কেও ছিলেন সজাগ ও ক্রমাগত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সামাজিক জাগরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 'সারি সারজম' (সত্য-শাল বা শাশ্বত্ব ধর্ম) নামে তিনি প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৭ সালে।[৩৪] তিনি এই গ্রন্থে সাঁওতাল জাতির সমাজসংস্কৃতির চিরাচরিত আদর্শ পুনরুদ্ধার করে জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪০ সালের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সামিল হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ

করেছিলেন। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের হয়ে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার বিনপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন। তখন থেকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জনসেবার কাজেও সমানভাবে জড়িয়ে পড়েন। আসলে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তিনি সমাজের উন্নয়ণ ও জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতির উপর অসংখ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন যা সাঁওতাল জাতির উত্তরণে সহায়ক ছিল। জ্ঞানচর্চার নানান ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবীও উল্লেখ করেছিলেন।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু ছিলেন অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যিনি সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্য উন্নয়ণের পাশাপাশি সামাজিক জাগরণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মেছিলেন অধুনা পুরুলিয়া জেলার দাঁড়িকাডোবা গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে ও তাঁর পিতামাতা ছিলেন যথাক্রমে চরণ ও ধনমণি কিস্কু।[৩৬] ছোট থেকেই তিনি পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী ছিলেন কিন্তু দারিদ্রতার জন্য কলেজে ভর্তি হয়েও স্কুল মাষ্টারের পেশা গ্রহণ করে প্রথাগত শিক্ষায় যবনিকা টানেন। যাইহোক, চাকরি জীবনে প্রবেশ করে তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর দ্বারা অনুপ্রানিত ছিলেন। এমনকি তাঁর লেখাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬০ সালের আগে তাঁর 'কুহু বাউ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের ছুটি কবিতাটি সাঁওতালিতে অনুবাদ করেছিলেন।[৩৭] ভুরকো ইপিল, লাহা হররে, অকত পৌরিরে এবং আরো অনেক কবিতার মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষা সমৃদ্ধ করেছিলেন।

সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি সমকালীন সাঁওতাল সমাজের অসঙ্গতিগুলি দূর করার ক্ষেত্রেও গুরত্ব দিয়েছিলেন। কারন তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ডাইনি প্রথায় সাধারণ মানুষের অযৌক্তিক বিশ্বাস সামাজিক উত্তরণের প্রধান অন্তরায়। তাই তিনি নিরলসভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত ডাইনি প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করার কথা বলেছিলেন। চিঠির কিছু অংশ নিম্নরূপ :

ভন্ড জান গুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্যায় ও অবিচার সংগঠিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ডাইনি প্রথা একটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুনি এর অবসান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ দিন পরেও ভারতের মতো একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে এ ধরনের কু প্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক। এই কুপ্রথার উচ্ছেদ কল্পে সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত ভন্ড জান গুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে। ডাইনী প্রথা সাঁওতালদের মধ্যে একটি বিরাট ও ব্যাপক সমস্যা। এটা দিবালোকের মতো পরিস্কার যে, বহু লক্ষ ডাইনী বিশ্বাসী সাঁওতালদের সমর্থন হারাবার ভয়ে কোন রাজনৈতিক দলেরই ইচ্ছা নেই যে- এই কুপ্রথা আদৌ

বন্ধ হোক। আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা অর্থাৎ সাংবাদিক ও বিবেকবান ব্যক্তিরা এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।[৩৮]

অর্থাৎ কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু নিজ সমাজে প্রথার অবসানে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিলেন এবং সেই কারনে তিনি গ্রাম্যসমাজে প্রায় বাঁধাবিপত্তির সমুখীন হতেন। অসাধারণ লেখনি ক্ষমতা ও সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এমনকি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, সামাজিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, যেমন, সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক লক্ষীন্দ্র কুমার সরকার, 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সহ সম্পাদক নীরঞ্জন হালদার, লেখক-গবেষক সুহৃদকুমার ভৌমিক, সাহিত্যিক গোমস্তা প্রসাদ সরেন, মহাদেব হাঁসদা সহ আরোও অনেকের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সামাজিক নানান ইস্যুতে তিনি তাঁদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন। বিশেষ করে ডাইনী প্রথার ফলে সাঁওতাল গ্রাম সমাজে যে অন্যায়গুলি হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বেশী সোচ্চার। মূলত বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে এই কুপ্রথার কারনে নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, জরিমানা, হত্যার ঘটনা এবং তাতে রাজনৈতিক মদত কবিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।[৩৯] বলা যায় অকুতোভয় কবি ডাইনী প্রথাকে সমাজ উত্তরণের পথে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা বলে মনে করতেন এবং তাই তিনি এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছিলেন। ফলে সাঁওতাল সাহিত্যের উন্নয়ণের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

যাইহোক, আধুনিক ভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালদের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস ক্রমশ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং মূল কারণ হল ঔপনিবেশিক ভারতে তাদের রাজনৈতিক গণসংগ্রাম ও লিখিত ভাষা-সাহিত্যের ধারাবাহিক চর্চার বিকাশ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিশনারীদের মাধ্যমে যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা বিংশ শতকে সাঁওতাল লেখক-চিন্তবিদদের আবির্ভাবের ফলে উন্নত রূপ ধারণ করেছিল। এই চিন্তাবিদরা নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক সত্ত্বাকে আধুনিকতার নিরিখে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রমদাস টুডু, সাধু রামচাঁদ মুর্মু, পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সারদা প্রসাদ কিস্কু, ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মুসহ আরোও অনেকে মিশনারী প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজ জাতির অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। এক্ষেত্রে সাঁওতালি লিপির উদ্ভাবনের ঘটনা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এবং অলচিকির ক্রমিক উন্নয়ন স্বাধীন পূর্বভারতের ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের একটা অংশের সাঁওতাল জনগণের মধ্যে বহুল ব্যবহার ঘটিয়েছে। এমনকি অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও অলচিকিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা সফল হয়নি কারন আদিবাসীদের আভ্যন্তরীন ভাষাগত পার্থক্য ও টানাপোড়েনকে দায়ী করা চলে। তাসত্ত্বেও বলা যায় যে, বিংশ শতকে সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল যা সাঁওতাল সমাজের উত্তরণ বা আধুনিকীকরনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এক্ষেত্রে রঘুনাথ মুর্মু অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, কারণ তিনি অলচিকি উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত থাকেননি

তা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন পূর্বভারতে অলচিকি ভাষা আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। এছাড়া অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও দার্শনিক ব্যক্তিবর্গরা তাঁদের নিরলস জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আদিবাসী সাঁওতালদের উত্তরণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যদিও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, জ্ঞানচর্চার স্বাধীন ও নিজস্ব ধারা বিশেষত বাংলা ও উড়িষ্যাতেই গড়ে ওঠে এবং দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল, তুলনায় ঐতিহাসিক হুল বা সাঁওতাল গণসংগ্রামের পীঠস্থান সাঁওতাল পরগণা বা ঝাড়খন্ড অঞ্চলে এই ধারার গতি ছিল কম কারন সেখানে সাঁওতাল লেখকরা মূলত ছিলেন মিশনারী প্রভাবাধীন। যাইহোক, উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যে ধারা তৈরী হয়েছিল তা আদিবাসী সমাজকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে সকল জনগোষ্ঠী গুলির মধ্যে এই পরিবর্তনের তারতম্য দৃশ্যমান ছিল।

তথ্যসূত্র :

১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৯৬০, পৃ.১২-২০
২। বাস্কী, পুণ্য, বাংলা কথা সাহিত্যে সাঁওতাল, কলকাতা, ছোঁয়া, ২০২০, পৃ.১৮
৩। Carrin, Marine, 'Santal indigenous knowledge, cultural heritage, and the politics of representation,' Modern Asian Studies, 56, 2022, pp.1438-1463
৪। জোসেফ, টনি, আদিভারতীয়: আমাদের পূর্বসূরিদের কাহিনী এবং আমরা কোথা থেকে এলাম সেই গল্প, কলকাতা, মঞ্জুল পাবলিশিং হাউজ, ২০২১, পৃ.১৭৫
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, 'ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং আধুনিকতা', পরিমল ঘোষ স., আমাদের আধুনিকতার কয়েকটিদিক, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১২, পৃ.১
৬। ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারাঃ১৮০০-১৯০০, কলিকাতা, রামকৃষ্ণ প্রেস, ১৯৬০, পৃ.১৯
৭। ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, বঙ্গ সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য, কলকাতা, মনফকিরা, ২০১০, পৃ.১৮
৮। Bose, Nirmal Kumar, The Structure of Hindu Society, New Delhi, Orient Blackswan, 1996, pp.190-208
৯। হেমব্রম, পরিমল, 'খেরওয়াড় থেকে ঝাড়খন্ডী', স. স্বপন কুমার দাস, আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, রবীন্দ্র প্রেস, ২০১৪, পৃ.৬
১০। সেন, শুচিব্রত, ভারতের আদিবাসীঃ সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০, পৃ.১৬১
১১। Kalapura, Jose, ed., Christian Missions in Bihar and Jharkhand till 1947: A Study by P.C. Horo, New Delhi, Christian World Imprints, 2014, p.XXXiii
১২। ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, স. সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন, কলকাতা, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, ১৯৯৬, পৃ.১
১৩। হেমব্রম, পরিমল, সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৭, পৃ.১০০
১৪। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, দি বাসন্তী প্রেস, ১৯৯৯, পৃ.৮৬-৮৭
১৫। ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, তদেব
১৬। Skrefsrud, L.O., Horkoren Mare Hapram Ko Rea Katha, Benagaria, Benagaria Mission Press, 1887, pp.5-12

১৭। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ.৯৩
১৮। Hansda, Naju, 'The Colonial Missionaries in Santal Parganas: In Search of Changing World of the Santals in aftermath of Hul', Studies in Humanities and Social Sciences, Vol.XXVIII, Number-2, Winter 2021, Indian Institute of Advanced Study, Shimla
১৯। সিকদার, সুকুমার ও কিস্কু, সারদা প্রসাদ, অনু. ও স. রামদাস টুডু: খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি: সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৪, পৃ.১৬
২০। ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, তদেব, পৃ.৩
২১। চৌধুরী, বিনয়, 'ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক', চতুরঙ্গ, বর্ষ-৫৫, সংখ্যা- ৩, মাঘ ১৪০১
২২। হেমব্রম, পরিমল, তদেব, পৃ.১৫৩
২৩। সরেন, রামেশ্বর, 'সাধু রামচাঁদ মুরমু', স্বপন কুমার দাস, স. আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, রবীন্দ্র প্রেস, ২০১৪, পৃ.৩৪
২৪। ঐ, পৃ.৪৫
২৫। মুর্মু, রামচন্দ্র, 'অলগুরু পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু', স্বপন কুমার দাস, স. আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, রবীন্দ্র প্রেস, ২০১৪, পৃ.৫২
২৬। হেমব্রম, পরিমল, তদেব, পৃ.১৫৮
২৭। ঐ, পৃ.১৫৯
২৮। ঐ
২৯। Kumar, Nirdhosh, The Making of Adivasi Mahasabha: A History of Adivasi Politics in Colonial Chotanagpur, Lucknow, Book Rivers, 2019, pp.10-35
৩০। Carrin, Marine, op.cit.
৩১। Mahana, Rajakishor, 'The Politics of Difference: Ol-Chiki and Santal Identity in Eastern India,' International Review of Social Research, 9(2), 2019, pp.136-46
৩২। Choksi, Nishaant, 'Language to Script: Graphic Practice and the Politics of Authority in Santali-Language Print Media, Eastern India', Modern Asian Studies, Vol. 51, no.5, 2017, pp.1519-1560
৩৩। মুর্মু, রামচন্দ্র, তদেব, পৃ.৬৫
৩৪। হেমব্রম, পরিমল, তদেব, পৃ.১৬৫-৬৬
৩৫। ঐ, পৃ.১৬৯
৩৬। ঐ, পৃ.১৯৭
৩৭। ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, তদেব, পৃ.১৫
৩৮। হাঁসদা, মহাদেব, স. Letters: পত্রাবলী চিঠি সাকাম: সারদা প্রসাদ কিস্কু, পুরুলিয়া, আশুতোষ অফসেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০১৯, পৃ.৬০-৬১
৩৯। ঐ, পৃ. ৩০

উত্তববঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

কমলেশ রায়
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার
ইতিহাস বিভাগ, কুচবিহার কলেজ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সারাংশের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার এর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা।প্রশঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজবংশী সম্প্রদায় উত্তরবঙ্গের আদিনীবাসি বা ভুমি পুত্র।এই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী মানুষের একটা বড় অংশ রাজবংশী সম্প্রদায় ভুক্ত এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই কৃষিজীবি লোকসমাজে প্রচলিত লোকাচারগুলো সুপ্রাচীন কাল থেকেই বংশ পরম্পরায় পালিত হয়ে আসছে। এই লোকাচারগুলো কোন শাস্ত্রীয় মতে পালিত হয়না বলে এগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।তবে প্রকৃতির পূজারী কৃষিজীবী রাজবংশী সম্প্রদায় নানা ধরনের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে মঙ্গল কামনায় এই লোকাচার গুলো শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে।কিন্তু ক্রমবর্ধমান আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাবে চিরাচরিত ঐতিহ্যশালী পারিবারিক লোকাচার গুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক ও বাস্তববাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকাচার গুলো অপ্রাশঙ্গিক বলে মনে হয়। ফলে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হয়। উপরাউক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত পারিবারিক লোকাচার বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: লোকাচার, ভাদাভাদি, জলছিটা, জিগা গাছ, সইপাতা, সখাপাতা, গুয়া-পান, ভাত ছোঁয়ানি।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের বর্তমান আটি জেলা 'উত্তরবঙ্গ' নামে পরিচিত। যদিও বর্তমানে ভারতের মানচিত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন ভূখন্ডের অস্তিত্ব নেই, তবুও ব্রিটিশ শাসন কাল থেকেই উত্তরবঙ্গ কথাটি লোকমুখে শোনা যায়। সম্ভবত ঊনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখন্ডে ইংরেজের বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখন্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের

আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মতো সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসন কতৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মুলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাকরূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।[১] পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমান উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা স্থায়ীরূপ পেয়েছে। বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কুচবিহার জেলার সমগ্র ভুখন্ডকে বোঝায়।

বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের জনবিন্যাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে রাজবংশী সম্প্রদায় সর্ববৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠী। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের পবিত্র ভূমিতে অন্যান্য জাতি ও উপজাতি বসবাস করে। প্রবাহমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জনজাতির নিজস্ব লোকাচার, সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করেছেন। আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক রীতি নীতি গুলিও ক্রমশ পরিবর্তিত রূপ ধারণ করতে চলেছে।ফলে চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সামাজিক আচার আচরণ বর্তমান সমাজে বিলুপ্তির পথে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সসম্প্রদায় এই অঞ্চলের আদি নিবাসী ব ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রচলিত বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকাংশে এর মিল পাওয়া যায় না। গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক এই বাচক গোষ্ঠী প্রাচীন কাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পারিবারিক সুখ সাচ্ছন্দ ও মঙ্গল কামনায় কিছু পারিবারিক লোকাচার পালন করে আসছে, তা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

লোকাচার: লোকসমাজে প্রচলিত আচার গুলির পালন পদ্ধতর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। (ক) শাস্ত্রীয় আচার এবং (খ) অশাস্ত্রীয় আচার বা লৌকিক আচার।[২] সাধারণত সমাজে প্রচলিত যে সব আচার আচরণ,বিধি বিধান ও রীতি নীতি বংশ পরম্পরায় পালিত হয়ে প্রবাহমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত তাকেই লোকাচার বলে জানা যায়। লোকাচার গুলো শাস্ত্রীয় মত অনুসারে পালন করা হয় না। সম্ভবত সেই কারনে ঋকবেদ থেকে শুরু করে আমাদের প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রগলিতে আচার অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩] শাস্ত্রীয় মতে প্রচলিত ধর্ম বা আচার গুলো সকল মানুষকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে নিয়ম গুলোকে একসাথে করে সরলীকরণ করে তোলে। 'আর লোকায়ত সমাজের জনগোষ্ঠী নিষ্ঠার সঙ্গে কখনও ব্যক্তিগতভাবে কখনও সমষ্টিগত ভাবে পার্থিব কামনায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেবদেবী, অপদেবতা প্রভৃতিকে তুষ্ঠ করতে কিংবা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে কিংবা কোন অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করতে মে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করে তা হল লৌকিক আচার।এই ধরনের লৌকিক আচারে প্রকাশ পায় ইহলৌকিক কামনা। শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীদের ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে মূখ্য ভূমিকা পপাল করে মহিলারাই।[৪] উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি বিশেষ কিছু লৌকিক আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য

করা যায়। এই লৌকিক আচার অনুষ্ঠান রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতীর লোকাচার গুলো ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত। যথা- (ক) পারিবারিক লোকাচার, (খ) সামাজিক লোকাচার এবং (গ) কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রচলিত কিছু পারিবারিক লোকাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক লোকাচার: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি হল পরিবার।পরিবার গুলো সাধারনত একান্নবর্তী ও পুরুষতান্ত্রিক। তবে পরিবারে মাতা বা নারীদের অবস্থান কখনোই খাটো করে দেখা হয়না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রচলিত লোকাচার গুলো পালনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভূমিকাই বেশি। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ধনেশ্বর বর্মন তার উত্তরবঙ্গের জনজীবন লোকাচার গ্রন্থে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার প্রশঙ্গে বলেছেন "কেবল মাত্র পরিবারের কোনো সদস্যের কিংবা সামগ্রীক ভাবে পরিবারের সকলের অথবা স্ত্রী পুত্র, কন্যাসহ পরিবার পরিজনের সুখসমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় পারিবারিক বৃত্তেই প্রথামত যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়"।[৫] তাহাই হল পারিবারিক লোকাচার। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (ক) জন্ম সংক্রান্ত লোকাচার, (খ) প্রাক-বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার, (গ) বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার (ঘ) মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচার ও (ঙ) অন্যান্য লোকাচার।

সখাপাতা: সখাপাতা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় লোকাচার। এই লোকাচার টি সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে প্রচলিত। অনুমান করা যায় যেরামায়ন মহাভারতে উল্লিখিত রামচন্দ্র-বিভীষন, রামচন্দ্র-সুগ্রীব, কৃষ্ণ-অর্জুনের সখ্যপ্রীতির নির্মল দৃষ্টান্ত কোনো এক সময় উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৬] সমাজ জীবনের প্রাথমিক স্তম্ভ হল পরিবার। মানুষ পারিবারিক জীবনে নিজেকে ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। পারিবারিক সুখ, দুঃখ ও ভালো মন্দের গন্ডি পেরিয়ে ব্যক্তি জীবনে এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন হয় যে নিজের পরিবারের কোনো সদস্য না হয়েও সুখ দুঃখ ও ভালো মন্দের সাথি হতে পারে।এমন কি উভয় 'সখা' নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একধরনের মানসিক শান্তি অনুভব করে। এই পারিবারিক সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটে সখাপাতা লোকাচারের মাধ্যমে।

সখা কথার অর্থ হল বন্ধু। এই অর্থে সখা পাতা কথাটি আক্ষরিক অর্থে বন্ধু নির্বাচন করা। তোবুও সাধারণ বন্ধু নির্বাচন ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার সখা পাতার মধ্যে কিছু নীতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, একে অন্যকে জানার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। অনেক সময় এই বন্ধুত্ব বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়।কিন্তু সখাপাতা লোকাচারেদুইজন সমবয়সী মানুষের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক সুখ দুঃখের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও বৈবাহিক সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠে না। কারন উভয় সবার মধ্যে একটি

পারিবারিক নীবির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন আরেকজনের বাবা ও মাকে সম্মোধন করে তাও ও মাও তেমনি বন্ধুর বা সখার বড় বোন তারও বড় বোন এবং দিদি বলে সম্বোধন করার রীতি প্রচলিত।[৭]

উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার হিসেবে 'সখা পাতা' অনুষ্ঠানটি লোকায়ত হলেও এর মধ্যে কিছুটা নতুনত্বের আভাষ পাওয়া যায়। প্রাথমিক ভাবে দুই কিশোরের পরিবারের অভিভাবক বৃন্দ মিলিত হয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।এবং কোনো এক পূর্ণ তিথিতে কোনো পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্পর্কটিকে পূর্ণতা দেওয়া হয়। উত্তর বঙ্গে এই সখা পাতা লোকাচার টি এতটাই প্রচলিত ছিল যে, এই লোকাচারটিকে কেন্দ্র করে অনেক সময় মেলার নামকরণ করা হয়েছে 'সখাপাতা' মেলা।এই লোকাচার টি পালনের উপকরণ হিসেবে দুই জোড়া সুপারি(কাঁচা গুয়া) ও দুই জোড়া পান।[৮] ব্যাবহার করা হয়। কোন নদীর তীরে এই লোকাচার টি পালনের সময় উভয় কিশোর নদীর জলে খুব দিয়ে হাতের মুঠোয় রাখা পান-সুপারি বিনিময় করেন এবং আজীবন সখ্যতা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করেন। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক সম্পর্কের মেলবন্ধনের এক অন্যতম নিদর্শন এই সখাপাতা লোকাচার। আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাব বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৌঁছে গিয়েছি মানুষের হৃদয়ে। ফলে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যান্য চিরাচরিত লোকাচার গুলোর মতো এই সখাপাতা লোকাচার টি কাজ বিলুপ্তির পথে।

ভাদাভাদি: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক লোকাচার হল ভাদাভাদি বা সইপাতা । ভাদাভাদি অপেক্ষা সইপাতা শব্দটি বেশী প্রচলিত। কারন একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এটি ভিন্ন নামে পালন করা হয়। কোচবিহার সহ জলপাইগুড়ির কিছু অংশে বাদাবাদি এবং অবশিষ্ট জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স এলাকা, দার্জিলিং জেলার নির্মম অংশ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় লোকাচারটি 'সইপাতা' নামেই অধিকতর পরিচিত।[৯] প্রচলিত এই লোকাচার টি সম্পুর্ন ভাবে একটি রাজবংশী মেয়েলি লোকাচার। এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের থানচিরি গৃহদেবতার বেদীর সামনে একটু যায়গা জলে ভিজিয়ে দিয়ে বারো রকমের শষ্য বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের সময় ও তা থেকে চারাগাছ বেরোনোর এক মাসের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুই কিশোরীর অভিভাবক পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ভাদাভাদি লোকাচার পালনের জন্য ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। যে দুইজন বালিকার মধ্যে ভাদাভাদি বা সই পাতানো হবে তাদের যে কোন একজনের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে দই, মিষ্টি, করা, নতুন বস্ত্র, কাগজ অথবা টিনের তৈরি নৌকা, বাঁশের তৈরি তীরধনুক ইত্যাদী সংগ্রহ করা হয়। ড: গিড়িজা শংকর রায় তার 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও পূজা পার্বণ' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন "পূজার সময় কিশোরীদের মুখে যে ছড়ার বা কথার উল্লেখ করা হয় তা হল "স্বয়ামীর মনত যদি খটা দিস, তে এই তীর দিয়া তো্র হাতোত হানিম"।[১০] এই লোকাচার পালনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে উভয় কিশোরী কোন নদী কিংবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে উভয়ে উভয়ের হাতের পান সুপারি আদান-প্রদান

করে এবং নতুন শাড়ি পরে তুলসী তলায় ধর্মদেবতা ও অন্যান্য লোক দেবতাদের সাক্ষী রেখে উভয়ে বন্ধুত্ব কে আটুট রাখার সংসদ গ্রহন করেন। সপথের সময় তারা উচ্চারণ করেন "ধর্মঠাকুর আর এইঠেকার সগাকে সাক্ষী মানিয়া বামেরা সি পতাছি।হামার এই দুই ঝনকার মিল কুনো দিন ভাঙ্গিবার না হয়।সইত্য সইত্য সইত্য।"[১১] তুলসী চলার এই সংসদ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই লোকাচার টির দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে কাগজ বা টিনের নৌকা ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি।এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বাড়ির উঠোনে তৈরি গঙ্গানদীর দুই তীরে সমবেত হন। ছোট নালার মতো হলেও জল ও ছোট ছোট কচুরিপানা দিয়ে তাতে নৌকা ভাসানো হয়। গঙ্গারূপী নদীর উভয় দিকে বাঁশের তৈরি তীর ধনুক নিয়ে দারিয়ে উভয় কিশোরী উভয়ের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং কুনজরে না দেখার সংসদ গ্রহন করেন। এক কিশোরী আর এক কিশোরীর উদ্দেশ্যে বলে "আজিহাতে হামেরা সই হইলং। দোনঝনে সুখ ও দুঃখের ভাগিদার। বিয়ার পাছোত ভূলি না যাইস।"[১২] এই লোকাচারের তৃতীয় পর্যায়ে বাদ্যগীত সহ নিকটবর্তী কোন নদীর তীরে সইপাতার অবশিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এখানে উভয় কিশোরীর হাতে এক জোড়া করে পান সুপারি দিয়ে নদীর জলে নামিয়ে দিয়ে এক জন মহিলা হাঁটু সমান জলে নেমে চালুনবাতি দেখিয়ে কিশোরীদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেন এবং উপস্থিত সকল মহিলা উলুধ্বনি দিয়ে কিশোরীদের মঙ্গল কামন করেন। এর পর উভয় কিশোরী নদীর জলে ডুব দিয়ে উভয়ে উভয়ের পানসুপারি আদান-প্রদান করে এবং উচ্চারণ করে "তোর গুয়া-পান মোক দে, মোর গুয়া-পান তুই নেই।"[১৩] এইভাবে বাদাবাদি বা পাতা লোকাচার টি সম্পন্ন করা হয় এবং উভয় পরিবারের মধ্যে একটি নিবীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভাদ্র সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের মেলা ভাদাভাদি মেলা নামে পরিচিত হয়। কিন্তু কালের প্রবাহে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই লোকাচার টি আজ প্রায় বিলুপ্ত। ফলে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বাচক গোষ্ঠী আত্মপরিচয়ের সংকটের সৃষ্টি হয়।

জিগা গাছের সাথে সই পাতা: উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ঘন নিবিড় অরণ্য। স্বভাবতই এই অঞ্চলের মানুষের কাছে অরণ্য যেমন কিছু সংখ্যক মানুষের জীবন জীবিকার উৎস তেমনি গাছ তাদের কাছে পরম বন্ধু। এই গাছকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি লোকাচার হল জিগা গাছের সাথে সইপাতা। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশে এই বৃক্ষ জাতীয় গাছ জিগা, অনেকেই আবার এই গাছ টিকে জিওল বা জীবন্ত গাছও বলে। গাছটির সহজে মৃত্যু হয় না বলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে সই পাতানোর রীতি পরিলক্ষিত হয়।"উত্তরবঙ্গের বাচক গোষ্ঠীর কৃষি সমাজে মহিলা মহলের নিকট এই জিগা গাছ অত্যন্ত প্রিয়। যেন কোনো রমণীর নাড়ীর সাথে একসূত্রে গাঁথা"।[১৪] রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহিত মহিলা তাদের সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় অথবা পর পর সন্তানের জন্ম দিলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে মারা যায় তাঁরা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন যে জিগা গাছের সাথে সই বা সখি পাতানো হলে সই

জিগাই তাদের সন্তান কে রক্ষা করবে।একথা ঠিক যে জিগা গাছের প্রান আছে কিন্তু ভাব প্রকাশের বা চলার ক্ষমতা নেই।কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলাদের এই গাছটির প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই জিগা গাছের সাথে সই পাতানোর লোকাচার অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী জিগা গাছের সাথে সই পাতালে ঐ মহিলার আর কোনো সন্তান জন্মাবার পর মারা যাবে না।[১৫]

এই লোকাচার পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য প্রায় সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট মহিলাকেই করতে হয়। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একাজে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে সহযোগিতা করেন। সখাপাতা লোকাচারের মতোই এটিও একটি নির্দিষ্ট শুভ দিনে আয়োজন করা হয়ে থাকে। সই এর জন্যে বাড়ীর কাছেই কোন একটি নির্দিষ্ট জিগা গাছ নির্বাচন করে তার চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করা হয়। গাছের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত জল ঢেলে ধূলাবালি পরিস্কার করার রীতি প্রচলিত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে যেকোনও একজনকে জিগা গাছের হয়ে অভিভাবকত্ব করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নারীরূপী জিগা গাছ টিকে নতুন শাড়ী পরিয়ে সংশ্লিষ্ট মহিলার সমান উচ্চতায় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয় এবং উভয় দিকের ডালে শাঁখা পরিয়ে এক রূপবতী নারীতে পরিনত করা হয়। এর সংশ্লিষ্ট মহিলা নিষ্ঠার সাথে ভক্তিভরে সই জিগার কাছে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি মনে মনে বলেন "সই জিগা,তুই তো মোর সই। মোর চাওয়া জমজমের পর মরি যায়। সই তুই আশির্বাদ কর ছাওয়া যেন যুগ যুগ বাঁচি থাকে।[১৬] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস ও লোকাচার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেমানান ও কুসংস্কার বলে মনে হলেও যুগ যুগ ধরে এই প্রথা লোকজীবনে পালিত হয়ে আসছে। আসলে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীরই সমাজ জীবনে চলার পথে কিছু নিজস্বতা আছে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ও তার ব্যাতিক্রম নয়। একুশ শতকের চলমান সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকাচার আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবুও গ্রামীন কৃষিজীবি রাজবংশী লোকসমাজে মর্যাদার পালিত হতে দেখা যায়, একেবারে মুছে যায়নি।

বট পাকিরির বিয়াও: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলের আদি নিবাসী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অরণ্য সংকুল হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে অরণ্য কখনো মানুষ হিসেবে সখ্যতা পেয়েছে আবার কখনো দেবতার আসনে বসে হয়ে উঠেছে উপাস্য দেবতা। প্রকৃতির পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ওপর একটি পারিবারিক লোকাচার হল বট পাকিরির বিয়াও। পারিবারিক ও সমাজ জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ হল বিবাহ প্রথা। প্রত্যেকটি মানুষের বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সন্তানের জন্ম দিয় বংশ বিস্তার করা। কিন্তু বিবাহিত জীবনে হাজার চেষ্টা করেও অনেক দম্পতিরই এই সন্তান সুখের সন্ধান মেলে না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে তারা এই পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত তারা বট ও পাকুর বা পাকিরি গাছ কে সন্তান স্নেহে লালন পালন করে বিবাহ দেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরজন্মে বিশ্বাস করেন । আর এই বিশ্বাস কে অবলম্বন করেই বট 'পাকিরির বিয়াও' লোকাচার পালনের রীতি প্রচলিত। শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় এই লোকাচার ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশি প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের এই লোকাচার টি সাধারনত দুই ভাবে পালিত হতে দেখা যায়, যথা-মানুষের সঙ্গে গাছের এবং গাছের সঙ্গে গাছের। "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী

সমাজে গাছের সঙ্গে গাছের বিবাহ রীতি প্রচলিত। এই ধরনের চিরাচরিত সংস্কার ও বিশ্বাস বলেই কোন নিঃসন্তান দম্পতি বয়স্কা বিধবা মহিলা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তার ধারে বট ও পাকুর গাছের চারা রোপণ করে কয়েক হাত দূরে রোপণ করে কদম গাছ"।[১৭] সাধারণ নরনারীর বিবাহের মতই সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পাদন করা হয়। ব্রাহ্মন,অধিকারী ও প্রচলিত বাদ্যগীত সহযোগে আত্মীয়স্বজন নিয়ে এই 'বট পাকিরির বিয়াও' লোকাচার উপালয করা হয়। এখানে বট গাছ কে পুরুষ কল্পনা করে ধুতি পরিয়ে বর বেশে এবং পাকুর গাছকে মহিলা কল্পনা করে কনে বেশে সাজানো হয়। ঠাকুর গাছটির গায়ে মানুষের সমান উচ্চতায় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয় এবং শাখায় দুইটা শাঁখা পরানো হয়। কিছুটা দূরে রোপন করা কদম গাছটিকে সাক্ষী মেনে অনুরূপ ভাবে সাজানো হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও যুক্তিবাদী লোক সমাজের নিকট এই প্রাচীন লোকাচার পালনের কোন সারবত্তা নেই বলে বট পাকিরার বিয়াও আজ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না।[১৮] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচারকে বৃক্ষপোষনাই বলা যেতে পারে। উন্নত নগর জীবন ও অহরহ বৃক্ষনিধনের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষার জন্য এই লোকাচারটি আবারও নতুন করে শুরু করার তাগিদ অনুভব করা যায়।

মিতর ধরা বা মিস্তোর ধরা: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ে বিবাহ একটি অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। এই বন্ধনের মাধ্যমে নরনারী বাস্তবিক সমাজ জীবনে প্রবেশ করে।বিবাহের সময় পালনকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার হল মিতর বা মিস্তোর ধরা। বিবাহ কেন্দ্রিক এই লোকাচার প্রাচীন কাল থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।[১৯] এই লোকাচার সংশ্লিষ্ট উভয় পরিবারকে একটি পবিত্র আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রথা অনুযায়ী মিতর ধরা প্রথা টি বর পক্ষকেই পালন করতে হয়। পাশ্ববর্তী গ্রামের পূর্ব পরিচিত কোন সমবয়সী ছেলেকে মিত্র বা মিস্তোর হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভ দিনে প্রায় বরের মতো বেশেই মিতর বিবাহ বাসরে উপস্থিত থেকে যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। "এই অনুষ্ঠানে মোঃ মিত্র বলে ব্রাহ্মন কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র অনুসরণ করে জলপূর্ণ কলসি থেকে আম পল্লব দ্বারা নবমিত্র বরং কনের উদ্দেশ্যে জল ছিটিয়ে দেয় এবং নবদম্পতিকে স্বর্নালঙ্কার সহ অন্যান্য সামগ্রী দান করে"।[২০] এইভাবে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয় পরিবারের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখের ভাগিদারে পরিনত হয়। উভয় মিতর উভয়ের ভাইবোনদের নিজের ভাইবোনদের মতো স্নেহ করে এবং বাবা-মা কে 'তাঐ ও মাঐ' বলে সম্বোধন করেন।

জলছিটা: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আরও একটি বিবাহ কেন্দ্রিক পারিবারিক লোকাচার হল জলছিটা বা পানি ছিটা প্রথা। এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে জলছিটা লোকাচার সামাজিক বিধিবদ্ধ অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে। বিবাহ অনুষ্ঠানে জলছিটার জন্য প্রতিবেশী কোন বয়স্ক পুরুষ কিংবা মহিলাকে নির্বাচন করা হয়।অবশ্য তাকে অবশ্যই সম্পর্কে কাকা, জ্যাঠা কিংবা জ্যাঠিমা পর্যায়ের হওয়া চাই। কেননা বরং কনের মাথায় জল ছিটালে তাদের সাথে বরং কনের সম্পর্ক হবে 'জলছিটা বাপ বা জলছিটা মা।'[২১]

এই লোকাচার পালনের জন্য বিশেষ কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় না। বিবাহ বাপরে অন্যান্য যাবতীয় প্রথা পালনের পর ও আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা যৌতুক প্রদানের আগে পূর্ব নির্ধারিত পুরুষ কিংবা মহিলা আমের পল্লব দিয়ে বিবাহ বাসরের ঘটের জল বরং কনের মাথায় ছিটিয়ে দেয়। এই আচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বরং কনের জলছিটা ব্যক্তির জলছিটা 'ব্যাটা ও বেটি'তে পরিনত হয়। পরলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী জলছিটানো বাবা কিংবা মা পরলোক গমন করলে জলছিটা ব্যাটা বা ছেলে ও বেটি বা মেয়ে কে তিনদিন অশৌচ পালন করে মৃতব্যাক্তির আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করতে হয়।

ভাত ছোঁয়ানি: রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে একটি প্রচলিত লোকাচার হল ভাতছোয়ানি বা খিরছোয়ানি প্রথা। সন্তান জন্মের পর এটি তার প্রথম ভাত মুখে তোলার অনুষ্ঠান। সাধারনত জন্মের ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে এই লোকাচার টি পালন করা হয়। অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী ও অন্যান্য তাদের Socio-cultural Issues of the Rajbanshis of North Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "it is the first feeding ceremony of the child of Rajbanshi society."[২২] শিশুর দাঁত গজানোর আগেই এই লোকাচার পালন করাহয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী একজন অধিকারী বা ব্রাহ্মনের উপস্থিতিতে মামা শিশুটির মুখে ভাত ছুঁয়ে দেয় এবং নবজাতক শিশুটিকে স্বর্ণালঙ্কার উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন। লোকাচার পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে নানান রকমের পূজার সামগ্রীর পাশাপাশি মাটি,বই খাতা,কলম,ধানের শীষ,গোবর,এবং স্বনর্ণালঙ্কার সহযোগে একটি আরতির থালা দেওয়া হয়। শিশুর মুখে ভাত তুলে দেওয়ার আগে বাবা মা উপাস্য দেবতা ও গ্রামীন লোকদেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা পাঠ করেন। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে এই লোকাচার আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে কিছুটা বিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। উত্তরবঙ্গের শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ই নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনও এই লোকাচার টি পালনের রীতি প্রচলিত। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীরই সামাজিক জীবনে কিছু নীতিগত ও আচরনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়েরও সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চলার পথে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তা তাদের একান্তই নিজস্ব। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির চরাই উতরাই চলার পথে নানাভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই সব বিপদ থেকে মুক্তিপেতে মানুষ আশ্রয় নেয় কখনো প্রকৃতির, কখনো দেবতার, কখনো অলৌকিক সাধনার আবার কখনো লৌকিক বিশ্বাসের। এই লৌকিক বিশ্বাসের পূর্ণতা পায় লোকাচারের মধ্য দিয়ে। তাই লোকবিশ্বাস ও লোকাচার উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রত্যাহিক জীবনের অংশ বলেই বিবেচিত হয়। কালের নিয়মে মানুষ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সভ্য হয়েছে, বদলেছে মানুষের জীবনশৈলী। আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সামাজিক বিবর্তন। ফলে অনন্তকাল ধরে বয়ে আসা চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সামাজিক আচার আচরণ গুলিও ক্রমশ পরিবর্তনশীল এবং গ্রামীন লোকজীবনের লোকাচার গুলি ক্রমশ ক্ষীয়মান ও প্রায় বিলুপ্ত। অথচ এই লোকাচার গুলোর মধ্যেই বেঁচে থাকে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা। সুতরাং এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা ও পরিচায়কে বাঁচিয়ে রাখতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা

নাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার বিষয়টি শুধুই ইতিহাসের পাতায় চাপা পরবে। তাই এই পারিবারিক লোকাচার গুলোর প্রচার,প্রসার ও পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করা আবশ্যক বলে মনে হয়।

তথ্য সূত্র:

১.দাস,নির্মল,উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১।
২.বর্মন,ধনেশ্বর,উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার,কলকাতা, ২০০৭,পৃষ্ঠা-৭২।
৩.তদেব,পৃষ্ঠা-৭১
৪.বসাক, ড. শিলা,বাংলার ব্রত পার্বন, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৮।
৫.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৭৩।
৬.তদেব, পৃষ্ঠা-৮০।
৭.তদেব, পৃষ্ঠা-৮১।
৮.তদেব, পৃষ্ঠা-৮১।
৯.তদেব, পৃষ্ঠা-৮২।
১০.রায়, ড.গিরিজা শংকর,উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ,১৯৭০,পৃষ্ঠা-১২৮।
১১.রায়,ড.গিরিজা শংকর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রীয় জাতির পূজাপার্বণ, শিলিগুড়ি,১৯৯৯,পৃষ্ঠা-৩-৪।
১২.বর্মন,ধনেশ্বর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫।
১৩.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬।
১৪.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৭।
১৫.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮।
১৬.রায়, ড. গিরিজা শংকর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৯৯।
১৭.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯৪।
১৮.তদেব,পৃষ্ঠা-৯৫।
১৯.অধিকারী,মাধব চন্দ্র ও অন্যান্য, Socio-cultural Issues of the Rajbanshis of North Bengal, Delhi ,2021,p-72.
২০.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯৭।
২১.তদেব,পৃষ্ঠা-৯৮।
২২.অধিকারী, মাধব চন্দ্র ও অন্যান্য প্রগুক্ত,পৃষ্ঠা-৭৭।

কথাসাহিত্যের সামাজিকতা - উপন্যাস সাহিত্যের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বাস্তবতা

ড. অমিতাভ কাঞ্জিলাল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ

উদ্ভবের সময়কাল থেকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল মূলত নৈতিক প্রসঙ্গ, উপদেশ, পরামর্শ কিম্বা অনুজ্ঞা'কে সহজবোধ্য সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রকাশ করবার জন্য রূপক আকারে কাহিনী বা কাব্যের আশ্রয় নেওয়া। সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং ঐতিহ্যগত আচরণগুলিকে বৈধতা দিতে গিয়ে তাদের সুফলকে জনসমক্ষে প্রচার করবার উপায় হিসেবে সাহিত্যে জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা'কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে, শুভ-অশুভের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত শুভশক্তির অমোঘ বিজয় সুনিশ্চিত বলে দেখানো হয়েছে - অর্থাৎ - মানবজীবনকে ইতিবাচক মূল্যের আলোয় উদ্ভাসিত করতেই সাহিত্যের অবতারণা হয়েছে। প্রাচীন সংহিতা ও সূত্রসমূহ বা পরবর্তীতে শাস্ত্রগ্রন্থাদি যে জীবনধারা ও যাপনশৈলীর ন্যায্যতা প্রচার করেছে এবং প্রবর্তন করতে চেয়েছে, তার সাপেক্ষে যুক্তির বিন্যাস নিয়েই রূপকে প্রচলিত হয়েছে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতকের কাহিনী, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে লোকায়ত জীবনের ছড়া, গান, অভিনয়, কথকতা, ধাঁধা ইত্যাদি। তাই সাহিত্যের 'ইন্সট্রুমেন্টাল' ভূমিকা সুবিদিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজকাঠামোর অভিযোজনের সাথেসাথেই সাহিত্যে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার প্রসার ঘটেছে। কথাসাহিত্যের আধুনিক স্তর উপন্যাসের আবির্ভাব থেকেই সাহিত্যের কোরকে নৈতিক-সামাজিক মূল্যবোধের বীজন নিয়ে নানা কথা উঠেছে, পরবর্তীতে তা দুটি বিপ্রতীপ শিল্পদৃষ্টি শিবির অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদ ও মতাদর্শিক শিল্পবাদের ধ্রুপদী তর্কে প্রবেশ করেছে। সেই বিতর্ক আবার কালসাপেক্ষিক বয়ান হাজির করেছে অভিনবত্বের সাথে। আলোচ্য নিবন্ধ'টি সাহিত্য ও সামাজিকতার মিথষ্ক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টায় দেশীয় উপন্যাসের আখ্যান-বাস্তবতার দিকে অবলোকনের একটি প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে।

সূচকশব্দ : মূল্যবোধ; সাহিত্য; উপন্যাস; সামাজিকতা; রাজনীতি; উত্তর-ঔপনিবেশিকতা

সমাজের সাথে মানবজীবনের বন্ধন চিরায়ত, অভিজ্ঞতার ফসলকেই 'জীবন' বলে চিহ্নিত করি আমরা। সেই জীবনের আলোতে-অন্ধকারে সমাজের যে প্রতিচ্ছায়া তৈরি হয়, তাইই সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব সাহিত্য সমাজ-বিযুক্ত কিংবা সামাজিকতার বৃন্তচ্যুত কোন সুফল নয়; সাহিত্যিকও সমাজ-বহির্ভূত কোনো অলৌকিক জগতের কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব নন। তাই তাঁদের সৃজিত কথাজগত সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার

উপাদানেই নির্মিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যেও থাকে একধরনের বাস্তবতা, যা সামাজিক অভিজ্ঞতার শৈল্পিক ব্যঞ্জনাকে উপস্থিত করে। কথা সাহিত্যিকেরা ঘটনার সুখসঞ্চারী এবং অস্বস্তিকর নানা পর্ব পার করে চরিত্রের অন্তর উন্মোচনের জন্য সদাপ্রয়াসী। তাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি ভিড়ের মধ্যেও আপন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যে ধরা পড়ে কথাসাহিত্যিকের উপলব্ধির জগত এবং বাস্তব জগতের সাথে স্রষ্টা-চৈতন্যের দ্বান্দ্বিক অবস্থান। স্বভাবতই কাহিনী রচনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে সামাজিক অবস্থার যে চিত্রন একজন কথাসাহিত্যিকের রচনা থেকে উদ্ধার করা যায় তার মধ্যে তার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সর্বদাই প্রস্ফুটিত হয়।

সময় ও সভ্যতার সংকটকে তার দর্পণে প্রতিফলিত করে সাহিত্য, তাকে ধারণ করে মর্মের মতো। কথাসাহিত্যের আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতায় স্তরীভূত হয়ে আছে বহু মানুষের প্রতি অপর মানুষের বহুকালব্যাপী শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার ইত্যাদির গ্লানিময় ইতিকথা, বিধৃত হয়ে আছে ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে আত্ম-উন্মোচনের নানান কাহিনী। মানবজীবনের এই সক্রিয়তা এবং তার মানসিক বিবিধ চাহিদা, প্রত্যাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ইত্যাদির মধ্যে প্রতিনিয়ত যে টানাপোড়েন চলতে থাকে তার ওপর গভীর ছায়া ফেলে সমসাময়িককালে বা অজানা কাল থেকে প্রবাহিত সমাজ আরোপিত ব্যাষ্টির দ্বারা স্বীকৃত বিবিধ নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধ। ব্যক্তিস্বার্থ সেসবের সাথে বোঝাপড়া করে জীবন অতিবাহিত করতে অনেকক্ষেত্রেই অপারগ অথবা অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে - তখন সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বা পরিস্থিতি বদল হওয়ার সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয়কর পরিবর্তন ঘটতে পারে, মানবিক অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, আবার কখনও কখনও তার মধ্যে দিয়েই মানুষের চেতনার নতুন আদর্শে কিম্বা মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ ঘটতে পারে। মানুষই রচনা করে যুগধর্ম, মানুষই তার পরিবর্তন ঘটায়। সমাজ-সন্নিষ্ঠ সাহিত্যিক সেই যুগধর্ম তাঁর মানস চরিত্রে প্রতিফলিত করে কাহিনী রচনা করেন কিংবা যুগধর্মের বিচ্যুতিকে অথবা তার রূপান্তরের ধারাবিবরণী রেখে যান সৃজিত সাহিত্যের রূপকে। এইভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে বিশ্ববীক্ষা ও কাল-পরিক্রমা, সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন দ্রষ্টা।

মানবিক মূল্যবোধ ও সাহিত্য - উপক্রমণিকা

বলাই বাহুল্য, 'মানবিক মূল্যবোধ' বিষয়টি বিশেষ গভীরতা এবং ব্যাপ্তিসম্পন্ন প্রবহমান ধারণা, যার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অথবা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ সাহিত্য কিম্বা সমাজশাস্ত্রে আজও ঠিকঠাক সম্ভব হয়নি। সাধারণ জ্ঞানের নিরিখে বলা চলে, প্রতিটি সমাজ, সম্প্রদায়, সঙ্ঘ, পরিবার তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করবার জন্য বেশকিছু অলিখিত নৈতিক মানদন্ড, প্রথা, বিধি ইত্যাদিকে আচার-আচরণের অবলম্বন বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যার অভিষ্ট লক্ষ্য হলো সামাজিক বন্ধন, নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক বিশ্বাস, নিরাপত্তার আশ্বাস তথা তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি অর্জন। এইসব বিধি-বিধান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অনুশীলন সমাজস্থ মানুষের মনোভাবে সম্পৃক্ত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ বেঁচে থাকার মধ্যে স্বস্তিসঞ্চার করে এবং আস্থার ভিত্তিতে সামাজিক অগ্রগমনের গতিকে উৎসাহিত করে। ডেভিড পোপেনো (David Popenoe) বলেছেন, "ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা, তার নামই হলো

মূল্যবোধ।"[১] মূল্যবোধগুলিকে এক ধরনের অকৃত্রিম ও ন্যায্য বন্ধন হিসেবে প্রযুক্ত হবার বিষয় হিসেবেই দেখা হয়। মনে করা হয়, আত্মীয়তার বন্ধন, রক্তের সম্পর্ক, গোষ্ঠীর সংযুক্তি ইত্যাদির দ্বারা যেমন ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তেমনি এসবের অনুপস্থিতিতেও আরো একটি প্রভাবের দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, চালচলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা হলো মানবিক মূল্যবোধ। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে মানবিক মূল্যবোধ হলো আদর্শের মাপকাঠিতে নিয়োজিত নানা রীতিনীতি, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের আকারে সঙ্ঘবদ্ধ সভ্য জীবনযাত্রার প্রতি ব্যক্তি এবং ব্যক্তিসমূহের আনুগত্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সার (H. Spencer) বলেছেন, "মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড, যা আচরণের ভালো-মন্দ বিচারের এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্প লক্ষ্য হতে কোনো একটি পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।"[২] নীতি যেমন ভালো ও মন্দের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়, তেমনি মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্মান ও সম্ভ্রম বন্টনের মানদণ্ড হয়ে ওঠে; অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে শিষ্ট ও সুশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করেন এবং পক্ষান্তরে মূল্যবোধবর্জিত জীবনযাত্রাকে সমাজবিরোধী ও অসামাজিক বলে চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক কল্যাণসাধনের মাধ্যম হিসেবেও মানবিক মূল্যবোধকে দেখার প্রয়াস নিয়েছেন সমাজবিদেরা, যেমন এফ. ই. মেরিল (F. E. Merril)-এর মতে, সামাজিক মূল্যবোধ হলো বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।[৩] এইভাবে প্রতিষ্ঠানবাদী তাত্ত্বিকেরা মানবিক মূল্যবোধকে শুভ-সভ্য জীবনপ্রণালী নির্মাণের কার্যকরী উপাদান হিসেবে গণ্য করে এসেছেন।

আবার প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মানবিক মূল্যবোধ আসলে একটি বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলকে 'স্থিতাবস্থা' হিসেবে কায়েম রাখার হাতিয়ার বলে গণ্য হতে পারে। বরং তারা প্রচার করতে চান, মানবিক মূল্যবোধ একটি সতত পরিবর্তনশীল ধারণা, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে বলে তার সময়ানুচারিক কর্তব্যপালনের প্রতি ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। মূল্যবোধগুলি সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত হতে পারে এবং নিত্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠান-অনুগামীতার বদলে সময়-অনুগামী আচার-আচরণ গড়ে তোলার স্বপক্ষে মানবিক মূল্যবোধকে পরিচালিত করা উচিত বলে প্রতিষ্ঠান বিরোধীরা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তাই প্রতিষ্ঠানপন্থীদের চোখে যা মানবিক মূল্যবোধের 'বিচ্যুতি' বলে চিহ্নিত হয়, তাকে প্রতিষ্ঠান-বিরোধীরা 'সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা' নামক আতসকাঁচের নিচে যাচাই করে দেখতে চান। অধ্যাপক এইচ.ডি. স্টেইন মানবিক মূল্যবোধ'কে Community Conscience বা 'সমষ্টির বিবেক' বলে আখ্যা দিয়েছেন; তাঁর মতে, "সামাজিক শিষ্টাচার, সততা ও সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, দানশীলতা, উদারতা প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তির সমষ্টি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল কারণ স্থান ও কালভেদে এ সবের আলাদা আলাদা তাৎপর্য গড়ে উঠতে পারে। এমনকি সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়।"[৪] স্টুয়ার্ট কার্টার ডড

বলেন, "মূল্যবোধ এক ধরনের জাগ্রত চৈতন্য যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির থেকে লাভ করে। এর দ্বিবিধ রূপ আছে - যখন এইসব মূল্যবোধ বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় লোকাচার বা Mores আর যখন এই সমস্ত মূল্যবোধ ব্যক্তির নিজস্ব বিবেচনার উপর নির্ভর করে প্রযোজ্য হয় তখন তাকে বলা হয় লোকনীতি বা Folkways"[৫] একই সমাজে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী মানবিক মূল্যবোধের সহাবস্থানকে তাই তারা 'সামাজিক স্ববিরোধিতার নমুনা' না-বলে সমাজে বহুতর স্বার্থের বাস্তব উপস্থিতির প্রতীকী প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাই প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের কাছে মানবিক মূল্যবোধ একধরনের সচল ধারণা, যা সামাজিক বিবর্তনের অনুসারী চরিত্র ধারণ করে।

প্রতিষ্ঠানবাদী ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রবক্তাদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছেন বস্তুবাদী চিন্তকরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মানবিক মূল্যবোধগুলি আসলে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার অনুসারী অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত বিবিধ স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্ভূত এবং প্রচারিত কিছু ধ্যান-ধারণা, যার অধিকাংশের একটি নৈতিক ভিত্তি রয়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা হলেও আসলে তা কোন না কোন বাস্তব স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে সমাজের স্থিতিশীলতার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন একধরনের মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টায় সক্রিয় থাকে যাতে মানুষ নিজেকে ভোক্তার পরিচয়, প্রত্যাশায়, সংস্কারে অভ্যস্থ করে তুলবে এবং তার দৈনন্দিন জীবনে নিজেকে ছাড়া অপর সবকিছুকে ভোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতে থাকবে। মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে সমাজে দুটি মুখ্যশ্রেণি এবং কতগুলি গৌণশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং মুখ্যশ্রেণি দুটির স্বার্থ একটি অপরটির বিরোধী হয়, তাই যতদিন শ্রেণীগুলি টিঁকে থাকে সমাজেও বহু পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী মূল্যবোধগুলির মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম প্রভাব সৃষ্টি করে, যা থেকে সমাজের কোনো মানুষই নির্বিকার থাকতে পারেন না। মার্কসবাদীরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, নৈতিক, সৌন্দর্যবিষয়ক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রধান দুটি শ্রেণীস্বার্থের অনুকুল বা প্রতিকুল মতাদর্শের অঙ্গ বলেই বিবেচনা করেন এবং বলেন "Ideological control results in False Consciousness - individuals not being aware (conscious) of their true class position or their exploitation by the ruling class. They are in a state of illusion." বিভিন্ন মতাদর্শভিত্তিক মূল্যবোধ এক ধরনের 'ঝুটা চেতনা' সঞ্চার করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে সেই ঝুটা চেতনার বশবর্তী করে তাদের প্রকৃত শ্রেণীগত অবস্থান এবং শোষণ সম্পর্কে অনবহিত রাখার চেষ্টা চালায়।[৬] বিদ্যমান মূল্যবোধ ব্যবস্থা যখন একটি শোষণকামী উৎপাদনব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার চেষ্টায় সমাজ বাস্তবতার সাথে চূড়ান্ত বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তখনই বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুনতর উৎপাদন প্রণালী

ও উৎকৃষ্টতর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী সামাজিক ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধগুলি আমূল বদলে যায়।

আমাদের দেশের লোকসাধারণের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে ব্যক্তির সম্মানের সঙ্গে নীতির এবং নীতির সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতির এক ধরনের শক্তিশালী যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে। এই যোগাযোগ বা সম্পর্ক যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। নৈতিক বিচ্যুতির ফলে ব্যক্তিজীবনে এবং ব্যাষ্টিজীবনে অনৈতিকতা এবং আদর্শহীনতা দেখা দিতে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ যখন নিম্নগামী হয় তখনই নানা ধরনের নেতিবাচক প্রপঞ্চ মানুষের যাপিত জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে, যা সমাজ এবং সংসারকে নানাভাবে বিদ্ধ করে। একসময় এই সমাজে তা থেকে নানা ধরনের অসঙ্গতি, অস্থিরতা, অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ, আগ্রাসন ইত্যাদি উদ্ভব হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানবিক মূল্যবোধের মূল চালিকাশক্তি বিবেক বা চক্ষুলজ্জার ভূমিকা ক্রমাগত খর্ব হতে থাকে ব্যক্তিমানুষ বেপরোয়া, উশৃংখল, আত্মসুখী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকেন, যা মূল্যবোধের সংকট ঘনীভূত করে তোলে। ভোগবাদী মানসিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিয়ন্ত্রণহীন সম্প্রসারণ, মানুষের মনন-মেধায়-সত্তায়-অস্তিত্বে একদিকে যান্ত্রিকতা অন্যদিকে শেকড়হীন আধুনিকতার অবিমৃষ্য হুযুগ সামাজিক সম্পর্ক, রীতিনীতি, বন্ধন, শৃংখলা, মূল্যবোধের ব্যাপক রকম পরিবর্তন সাধন করেছে। 'সামাজিক জীব' মানুষ এখন সমাজবিমুখ হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলছে। প্রচলিত সমাজ-শৃংখলার প্রতি মানুষ যদি একবার আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং আইন নিজের হাতে নেওয়ার মতো সামাজিকতাকেও কেবল নিজের স্বার্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে, তাহলে এক ধরনের সামাজিক-নৈরাজ্য দেখা দেয়, ব্যভিচার প্রশ্রয় পায়, অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বার্থপূরণ প্রত্যেক প্রাণীর কাছে প্রত্যাশিত, কিন্তু মানুষ নৈতিক মূল্যে তাকে বিবেচনা করে বলেই যেনতেন প্রকারেন স্বার্থপূরণকে অনৈতিক বলে ধার্য করে। তাই প্রতিযোগিতারও কিছু নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছে সমাজ। কিন্তু কেন মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ থেকে স্বার্থের প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে? আসলে সমস্যাটা তার নিরাপত্তাবোধের উপর নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় সে নিরাপদ বোধ করে না, তখনই সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে চলে তার যাপন। স্পষ্টতই তখন তার কাছে মূল্যবোধের দুটি স্তর নির্ধারিত হয়ে যায় - একটি অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রামাণ্য মূল্যবোধ, যাকে সমষ্টির মূল্যবোধ বা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়, অন্যদিকে ব্যক্তির নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষিত থেকে তৈরী কিছু ব্যবহারিক মূল্যবোধ।এই ব্যবহারিক মূল্যবোধ অনেকটাই তার প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত কিন্তু পরিবর্তিত সমাজ-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। অতএব তা পূর্বপ্রচলিত মূল্যবোধ থেকে পৃথক। ব্যক্তি এতদসত্ত্বেও সমাজ-বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে নিজের ব্যবহারিক মূল্যবোধকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের জন্য তর্ক, মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনা, সংলাপ ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। ব্যক্তি তখন দাবী করতে থাকে যে, সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে 'সমষ্টির মূল্যবোধ' বলে চালানোর চেষ্টা হলেও আসলে তা 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যবোধ' - সমগ্রের নয়। অতএব সংখ্যালঘু হিসেবে তারও অধিকার রয়েছে বিকল্প মূল্যবোধ অবলম্বন করে জীবন যাপন করবার

এবং সেই বিকল্প মূল্যবোধ সম্পর্কে ধ্যানধারণা প্রচার করবার। তখন সেই বিকল্প মূল্যবোধকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবী করে লোকসমাজে প্রচার করতে গিয়ে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় শিল্প-সাহিত্য কিংবা নান্দনিক প্রকাশের অন্যান্য উপায়েকে, যাতে মূল্যবোধের দুইটি বিবদমান ধারার মধ্যে কর্কশ সংঘর্ষ এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত সাংস্কৃতিক ভাষ্যে একটি মীমাংসাসূত্রে উপনীত হওয়া যায়। শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিকে প্রচারিত হলেও মূল লক্ষ্য থাকে বৃহত্তর সমাজকে বিকল্প মূল্যবোধের দিকে সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুথবদ্ধ করার চেষ্টা। এইভাবেই আমাদের দেশে অতি প্রাচীণকাল থেকে প্রবর্তিত হয়ে আসছে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, নীতিমালা, জাতকের কাহিনী নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে রচিত সাহিত্য হিসেবে। আবার একইসাথে লোককৃষ্টির পরিসরে দেখতে পাওয়া যায় 'সংখ্যাগরিষ্ঠের' নীতিকে, ধার্মিকতাকে, রাজনীতিকে, সমাজবোধকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে গড়ে ওঠা ঢপ, কবিগান, তরজা, তামাশা, নকশা, খেউড়, সং ইত্যাদি।

মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনার এই পরিসরে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন 'মানবিক' বলতে কি বোঝায় ? বুৎপত্তিগত অর্থ বিবেচনা করলে বলা যায় মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য, মানুষের কৃত কোনো ভাবনা, চেষ্টা, কাজ, উৎসাহ সবই 'মানবিক' পদবাচ্য। কিন্তু প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে 'মানবিক' কথাটির পরিধি আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যেমন মনুষ্যত্ব গুণবাচক অর্থে মানবিক; আবার যা মনুষ্যোচিত অর্থাৎ মানুষের জন্য শ্রেয় তাও মানবিক; একইসাথে মনুষ্য সম্পর্কিত সকল বিষয়াদি মানবিক; আবার মনুষ্যত্বপূর্ণ আচার-আচরণ'কেও মানবিক বলা হয়; আবার মানব-সম্বন্ধীয় সবকিছুই মানবিক বলে পরিগণিত হয়। অতএব 'মানবিক মূল্যবোধ; একাধারে মনুষ্যত্বসম্পন্ন মূল্যবোধ অর্থাৎ সুকুমারবৃত্তি নির্ভর জীবনাচরণের মূল্যবোধ (যথা - ক্ষমা পরম ধর্ম); মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে ঔচিত্যবোধ দ্বারা নির্ণিত মূল্যবোধ (যথা - সদা সত্যবচন কহিও); মনুষ্য সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ (যথা - লজ্জা নারীর ভূষণ); মানুষের ব্যবহারিক আচার-আচরণের মূল্যে গড়ে ওঠা উপযোগী মূল্যবোধ (যথা - দক্ষিন হস্তে গ্রাস গ্রহণ করিও); এবং মানুষ সম্পর্কে কোন দার্শনিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক অভিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যবোধ (যথা - মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব) প্রভৃতি সবকিছুকেই বোঝা যেতে পারে।

মূল্যবোধের পরিবর্তন ও সংকট

এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজ পরিবর্তনের যেমন একটি বিষয়গত দিক আছে, তেমনি একটি ভাবগত পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের বিষয়গত দিক বলতে মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, যোগাযোগ মাধ্যম, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবর্তনকে বোঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ সমাজের এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে মানোন্নয়ন কিংবা মানবনমনমূলক পরিবর্তন সাধিত হলে তার সামগ্রিক প্রভাবে সমাজব্যবস্থার মধ্যেও সচলতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সামাজিক জীবনযাত্রা গতিশীল হয় কিংবা মন্থর হয়ে পড়ে। আবার সমাজ পরিবর্তনের ভাবগত পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ভাষার ব্যবহার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উদারীকরণ অথবা রক্ষণশীলতার ফলে সমষ্টিগতস্তরে সংস্কারবশতা লুপ্ত হয় কিংবা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিতে-

ব্যক্তিতে আন্তঃসম্পর্ক ও সামুহিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন নানা প্রবণতা গ্রাহ্য হয় কিংবা পুরনো প্রথার প্রতি বিশ্বস্ততা জাগিয়ে তোলা হয়, সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ হ্রাস পায় কিংবা উৎসাহিত হয়। এইসব ভাবগত পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনের ফলেও সামাজিক জীবনযাত্রায় গতিশীলতা সঞ্চারিত হয় কিংবা স্থিতাবস্থা ও বদ্ধদশা সৃষ্টি হতে পারে। সমাজবদ্ধ মানুষ সেই সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে নিজেকে চলনসই করে নইলে কিংবা সামাজিক স্থিতাবস্থার সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুললে বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের সাথে তার সহাবস্থান সূচিত হয়েছে এমনটাই প্রতিভাত হয়। এভাবে মানিয়ে নেওয়া বা আপোষকামীতা আসলে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাত্রার দিকে পদক্ষেপে সাহসের অভাব থেকেই আসে। এই আপোষকামীতা স্বভাবসিদ্ধ হলেও সমাজ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বা প্রস্তাবিত নতুন নিয়মাবলী, প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক ইত্যাদির সাথে যখন ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাত উৎপন্ন হয় তখন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সে বা তারা অস্বীকার করতেই পারে। এই সংঘাতে প্রগতিশীল সমাজ বনাম রক্ষণশীল ব্যক্তি (বা ব্যক্তিবর্গ) কিংবা রক্ষণশীল সমাজ বনাম প্রগতিশীল ব্যক্তি (বা ব্যক্তিবর্গ) - উভয় পক্ষই নিজেদের স্বার্থকে একটি নৈতিক যুক্তির আকারে সমষ্টির সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়। দেখানোর চেষ্টা করে যে, এই সংঘাত প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধের সংঘাত। যার পরিণামে সমাজিক মতামতে সাময়িক বিভ্রান্তি, অবস্থানদ্বৈধতা, বিতর্ক, প্রতর্ক ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত সমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই মতপার্থক্যে কোন একটি পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছে বা প্রচারিত মত'টিকে অবলম্বন করছে এবং তার মাধ্যমে মতটি সামাজিক মূলস্রোত আকারে মান্যতা পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংঘাত চলতেই থাকে। এমন দীর্ঘায়িত মূল্যবোধের সংঘাত থেকেই সামাজিক সংকট উৎপন্ন হতে পারে - যা পুনরায় সমাজ পরিবর্তনের পরবর্তী ভাবগত প্রেক্ষিত রচনা দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ মূল্যবোধের সংকটের প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে কিছু মতপার্থক্য। এই মতপার্থক্য মূলত চার ধরনের হতে পারে, যাদের আলাদা আলাদা প্রকাশভঙ্গি রয়েছে -

প্রথমত : স্বীকৃতির প্রশ্নে মতপার্থক্য। যেমন ধরা যেতে পারে 'প্রজন্ম ব্যবধান' বিষয়টি - অর্থাৎ প্রবীণ প্রজন্ম যে বিষয়গুলিকে নীতিসঙ্গত, ন্যায়নিষ্ঠ এবং শ্রেয় বলে বিবেচনা করছেন, অপেক্ষাকৃত নবীন প্রজন্মের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ততটা নাও থাকতে পারে বরং তারা বিকল্প কিছু বিশ্বাস, নিয়মাবলী, আচার-আচরণ, সম্পর্ককে অধিক সুবিধাজনক, লাভদায়ক, সাশ্রয়কারী এবং সময়োপযোগী বলে বিবেচনা করতে পারে। আধুনিকতা-অনাধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিভঙ্গির এ হেন পার্থক্য প্রজন্মগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত হয়। এর কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ সঠিক বা অপরটিকে সম্পূর্ণ ভুল বলে দেওয়াটা সমীচীন নয়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃহত্তর জনমানসে এই উভয়ধরনের মূল্যবোধের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য পন্থাটি নির্ধারিত হয় এবং সেভাবেই প্রজন্ম ব্যবধানের মীমাংসা হয়। কিন্তু প্রায় সব যুগে, সব কালেই প্রজন্ম-ব্যবধান মূল্যবোধের সংঘাত ও সংকট তৈরিতে অন্যতম কারণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, এর সাক্ষ্য ইতিহাসেই মেলে।

দ্বিতীয়ত : সমর্থনের প্রশ্নে মতপার্থক্য। যেমন ধরা যেতে পারে 'সমাজসংস্কার' বিষয়টি

- এক্ষেত্রে একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত সমাজকাঠামো বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রচলিত কোন নিয়ম বা নিয়মাবলী'কে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে 'অমানবিক' বলে চিহ্নিত করে, তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, বঞ্চিত অংশের নিরব জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে ওই প্রথা অবসানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেই উদ্যোগের পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে তাঁরা সামাজিক প্রচারণা পরিচালনা করেন অর্থাৎ একটি বিকল্প মূল্যবোধের সূচনা করতে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থার সমর্থক অংশের লোকজন ওই নিয়ম বা নিয়মাবলীকে সমাজে যুগবাহিত রীতি, ঐতিহ্য বা পরম্পরা আকারে চিহ্নিত করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে সংস্কারকামী পক্ষের সাথে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলে মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়। বিরোধিতার শুরুতে উভয়পক্ষে সমর্থকের সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং চেতনার উদ্দীপক ভূমিকার ফলে বৃহত্তর অংশের মানুষ যখন ঐতিহ্যশালী প্রথাকে সাম্প্রতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহ্য করতে অসম্মত হন, তখন সমাজসংস্কার সাধনের মাধ্যমে উক্ত মূল্যবোধের সংকটের মীমাংসা হয়।

তৃতীয়ত: যাথার্থের প্রশ্নে মতপার্থক্য। যেমন ধরা যেতে পারে 'প্রাদেশিকতা' বিষয়টি - বলাই বাহুল্য যে কোন সমাজব্যবস্থাতেই সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, সম্পদ ইত্যাদির কেন্দ্রীভবন ঘটে। অপেক্ষাকৃত প্রান্তবর্তী অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হয় অনুর্বরতা, সুবিধাহীনতা, দুর্গমতা, দূষণ ইত্যাদি। সামাজিক বণ্টনের এই চিরাচরিত সমস্যার কারণে অবস্থানগতভাবে সমাজের কেন্দ্রবাসী এবং প্রান্তবাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মনোভাবেও যথেষ্ট তারতম্য তৈরি করে দেয়। প্রান্তবাসীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব ও সংস্কারহীনতা, আদিম প্রাকৃতিক আচার-আচরণের প্রতি আস্থা এবং উদযাপন ইত্যাদি কেন্দ্রবাসীদের দৃষ্টিতে 'পশ্চাদপদতা' বলে বিবেচিত হয়, অথচ প্রকৃতির সাথে নিয়ত সংগ্রামে প্রান্তবাসীরা জীবনধারণের যেটুকু সংস্থান কঠোর পরিশ্রমে অর্জন করেন, তাঁর প্রতি কেন্দ্রবাসীদের এক ধরনের 'ক্ষুধা' সবসময় সক্রিয় থাকে ! পক্ষান্তরে প্রান্তিকজনের দৃষ্টিতে কেন্দ্রবাসীরা প্রায় 'ভিনগ্রহের প্রাণী' বলে বিবেচিত হ'ন, তাদের জীবনযাপন আদতে উচ্ছৃঙ্খল, প্রকৃতি-বিনাশকারী এবং ঐতিহ্য অবমাননাকারী বলে গণ্য হয়। ফলে অবস্থানের পার্থক্য একই সমাজে বসবাসকারী দুই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'কোন জীবনধারা যথার্থ ও সুষম' সে প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের প্রতি আস্থা গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রান্তবাসীরা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করতে চাইলেও তাদের মাতৃভাষায় সেই শিক্ষালাভের ব্যবস্থা প্রায়শঃ অপ্রতুল হবার কারণে পরের ভাষা রপ্ত করে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করতে তারা পিছিয়েই থাকে। ফলে প্রান্ত বনাম কেন্দ্রের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে সংঘাতকে ঘনীভূত করে তোলে। প্রান্তজনেরা কেন্দ্রের নিকটবর্তী হতে চাইলে সামাজিক বিদ্রুপের শিকার হ'ন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত যে, কেন্দ্রের আগ্রাসনের ফলে প্রান্ত একসময় অবলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ প্রান্তিকজনেরা প্রায় নিরুদ্দেশের পথে অন্যকোন আশ্রয়ের খোঁজে অপেক্ষাকৃত দুর্গম, অনুর্বর, দূষিত অঞ্চলের দিকে সরে যেতে বাধ্য হন অথবা কেন্দ্রের 'লেজুড়বৃত্তি' করে কোনমতে টিঁকে থাকেন। এইভাবে সমাজে কেন্দ্রবাসীদের মূল্যবোধের আধিপত্য বিস্তারিত হয়ে প্রাদেশিক বা প্রান্তিক মূল্যবোধের

বিসর্জন সমাধা হয়।

চতুর্থত: সংহতির প্রশ্নে মতপার্থক্য। যেমন ধরা যেতে পারে 'অসামাজিকতা ও সমাজ-বিরোধীতার' বিষয়টি - শিক্ষা, রুচি, অংশগ্রহণ, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তীতা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা লালিত-পালিত হতে হতে ব্যক্তির 'সামাজিকীকরণ' ঘটে অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামাজিক সংগতি অর্জন করে ব্যক্তি হয়ে ওঠে সামাজিক মানুষ। কিন্তু বৈচিত্র্য-বিলাসী মানুষের মন যখন ব্যক্তিসুখের সন্ধানে সামাজিক মূলধারার জীবনযাত্রার থেকে স্বতন্ত্র এমন কোন জীবনধারাকে গ্রহণ করে, যার প্রতি সমাজের অধিকাংশ নৈতিক আপত্তি, অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান, নিষেধ ইত্যাদি মান্য করে চলে, তখন সেই স্বাতন্ত্র্যাচারকে 'অসামাজিকতা' বলে চিহ্নিত করা হয়। চেষ্টা করা হয় নিন্দা, শাসন, অনুশাসন, শাস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সেই স্বাতন্ত্র্যাচারকে সমূল 'সংশোধন' করে সামাজিক মূলধারার জীবনপ্রণালীর অনুগত করে তুলতে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যাচারী যদি আত্মশক্তিতে বা সমমনস্কের সঙ্ঘশক্তিতে বেপরোয়া ও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেন তখন মূল্যবোধের সংঘাত আরও ব্যপক রূপ ধারন করে। স্বাতন্ত্র্যাচারীদের "সমাজবিরোধী", "ব্যভিচারী", "দুষ্কৃতি", "চরিত্রহীন" ইত্যাদি বলে পরিচিতি দেবার প্রয়াস চলে। অসম-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরকীয়া, সমকাম, অশ্লীলতা প্রকাশ, নেশাভ্যাস, জুয়াসক্তি ইত্যাদিকে সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং এসবের ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে মূল্যবোধের সংকট হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

মূল্যবোধ কোন স্থায়ী কষ্টিপাথর নয় যে তার উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিকতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা, সংহতিবোধ, ইত্যাদি যাচাই করা হবে। প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধ হল সমগ্রের প্রতি এককের আনুগত্য আদায় করে নেবার একটি সুপ্রাচীণ ছক। মূল্যবোধ যে সততই পরিবর্তনশীল ধারণা একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি সমাজের অধিকাংশ মানুষ মূল্যবোধকে একটি স্থায়ী মানদণ্ড হিসেবে দেখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তারা বিশ্বাস করেন সামাজিক মূল্যবোধের অধিকাংশ ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং কিছু মূল্যবোধ আছে যা পরিবর্তনশীল। সামাজিক সুস্থিতি, সৌহার্দ্য, শৃঙ্খলা, সুষম বিন্যাস, ন্যায়বিচার তথা সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় এই সমস্ত ধ্রুপদী মূল্যবোধগুলো ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি পরিবর্তনশীল মূল্যবোধগুলি সমাজের গতিশীলতা, অভিযোজন, উন্নয়নকামীতা ইত্যাদিকে সূচিত ও সুনিশ্চিত করার জন্য সুনির্বাচিত নীতিমালা প্রনয়নের চেষ্টা করে। উভয়েরই লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত মানব জীবনের নিরাপত্তা এবং সুখ বিধান। তাই সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যদি ক্রমাগত সংকট ঘনীভূত হযতে থাকে তবে তা সামগ্রিকভাবে মানবসমাজকে গভীর অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করে। যার ফলে সামাজিক ব্যবস্থার ওপরে আস্থাহীনতা তাদের গ্রাস করতে থাকে। এই পরিস্থিতি মোটেও কাম্য নয়। একটি উন্নত সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে একটি সুগঠিত মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সমান আস্থা এবং সমর্থনের ভিত্তিতে। একটি কাম্য সমাজব্যবস্থার অন্দরে রয়েছে বিবিধ মূল্যবোধ আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে বিস্তৃত বোঝাপড়ার অবকাশ থাকবে বলেই সেই লক্ষ্যে সমাজের অগ্রগতিমূলক অভিযাত্রাকে যুগে যুগে মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। সেই অভিযাত্রার গতি অনুযায়ী নিজেদের জীবনযাত্রার ছিরিছাঁদ বদলেও নিয়েছে।

মানুষের এই গতিমান জীবনধারা, ধ্রুপদী ও পরিবর্তনীয় - উভয় ধরনের মূল্যবোধের সঙ্গেই সাযুজ্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ার ঘটনা কদাচিৎ দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত সুস্থিতি কায়েম হয়েছে সামগ্রিক বোঝাপড়া তথা ব্যক্তিস্বার্থ আর সামাজিক শৃঙ্খলা উভয় ক্ষেত্রেই সংগত পরিমার্জন সম্ভব হয়েছে বলে।

সাহিত্যের মূল্যবোধ - মূল্যবোধের সাহিত্য

অ্যারিস্টটল তার "পোয়েটিক্স" গ্রন্থে 'নৈতিক' এবং 'নান্দনিক' - এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে উল্লেখ করেছিলেন, 'যা কিছু নৈতিক বা যৌক্তিক তা সর্বদাই মানুষকে নান্দনিক তৃপ্তি এনে দেবে, এমনটা হয় না।' আবার ভারতীয় উপমহাদেশের দার্শনিক মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে উপনিষদীয় মন্ত্রে সেখানে বলা হয়েছে "সত্যম শিবম সুন্দরম" যার মর্ম 'সত্যই শিব অর্থাৎ ধ্রুব ও শান্ত এবং তাইই সুন্দর'। তবে যা কিছু নৈতিক এবং সত্যনিষ্ঠ তা যথার্থই 'সুন্দর' কি না, তার মধ্যে নন্দন ভাবনা আছে কি না, তা নিয়ে যুগে যুগে মনোভঙ্গি বদলে গেছে। কখনো বলা হয়েছে, 'সত্য সর্বদাই তিক্ত, কঠিন, জ্বালাময় ও তাই অপ্রিয়'। সে ক্ষেত্রে সত্যের প্রকাশ নান্দনিক হওয়া সম্ভব নয়। আবার কবি জন কীটস্ উল্লেখ করেছিলেন "Beauty is truth, truth beauty"[৭] অর্থাৎ তাঁর মতে সাহিত্য ও শিল্পের জগতে যে সত্যের নির্মাণ হয় তা আসলে সুন্দরের কথাই বলে। বাস্তবতাকে শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা এমনভাবে নির্মাণ করেন যা ভাবগতভাবে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক'কের কাছে 'সত্য' বলে প্রতীয়মান হবে। আবার একইসঙ্গে তারা যাতে প্রবঞ্চনার শিকার না-হন সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখার সামাজিক দায় বর্তায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপরেই।

"সাহিত্য জগতের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। যে নিয়ম ভাষা, অলঙ্কার ও বিষয়বস্তু প্রকাশের সুদীর্ঘ অনুশীলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। যেটা রক্তমাংসের মনুষ্যসমাজের কার্যকারণ নীতির প্রতিফলন যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তার বিনির্মাণও। মনকে সাদা পাতার মতো করে সাহিত্য করলে তা নিরামিষ সাহিত্য হতে পারে। ব্যক্তির ইতিহাসবোধ, জীবন অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে ধারণ করলে সৃষ্টিকর্ম মানব মনে সহজে আসন গেড়ে বসতে সক্ষম হয়।"[৮] নৈতিকতার আদর্শরূপ পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় একরকম হলেও, মানবিক মূল্যবোধগুলি নৈতিকতা'কেই আধার করে গড়ে উঠবে - এমনটা সব সময় না'ও হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই নানা ধরনের মানবিক মূল্যবোধ জন্ম নেয় এবং স্থান-কাল-পাত্র'ভেদে এই সমস্ত মূল্যবোধের বিবিধ, এমনকি পরস্পরবিরোধী স্বরূপও দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বলা যেতে পারে নৈতিকতা যদি 'সদাচারের' সমার্থক হয়, তবে মানবিক মূল্যবোধ 'শ্রেয় লোকাচার' বলে বিবেচিত হতে পারে। যেহেতু লোকাচার পরিবর্তনশীল, পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথেই লোকাচারের রূপান্তর ঘটতে পারে তেমনি 'মানবিক মূল্যবোধ' কথাটিও কোন বদ্ধমূল ধারণা নয়। একটি সচল, অগ্রগামী ধারণা হিসেবেই 'মানবিক মূল্যবোধে'র মূল্যায়ন হওয়া উচিত। অন্যথায় মানবিক মূল্যবোধ যদি গোঁড়ামী'র বশবর্তী হয়ে পড়ে, তাহলে সমাজ নানা সংকীর্ণ বেড়াজালে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করে। তখনই ব্যক্তির সাথে কিংবা

গোষ্ঠীর সাথে মূলধারার মূল্যবোধের সংঘাত আরম্ভ হয়। যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে - এমনটাও বিরল দৃষ্টান্ত নয়।

প্রশ্ন হল, সাহিত্য নৈতিকতাকে বহন করবে? না কি বাস্তবোচিত মূল্যবোধকে? বলাই বাহুল্য, সাহিত্য যদি নৈতিক-মূল্যে সৃজিত হয় তাহলে তার কাজ উপদেশ বর্ষণ। অতএব তা নীতিমালা প্রচারকারী হিসেবেই চিহ্নিত হবে। কিন্তু সাহিত্য যদি বাস্তবতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে চায় তাহলে মানবিক মূল্যবোধের সাথেই তার গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে। কারণ নৈতিকতা যে সত্যনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা পায়, বাস্তবতা সেই সত্য থেকে কিছুটা অপসারিত কিম্বা বিপ্রতীপ অবস্থান গ্রহণ করতেই পারে। আমরা এমন এক আদর্শ মানবিক সমাজব্যাবস্থার প্রতি আশ্বস্ত যা সংশ্লেষণাত্মক ও বহুত্ববাদী। সেই লক্ষ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক অভিযোজন ও বিবর্তন চলতে থাকে। শিল্প-সাহিত্যের নানা অঙ্গনে ইতিবাচক মানবতাবাদী রূপান্তরের উন্মেষ ও বিকাশও তেমনি বহমান একটি প্রবণতা। তবে মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের নানা স্তরে সমাজ-সত্যের যেমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তার সাথে সাযুজ্য রেখেই নান্দনিকতার ধ্যানধারণায় নানা রকমফের ঘটতে থাকে। সাহিত্য যখন সত্য ও সুন্দর উভয়ের অনুধ্যানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তখন তা নৈতিকতার অনুজ্ঞা ও উপদেশ ইত্যাদি প্রচার করে; আবার সাহিত্য যদি বাস্তবতা ও সুন্দর-অসুন্দরের পাশাপাশি অস্পষ্ট সুন্দর'কেও কেন্দ্রীয় অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে আবর্তিত হয় তখন তা জীবনমুখী হয়ে ওঠে ব্যবহারিক অর্থে।

সাহিত্যের সামাজিক সংগতি ও বীক্ষা

জাঁ পল সার্ত্রে থেকে রলাঁ বার্ত, বার্টেন্ড রাসেল, নওম চামস্কি কিংবা জাঁক দেরিদা - বিশ শতকে অধিকাংশ দার্শনিকেরাই আদতে ভাষাতত্ত্ববিদ ও সাহিত্য-প্রবক্তা। তথ্য বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে অতি-তথ্যায়নের যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সমগ্র মেধাবসুন্ধরা উপনীত হয়েছে সেখানে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় দার্শনিক ব্যাখ্যাধারার অনুপস্থিতি তাথ্যিকবিভ্রান্তি, অপতথ্য সংযোজন, তথ্যবিকৃতি ইত্যাদির সম্ভাবনাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বব্যাপী সত্য-উত্তর পর্ব বা 'Post-Truth Regime' সূচনা করেছে তাতে রাষ্ট্রপক্ষ ও বাণিজ্যপক্ষের বিশদ লাভ থাকলেও সামাজিকতা নির্ভর মানবিক সম্পর্ক ভিত্তিক ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অতিকায় বাজারব্যবস্থার আগ্রাসী চরিত্র সমালোচনাধর্মী দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণের প্রবণতাকে অকার্যকর, অচল, অপাংক্তেয় বলে নস্যাৎ করে "End of Philosophy" বা দর্শনের যুগবসান ঘোষণা করেছে। জার্মান দার্শনিক নিৎসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অপর জার্মান চিন্তাবিদ মার্টিন হেইডেগার দর্শনচর্চাকে পরাবাস্তবতা বা Metaphysics চর্চার নামান্তর বলে চিহ্নিত করেন এবং বৈষয়িক বিশ্বে বিজ্ঞানমনস্কতার সর্বব্যাপী প্রাসঙ্গিকতাকেই সত্যচর্চার আকারে দেখার অতিতৎপরতার প্রতি অযোগ্যতার অভিযোগ ছুঁড়ে দেন এবং যুগপৎ দর্শনচর্চাকে সমালোচনামূলক সত্যানুসন্ধানের পরিবর্তে বহুমাত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ক্ষমতাবীক্ষণের চর্চা বলে অভিহিত করেন।[৯] সত্তাকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে দর্শনের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে হাইডেগার দর্শনের যুগাবসান ঘোষণা করেছিলেন এবং বিকল্প হিসেবে বলেছিলেন ভাষাকে হয়ে উঠতে হবে সত্তাকে উপলব্ধি করবার

নিকটতম প্রয়াসী। তাই উত্তর-অবয়ববাদীরা বা Post-Structuralistরা বিশ্বাস করেন ভাষা ও রচিত সাহিত্যের ভূমিকা কেবলমাত্র সংযোগ সাধনে বা Communication-এই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা সময় ও সত্তাকে উপলব্ধি করবার মহা-সাংকেতিক কৌশল হয়ে ওঠে। Phenomenon অর্থাৎ 'আভাস' এবং Appearance অর্থাৎ 'প্রতিভাস'-এর মধ্যে ব্যবধানটুকু ভাষার অন্তর্গত Logo বা অর্থাৎ বিবরণী-সংকেত দ্বারা নিরূপিত, বিবৃত, ব্যাখ্যায়িত হতে পারে। এইভাবে ভাষা ও ভাষা-সৃজিত সাহিত্য দর্শনের বিকল্প এক দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে প্রবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং এই উপায়ে সাহিত্য তখন আর কেবলমাত্র 'সমাজের দর্পণ' হয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে না, হয়ে উঠছে সমাজবোধের নিরীক্ষা।

ফরাসি বিপ্লব উত্তরকালে আধুনিক যুগে যারা সাহিত্য রচনার জন্য সচেষ্ট, ফরাসি সাহিত্য সমালোচক রোলঁ বার্ত তাদের দুটি পর্যায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন : 'লেখক' এবং 'লিখিয়ে'। সাধারণত, সৃজনাত্মক উপায়ে যারা স্বীয় সতস্ফূর্তকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত তাদেরকেই বার্ত 'লেখক' আখ্যা দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে, তাঁর মতে, ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে এমন কোন কোন রচনাকারের উদ্ভব হয়েছে যাদের লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক জনমত সংগঠিত করা বা অন্য কিছু বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক মূল্যবোধগত উদ্দেশ্যসাধন! বার্তর কথায়, এরা 'লেখেন' না, 'কিছু একটা লেখেন' - এদের বুদ্ধিজীবী বলা যায়, এদেরই বার্ত 'লিখিয়ে' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'লেখক' একধরনের সচেতনতা থেকে তাঁর ভূমিকা পালন করেন, 'লিখিয়ে' আরেকরকম সচেতনতার স্তর থেকে সাহিত্যের এক একটা 'কর্ম সম্পাদন' করেন। লেখক জগতের ঘটনা প্রবাহের কারণ অনুসন্ধানকে মিলিয়ে দেন লিখনের বিবিধ আঙ্গিকের মধ্যে। "লেখক শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থের চরিত্র লাভ করেন, খুঁজে পান উত্তরবিহীন প্রশ্ন: কেন এই জগৎ? যাবতীয় সামগ্রীর অর্থ কি? কিন্তু লেখক কিছুরই উত্তর দিতে পারেন না, কোন সমস্যার সমাধান বাৎলাতে পারেন না। লেখক বচনের সংস্থানে তাঁর নিজের এবং জগতের সংস্থান হারিয়ে ফেলেন। লেখক এর কাছে 'লেখা' ক্রিয়াটি অকর্মক। পক্ষান্তরে লিখিয়ে 'সকর্মক' মানুষ। বচন তার কাছে একটি মাধ্যম। এই মাধ্যমের সাহায্যে তিনি সাক্ষ্য দেন, ব্যাখ্যা করেন, শিক্ষা দেন। তিনি মনে করেন তাঁর বচন জগতের অস্পষ্টতা দূর করে, (সামরিক হলেও) অপরিবর্তনীয় কোনো ব্যাখ্যা বা কোনো তথ্যের শিক্ষা দেয়। লিখিয়েরা সবাই একটা সাধারন লিখন বেছে নেন। তাদের শৈলীরও সে অর্থে পার্থক্য থাকে না।"[১০]

সাহিত্যের মনোজ্ঞ পাঠকদের মধ্যে উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে ধ্যানধারণার ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে গেছেন গিয়র্গী লুকাচ, লুশিয়েঁ গোল্ডম্যান প্রমূখ তাত্ত্বিকেরা। উপন্যাস সম্পর্কে অধিকাংশ তত্ত্বই তৈরি হয়েছে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে। এমনকি আমেরিকান সাহিত্যশৈলীকেও ইউরোপীয় উপন্যাসতত্ত্বের পরিধিতে আনার প্রয়োজনীয়তা কখনো গণ্য করা হয়নি। মার্কীন ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনারকে নিয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলেও আমেরিকান সাহিত্যের বেশিরভাগটাই ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বের পর্যালোচনার আওতার বাইরে থেকেছে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যের ভাগ্য সহজেই অনুমেয়। বলাই বাহুল্য, একটি সার্বজনীন উপন্যাস তত্ত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে একটা ঘাটতি তাই আজও রয়ে গেছে। সারা পৃথিবীর

অজস্র ভাষায় যে অজস্র উপন্যাস লেখা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে সেসব উপন্যাস ইউরোপীয় উপন্যাসতত্ত্বের বিশ্লেষণী-কৌশলের ব্যাসের মধ্যে আসেনা অথচ বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্য বিচারের একমাত্র কষ্ঠিপাথর হয়ে রয়েছে ইউরোপীয় উপন্যাসতত্ত্ব। সেই উপন্যাসতত্ত্বের ব্যাখ্যাকৌশলের ক্ষেত্রে আবার ধনতান্ত্রিক বিকাশের তাত্ত্বিক আর মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা একমত। উপনিবেশ বিস্তারকারী বুর্জোয়াতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনশৈলী যেমন ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে, তেমনি উপনিবেশের অধীনস্থ বৃহত্তর বিশ্বের নানা বিচিত্র পদ্ধতিতে শোষিত নানা স্তরের মানুষজন ও সমাজ উপনিবেশিত এলাকার নানা ভাষার উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। ইউরোপীয় উপন্যাসতত্ত্ব অনুযায়ী এই দুই ধরনের মানুষই সাহিত্যের হিরো বা নায়ক, অথচ এই দুই ধরনের নায়ক বা হিরোর মধ্যে একধরনের মানুষ যে প্রভুত্বকারী অপরেরা প্রভুত্বের শিকার - এই বিরোধাভাসের কোনো স্বীকৃতি ইউরোপীয় উপন্যাসতত্ত্বে দেওয়া হয়নি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথে উপন্যাস সাহিত্যের বিবর্তনের ও বিকাশের নানাধরনের যে সমস্ত সাযুজ্য লুশিয়েঁ গোল্ডম্যান অনুমান হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তার যে কোনো সার্বজনীন ভিত্তি নেই একথা আজ উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের যুগে খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে। একই সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বে এই ইউরোপীয় আধিপত্যবাদের সূচনা হয়েছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক উদগাতা হেগেলের নেতৃত্বে।

হেগেলের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর "লেকচারস অন এস্থেটিকস" (১৮১৮) গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য শিল্পপ্রকরণগুলির একটি তালিকা পাওয়া যায়। হেগেল তার এই বক্তৃতাগুলিতে 'বিষয়বস্তু' এবং 'আঙ্গিকের' ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'এই ঐক্য স্থায়ী'। তাঁর মতে, 'সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকেই সৌন্দর্যের একটা কুৎসিত আকার তৈরি হতে পারে'। হেগেল আরও উল্লেখ করেছেন, 'বিষয়টিই আকার', তাই বিষয়ের বিচ্যুতি থেকেই আকারের বিচ্যুতি ঘটে। এইভাবে খারাপ বিষয় এবং খারাপ আকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে হেগেল বলেছিলেন "চীনের লোকেরা, ভারতীয়রা, ইজিপ্টের লোকজন কখনো যথাযথ সৌন্দর্য অনুভব করতে পারেনি, তাই তারা আরাধ্য দেবদেবীর যেসব ছবি এবং মূর্তি তৈরি করেছে সেগুলো হয় আকারহীন অথবা আকারের এক মিথ্যা ও ভয়ংকর চেহারা"। অবশ্য হেগেলের এই তত্ত্ব প্রচারকালেই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে এবং তার সদস্য ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতেরা ইউরোপের দেশে দেশে ভারতীয় এবং মিশরীয় স্থাপত্য, দেওয়ালচিত্রণ, ভাস্কর্য, সমাধিসৌধ নির্মাণ ইত্যাদি, চীনের বস্ত্রশিল্প, চিনামাটির পাত্র অলঙ্করণশিল্প - এসবের নিদর্শন ও তার নান্দনিকতাকে ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছেন। "হেগেলের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতাগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি সেসব খবর জানতেননা। না'ই জানতে পারেন। কিন্তু তথ্য সম্পর্কে তাঁর স্পর্শকাতরতার যেসব গল্পকথা আমরা শুনেছি পরে, সে-সব আজগুবি ঠেকে ও তাঁর তত্ত্ব তথ্যনির্ভর নয় এটাই প্রমাণিত হয়।"[১১]

উপন্যাসের সামাজিকতা - আখ্যানতত্ত্বের রাজনীতি

হেগেলের "লেকচারস অন এস্থেটিকস" (১৮১৮) সম্পর্কে দেবেশবাবুর আরো

অভিযোগ ছিল যে এই গ্রন্থে হেগেল শিল্পের বিভিন্ন রূপের যে তালিকা দিয়েছিলেন তাতে তিনি উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করেননি, যদিও তার ২১৩ বছর আগেই সার্ভান্তেস-এর লেখা "ডন কুইজট" পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে, র‍্যাবলের রচনা "গার্গান্টুয়া"ও ১০০ বছর পার করে ফেলেছে, লেরমনতভ, গোগোল, পুশকিন প্রমুখের উপন্যাসে উঠে আসছে ককেশাস দাপিয়ে বেড়ানো ফেরার বন্দীরা, মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবার্গে হানাদারী করে বেড়ানো মাস্তানেরা, নিম্নবিত্ত কেরানী বা ক্রীতদাসেরা! ইউরোপে যে উপন্যাস লেখা হচ্ছে হেগেল তার খবরই রাখতেননা আর তাই তিনি উপন্যাস বা গল্পকে একটা সম্পূর্ণ নতুন শিল্পরূপ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাকে তিনি 'কুৎসিত বিষয়' বলছেন সেই চুরি, জচ্চুরি, মেয়েবাজি, কেরানিদের জঘন্য জীবনযাত্রা, মাস্তানি, অসামান্য ও মহৎ শিল্পের 'বিষয়' হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের তাত্ত্বিক পুরোধা নবনির্মীয়মাণ সমাজের ওপর গ্রীকযুগের নীতি-নৈতিকতা আরোপ করতে চেয়েছিলেন, অথচ সেসব আদর্শ ইতমধ্যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। আধুনিক শিল্পপ্রকরণ জন্ম নিচ্ছে এবং নিয়েছে। মানুষের চিন্তার দরজা খুলে দিচ্ছে উপন্যাস, খবরের কাগজ, সিনেমা, স্টেডিয়ামে খেলা, নাটক, ইলেকট্রিক আলো ইত্যাদি। প্রযুক্তির অভিনব ব্যাবহার নতুন নতুন শিল্পকলার জন্ম দিচ্ছে। শিল্পের অন্তর্গত ব্যক্তিবাদের চর্চা পরিবর্তিত হচ্ছে ব্যাষ্টিগত চেতনায়। উপন্যাসে হচ্ছে সেই আধুনিক শিল্পের প্রথম নিদর্শন, ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব যাকে গোড়াতে যাকে অনুভব করতেই পারেনি। তার কথায়, "গল্পের তত্ত্ব উদঘাটন করার দায় এই আমাদের প্রাক্তন-উপনিবেশের গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের। সে দায়িত্ব কোন ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানী নিতে পারেন। কিন্তু গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সেই দায়িত্ব অনিবার্য। সেই স্বাদেশিক ও স্বভাষিক তত্ত্বভূমি ছাড়া স্বাদেশিক ও স্বভাষিক উপন্যাসের ভূমিকা তৈরি হবে না। উপন্যাসকে তার পাঁচশোবছরের জালি সার্বজনীনতা থেকে বের করে আনবেন প্রাক্তন-কলোনির গল্পকার-ঔপন্যাসিকরা, নতুন করে পাঠোদ্ধার করবেন পুরনো লেখকদের ও সাহিত্যের। পৃথিবীর উপন্যাস তার সংকটমোচনের জন্য আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।"[১২]

রুশ সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর রচিত দুটি গ্রন্থ বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল - "Problems of Dostoevsky's Poetics" এবং "The Dialogic Imagination"। অসামান্য ওই গ্রন্থদুটিতে তিনি রুশ উপন্যাসিক ফিওদর দস্তয়েভস্কি রচনার নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছিলেন; কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি আবির্ভাব এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে উপন্যাসের 'উপন্যাসত্ব' কোথায় থাকে তা শনাক্তকরণের পদ্ধতিটি জনসমক্ষে আনলেন। বাখতিনের রচনাবলীতে 'উপন্যাস' কথাটির কমপক্ষে তিনধরনের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, তিনি উপন্যাস বলতে বুঝিয়েছেন আধুনিক জামানায় বিকশিত এক প্রকার সাহিত্যরূপ হিসেবে উপন্যাস; দ্বিতীয়তঃ বাখতিন নির্ণিত একটি আদর্শ সাহিত্যপদ্ধতি হিসেবে উপন্যাস এবং তৃতীয়তঃ ভাষার নান্দনিক উপস্থাপনার যে বিশিষ্ট ধরন গ্রিক-রোমান যুগ থেকে বা লোকসাহিত্য থেকে বহুকাল ধরে চর্চিত তার বিবর্তিত ও বিবর্ধিত প্রকাশ হিসেবে উপন্যাস। সাহিত্যরূপ হিসেবে উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিককালে হলেও উপন্যাসের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে বাকি সকল শিল্পের কমবেশি 'উপন্যাসায়ন' (Novelized)

ঘটে গেছে বলে তিনি মনে করতেন। উদাহরনস্বরূপ বলা চলে, উপন্যাসের প্রভাবেই অন্য সাহিত্যরূপগুলিতেও সংলাপ (Dialogue)-এর প্রভাব বিস্তার পেয়েছে; ভাবগম্ভীর বিষয়বস্তু যেমন ভক্তি বা বীরত্বের কাহিনীতে হাসি, ব্যাজস্তুতি, ঠাট্টা, ব্যাঙ্গ ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে; উপন্যাসের প্রভাবে বিভিন্ন সাহিত্যরূপের মধ্যে 'অনিরূপিত' বা 'অমীমাংসিত' বৈশিষ্ট্য ঢুকে পড়েছে; অর্থের মুক্তি ঘটেছে এবং সমকালীন বাস্তবতা - যে বাস্তবতা এখনো বিদ্যমান, শেষ হয়ে যায়নি - তাও গ্রাহ্য হয়েছে; বিবিধ সাহিত্যরূপের নিজস্ব রচনাপ্রক্রিয়ার সাথে সমসাময়িক বাস্তবের আত্তীকরণের প্রচেষ্টায় অণুপ্রেরণা দিয়ে উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যরূপগুলির যে 'নবীনায়ন' ঘটিয়েছে তার ফলেই পরবর্তীতে যুগের প্রধান সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাসের স্থান নির্ধারিত হয়েছে ঐতিহাসিকভাবেই। অন্য সাহিত্যরূপগুলিকে 'উপন্যাসায়িত' কথার অর্থ এই নয় যে অন্যরূপগুলোর পাশে 'উপন্যাস' নামের একটি নতুন রূপ যুক্ত হল। আসলে উপন্যাসের সেরকম নির্দিষ্ট কোন শৈলী-কৌশল-কায়দা-কানুন কিছুই নেই। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই উপন্যাস কোন নির্দিষ্ট রীতি অনুসরন করেনা, এর গঠন নমনীয়। উপন্যাস সর্বদা নিরিক্ষামূলক উপায়ে গড়ে ওঠে। উপন্যাস নিজেকে নিয়েই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে এবং নিজের যে কোনো প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত রীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। ক্রমপরিবর্তনশীল বাস্তবতার সাথে সরাসরি সম্পর্কে গড়ে ওঠা একটি সাহিত্যরূপের রচনাপদ্ধতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির কোন বিকল্প হতে পারে না। ফলে অন্যান্য সাহিত্যরূপগুলির 'উপন্যাসায়ন' মানে তাদের 'উপন্যাস' নামের ভিন্ন কোনো একটি বর্গের অধীনস্থ হয়ে পড়া নয়, বরং উপন্যাসায়িত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত সাহিত্যরূপের রীতিসিদ্ধ সৃষ্টি এবং বিকাশ থেকে তাদের মুক্তি ঘটে, এবং মুক্তি ঘটে সেইসব বৈশিষ্ট্য থেকে যা তাদের পুরানো করে রেখেছিল, চলতি যুগের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বাখতিন উপন্যাসের যে নান্দনিক একক'টিকে চিহ্নিত করেছিলেন তা হল 'দ্বিবাচনিকতা' বা Dialogism। এই দ্বিবাচনিকতার মাধ্যমে তৈরি হয় বহুরকম স্বরের মধ্যে সংগতি বিধানের প্রয়াস বা Polyphony। একটি আখ্যান তখন হয়ে ওঠে অনেকান্ত স্বরের সন্নিবেশ।বাখতিনের তত্ত্বকে অনুসরণ করেই বলা যায়, ভাষা প্রয়োগমাত্র এই দ্বিবাচনিকতার সূত্রপাত ঘটে; এই দ্বিবাচনিকতা অন্য নামে পরিচিত হয় 'যোগাযোগ' হিসেবে। সাহিত্যে সেই যোগাযোগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হলো উপন্যাস।[১৩]

"১৯২০-এর দশকে উপন্যাস নিয়ে গুরুতর কাজের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু আলোচনার ধরনটা ছিল ব্যক্তি ঔপন্যাসিক আর বিশেষ উপন্যাসকেন্দ্রিক। সামগ্রিকভাবে খোদ উপন্যাসের শৈলীর তত্ত্বায়ন হয়নি। এ ধরনের কাজের পাঁচটি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন বাখতিন:

১. লেখকের নিজের কথাগুলো আলগা করে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা;

২. উপন্যাসকে শৈল্পিক সমগ্রতার নিরিখে না দেখে ঔপন্যাসিকের ভাষার আলাদা বয়ান তৈরি;

৩. নির্দিষ্ট ঔপন্যাসিকের প্রবণতা নির্দেশ—রোমান্টিক বা প্রকৃতিবাদী বা ইম্প্রেশনিজমবাদী ইত্যাদি;

৪. উপন্যাসের ভাষায় লেখকের ব্যক্তিত্ব খোঁজা;

৫. আলঙ্কারিক একক হিসাবে উপন্যাসকে দেখা—উপন্যাসের কলাকৌশলগুলোকে আলঙ্কারিক কার্যকরতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করা।

সবগুলো ক্ষেত্রেই উপন্যাসের বিশিষ্ট বয়ানে শব্দ বা কথার যে বিশেষ তাৎপর্য তৈরি হয়, তার ব্যাখ্যা অধরা থেকে যায়। উপন্যাসের ভাষা ও শৈলী বাদ রেখে তাঁরা ঔপন্যাসিকের ভাষা ও শৈলী ব্যাখ্যা করেন। ফলে ব্যাখ্যাটা হয় আসলে 'কবিতার ভাষা' বা 'সাহিত্যের ভাষা'র আওতায়। উপন্যাস ভাষা-ব্যবহারের যে বিশিষ্ট ধরন তৈরি করে, যে বিশেষ সম্ভাবনা তৈরি করে, তা বাদ পড়ে যায়।ভাষার 'কাব্যিক ব্যবহার' আর 'ঔপন্যাসিক ব্যবহার' এত আলাদা যে, কাব্যিক ভাষার ধারণা দিয়ে উপন্যাসপাঠ ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপন্যাসে, বিশেষত লেখকের নিজস্ব ডিসকোর্সে, ভাষার কাব্যিক ব্যবহারও হয়; কিন্তু উপন্যাসের জন্য তা নিতান্তই গৌণ। বাখতিনের মতে : "All essentially novelistic images share this quality: they are internally dialogized images—of the languages, styles, world views of another (all of which are inseparable from their concrete linguistic and stylistic embodiment). The reigning theories of poetic imagery are completely powerless to analyze these complex internally dialogized images of whole languages."[১৪] .... বাখতিন তাঁর Problems of Dostoevsky's Poetics গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"১. কল্পসাহিত্যের অন্যসব শাখায় 'কাব্য' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে উপন্যাস কাব্যিক হবে না;

২. উপন্যাসের নায়ক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো হবে না। ভালোর সাথে তার মধ্যে মন্দও থাকবে; নীচতার সাথে মাহাত্ম্য; হাস্যের সাথে গাম্ভীর্য;

৩. নায়ক বিকশিত অবস্থায় আবির্ভূত হবে না। হবে বিকাশমান। জীবনের পথপরিক্রমায় সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে;

৪. উপন্যাস সমকালের জিনিস, যে অর্থে মহাকাব্য পুরাকালের।

এ গুণগুলো নিঃসন্দেহে উপন্যাসকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। কিন্তু এগুলো এটা বোঝায় না যে, উপন্যাস নিজেই নিজেকে পরিবর্তন করে চলছে এবং এ যুগের সাহিত্যরূপ হিসাবে অন্য সাহিত্যরূপগুলোকেও প্রভাবিত করছে।"[১৫]

আখ্যান বা গল্প বলার শিল্প আসলে একটি কাহিনীকে কি পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হয়েছে সেই বিষয়ক বিশ্লেষণ, যার মধ্যে মোটামুটি অন্তত তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায় - প্রথম পর্যায়ে 'সূত্রপাত' অর্থাৎ যেখানে চরিত্রগুলি, ঘটনা বিস্তারের পরিবেশ, এবং কাহিনীর সময়কালের বর্ণনা দিয়ে পাঠক মনকে গল্পটির একটি প্রেক্ষিত পরিচিতি প্রদান করা হয়; দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে 'দ্বন্দ্ব ও চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ কাহিনীর অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীরা একে অন্যের সাথে বিভিন্ন সম্পর্ক ও কার্যকলাপে জড়িত থাকার দরুন যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়া-সময় অন্তরে সংঘাতে রূপ ধারণ করে পাত্র-পাত্রীদের জীবনে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে তার সার্বিক বিবরণ; তৃতীয় অর্থাৎ অন্তিম পর্যায়ে আসে 'উপসংহার' যা মধ্যবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় এবং

তার ফলে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের জীবনে মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক পরিণতি সূচিত হয়। আখ্যান বা গল্প বলার শিল্প কাহিনীর পাত্র-পাত্রীকে কাহিনীর অন্তর্গত ঘটনাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায় এবং এই বোধ জাগাতে চায় যে কাহিনীর অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীরা বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা, মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা সামাজিকীকরণ-এর মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রাণী হলেও ঘটনাপ্রবাহ তার বিপরীতধর্মী মূল্যবোধ, শিক্ষা, সংস্কার তাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তি অবস্থান এবং ঘটনাবলীর গতি দুয়ের মধ্যে যে দূরত্ব তার মীমাংসা বা নিরসন একজন কাহিনীকার কিভাবে করছেন সেই আখ্যান-কৌশলের সার্থকতাই উপন্যাসের 'উপন্যাসত্ব' নির্ধারণে মূল বিচার্য। কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা প্রবর্তিত হয় লেখক-মানসের আদর্শগত অবস্থান থেকে অর্থাৎ লেখক যে সমস্ত শ্রেয় বা অকাম্য মূল্যবোধের দ্বারা চরিত্রকে গড়ে তুলতে চান সেইমতো চরিত্রায়ন সম্পন্ন হয়, অপরপক্ষে কাহিনীর ঘটনাবলী উঠে আসে লেখকের সমসাময়িক বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে ফলে অচিরেই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা কাহিনীর ঘটনার সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে উপনীত হয়। এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে লেখক উপলব্ধিমূলক সূত্র সঞ্চারিত করতে চান তারমধ্যে ব্যক্ত হয় তার 'দার্শনিকতা'।

আখ্যানতত্ত্বের কাজ হল আখ্যানের কাঠামোটিকে বিশ্লেষণ করে দেখানো, বিভিন্ন আখ্যানের মধ্যে কাঠামোগত সাযুজ্যকে খুঁজে বের করা, আখ্যানের কাঠামো কিভাবে অধ্যায়ন করা দরকার কিম্বা আলাদা আলাদা আখ্যানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক সাযুজ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে, - এসবই আখ্যানতত্ত্বের অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য।দৃষ্টিভঙ্গি বা আনুধাবন পদ্ধতি হিসেবে আখ্যানতত্ত্বের প্রচলন হয়েছে মূলত বিশ শতকেই। প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্ব ছিল মূলত কাব্যতত্ত্ব ভিত্তিক। "'আখ্যান' অর্থে ফরাসি দার্শনিক জঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার সাংস্কৃতিক পরম্পরার সেই নিরন্তরতাকে বোঝাতে চেয়েছেন যা মিথ, পুরাণ, লোককথার মধ্যে পাওয়া যায়। 'আখ্যান'-এর মধ্যে তিনি দর্শন-পরম্পরাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লিওতারের মতে 'আখ্যান'-এর মাধ্যমেই সামাজিক নিয়ম ও মান্যতা, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ড স্থির করা হয়। 'আখ্যান' শুধুমাত্র সমাজে মানব সম্পর্কের নিয়মগুলিকেই ব্যক্ত করে না, প্রকৃতির ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককেও ব্যাক্ত করে। সংক্ষেপে বললে, যে কোন সংস্কৃতিতে সামাজিক নিয়ম ও মান্যতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির গঠন ও সংস্কার, ইত্যাদির উৎস হলো আখ্যান। বিশ্ব-দর্শনের পরম্পরাকে লিওতার মহা-আখ্যান বা মেটান্যারেটিভ বলে বর্ণনা করেছেন। এই মহা-আখ্যানের দু'টি মূল স্বপ্ন রয়েছে। প্রথম স্বপ্ন'টি রাজনৈতিক, মানুষের স্বাধীনতার, যার আরম্ভ হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে। দ্বিতীয় স্বপ্ন'টি দার্শনিক, মানব-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারের স্বপ্ন, হেগেলের জার্মান-পরম্পরা থেকে এর শুরু। কিন্তু এই দুটি মহা-আখ্যানেরই বিশ্বাসযোগ্যতা চলে যাচ্ছে। মহা-আখ্যান অর্থাৎ দার্শনিক পরম্পরার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে। সমস্ত মহা-আখ্যান যেমন চিরন্তন সত্য, শ্রেণীহীন সমাজ, মানবিকতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি - সবকিছুর উপর উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।[১৬]

ভাষা-অনুমান-পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল উপন্যাসতত্ত্ব। উপন্যাস তত্ত্বে মূলত দুটি দিক আছে একটি হলো তার বহির্কাঠামো অবলোকনের দিক অর্থাৎ কোন

চরিত্র বা ঘটনা অথবা সংলাপ কোথায় স্থাপিত হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা, অন্যদিকে আছে তার অন্তর্মূল্যের নিরীক্ষণের দিক অর্থাৎ ওইসব চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ কেন ওইস্থানে লেখক ওইভাবে স্থাপন করছেন কিম্বা কেন তার বিকল্প কোন চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ উপস্থিত করছেননা, সেসবের আলোচনা। প্রচলিত সাহিত্যধারার মধ্যে উপন্যাস একটি সর্বাঙ্গীণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছিল। উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছিল ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার নিরিখে উপলব্ধ সত্য যা সবসময়ই অনন্য এবং মৌলিক। আর এইভাবেই উপন্যাস হয়ে উঠলো একটি সংস্কৃতি মধ্যে প্রতিদ্বান্দিক সাহিত্য অক্ষ। প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্বে যেখানে একটিমাত্র কেন্দ্রাভিমুখী বিন্যাসের দৃষ্টিকোণের প্রতি সংহতিকে সমর্থন জানানো হয়, উপন্যাস তার আবির্ভাবকাল থেকেই দেখিয়ে দিয়েছে যে সেই সাহিত্যতত্ত্বের মাধ্যমে সার্ভান্তিস বা র‍্যাবলের, দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়ের, প্রুস্ত কিম্বা জয়েস বা কাফকার রচনা থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাসের আপাত-বাঁধনহীন, বহু চরিত্র, বহু ঘটনা বহু প্রসঙ্গ সন্নিবেশে খন্ডকাহিনীতে প্রসারিত বহুমাত্রিক জটিলতাকে বুঝতে সহযোগিতা করে না।

রবিন পালের "উপন্যাস তত্ত্ব - কিছু কথা" বইটিতে বিশিষ্ট পশ্চিমী উপন্যাস-তাত্ত্বিক এবং আখ্যানতাত্ত্বিকদের চিন্তাধারার একটি চমৎকার সংকলনে হেনরি জেমস, রবার্ট লিডেল, পার্সি লাবক, ফ্র্যাঙ্ক রেমন্ড লিভিস, ই. এম. ফর্স্টার, আয়ান ওয়াট, এডউইন মিউর, ওয়াল্টার আর্নেস্ট অ্যালেন, ওয়েন সি বুথ, গিয়র্গে লুকাচ, মিখাইল বাখতিন, আর্নল্ড কেটল, ডেভিড লজ, রোলাঁ বার্থ প্রমুখের উপন্যাসতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায় 'উপন্যাস তত্ত্ব ও বাংলা রচনা' প্রবন্ধ'টিতে লেখক উল্লেখ করেছেন "হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে সামাজিক মানুষের সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত করে দেখতে চাইলে উপন্যাসকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিচার উপন্যাসের শিল্পবিচারের প্রধান কথা। চাই জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান। জীবন সামগ্রিক, কারণ সে সবসময় সৎ, অসৎ, নীতি প্রভৃতি উত্তীর্ণ হতে চাইছে। উপন্যাসে থাকা চাই জীবন এবং জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ দুইই। প্রত্যেক উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের ধ্যানধারণার রূপক। তিনি আমাদের সাহায্য করেন উপন্যাস বিচারে পঞ্চকর্মে প্রবৃত্ত হতে। তা হ'ল - কোন পদ্ধতিতে শিল্পী জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেন, তিনি কি পরিহার করেন, কোন্ ধরনের সমস্যা উপন্যাসে উপস্থিত, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন্ নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন। সার্থক মহৎ উপন্যাস মহাকাব্যসুলভ শান্তরস পরিণামী।"[১৭]

অরুণ মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন, "সমকাল কে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না, আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন, কবি হয়তো অনন্তের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। □ উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত

ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।"[১৮] তখন সমাজ, সময় আর ইতিহাসের দর্পণে মূল্যবোধ-আবৃত বা অনাবৃত মানুষের নব পরিচয় সন্ধান তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আবার দেবেশ রায়ের "উপন্যাস নিয়ে" গ্রন্থটির শেষভাগে সাহিত্যিক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবেশ রায়ের একটি কথোপকথনে বিধৃত আছে বাংলা উপন্যাসসাহিত্য ও আখ্যানতত্ত্ব বিষয়ে এক অনন্যপূর্ব নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা, যা আধুনিক কথাসাহিত্যের যে কোনো গবেষকের কাছে মার্গদর্শী হয়ে ওঠে। দেবেশ রায় বলছেন, "... অতি বৈজ্ঞানিক, অতি পূর্বনির্দিষ্ট, অত্যন্ত উপরতলার বাস্তবতাবোধ, একেবারে ফালতু কতকগুলো শব্দ, এর সঙ্গে হয়তো পার্টির দৈনন্দিন কাজ মিলে যায়। কিন্তু আমার কাছে কমিউনিস্ট পার্টি'টা তা নয়। আমার উপন্যাস লেখবার একমাত্র কাজ যদি হয় ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা খোঁজা তাহলে আমাকে আরেকটা শক্তিতেও বিশ্বাস করতে হয়, যে শক্তি ইতিহাস'টা তৈরি করতে পারে। ব্যক্তি, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেও সেই শক্তি সক্রিয় থাকতে পারে। সেই শক্তিটাই কমিউনিস্ট পার্টি। ব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে এটা যদি আমি বিশ্বাস করি, তাহলে সে-ইতিহাস আরও বড় একটা ইতিহাসের অংশ - এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। আর সেই বড় ইতিহাস'টা মানুষ তৈরি করে - এটা বিশ্বাস না করলে আমার ব্যক্তির ইতিহাসের কাহিনীও হয়ে যাবে - ব্যক্তির নিয়তির কাহিনী। কিন্তু আবার ব্যক্তির নিয়তিও ইতিহাসের অন্তর্গত। আর কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া কেউ তো বলে না যে তারা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[১৯] অর্থাৎ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষকে উপন্যাসের অন্বিষ্ট বলে চিহ্নিত করেছিলেন, দেবেশ রায় তার থেকে আরো একধাপ এগিয়ে বললেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষই হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রণিত "উপন্যাসের রূপরীতি" গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাসের গঠনশৈলী এবং আখ্যানপদ্ধতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছে। উপন্যাসের প্লটের সরলতা, জটিলতা, যৌগিকতা ব্যাখ্যার পাশাপাশি উপন্যাসের ভাষারীতি ও তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। লেখক সমগ্র আলোচনার উপসংহারে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তা স্মরণীয় - "...উপন্যাসের শিল্পরীতির বিবর্তন এখনো স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আন্তরিক বক্তব্য ছাড়া শুধুমাত্র ভাষাবিন্যাস যেহেতু অপদার্থ রীতিবিলাসে পরিণত হতে বাধ্য, এই সচেতন ও সজীব শিল্পরীতির নিরীক্ষা প্রমাণ করে এর পেছনে সৃষ্টিশীল মনের এক আন্তরিক অনুভূতি বর্তমান। শক্তিমান সাহিত্যিকদের কলমে সেই আন্তরিক অনুভূতির সঙ্গে শিল্পিত ভাষা ব্যবহারই সমর্থ শিল্পকে মহৎ শিল্পে পরিণত করে।"[২০] মনে পড়ে যায় বিনয় ঘোষের কথা, সাহিত্যের নৈতিকতা আর ঐতিহাসিকতার মধ্যে বিরোধাভাসকে তিনি দেখেছেন নির্মোহ বীক্ষনে, বলেছেন - "সমাজের মতো সামাজিক ইতিহাসের সমীক্ষাও গতিশীল। পরিবর্তনশীল অর্থে গতিশীল। সমীক্ষার বিভিন্ন পর্বে ইতিহাসের গতিশক্তির উৎসসন্ধানী দৃষ্টি যত গভীরে প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমে তত সমাজের আলো-অন্ধকারের কানাচ ও কক্ষগুলি গোচরে আসে, তত তার কাজ চালানো রাং-ঝালাইয়ের জোড়াতালিগুলি ধরা পড়ে, পলেস্তারার ফাঁক দিয়ে রং-চটা ফাটলগুলি উঁকি মারে এবং আমাদের অনেক মনগড়া ও বইপড়া ভাবপ্রতিমার সম্মোহনী রূপ, তার ভিতরের ও পেছনের বাঁশ-খড়ের কঙ্কালটির রূঢ় প্রকাশে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।"[২১]

১৯৭৩-এ প্রকাশ পেল বিনয় ঘোষের "মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ"। গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা কিছু নিবন্ধ, যার মধ্যে এই প্রবীণ সমাজবিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ এবং সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পালাবদলের প্রতি সজাগ বিশ্লেষণ অনিবার্য ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিত ও নিহিত আছে। এই সময়খন্ডের মধ্যে মানবইতিহাসের ধারায় আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীতে অনেক ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি, সেই সঙ্গে মানবিক বিপ্লব প্রতিহত করবার অত্যাশ্চর্য কলাকৌশল, বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকট, ছাত্র-যুব সমাজের নতুন মনোভঙ্গি, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্য শাসন মুক্তি এবং গণমুক্তির জোয়ার এবং সেই গণসংগ্রামের প্রেক্ষাপটের নতুন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব, অবদান, তরুণ মানসে তার বিচিত্র প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং একইসঙ্গে অ্যালিয়েনেশনের সমস্যা - এই যাবতীয় প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছেন কিন্তু মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানে আস্থা রেখে সততার সঙ্গে সেসব প্রশ্নের জবাব সন্ধান করেছেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকড়ে গিয়ে। নির্মোহ অভিব্যাক্তিতে লিখেছেন - "আধুনিক নাগরিক আভিজাত্য সম্পুর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে তার সংযোগ কেবল আত্মপ্রচারের মাধ্যমে। তাই ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যের বৈচিত্র্য ও বিলাসিতা প্রদর্শনই আধুনিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অঢেল অনাবশ্যক ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনে আজকের সমাজ তাই পণ্যভোগীদের সমাজে (কনজিউমার সোসাইটি) পরিণত হয়েছে। আধুনিক অভিজাতরা কলকাতার এই পণ্যভোগী সমাজের প্রসার ও পরিপুষ্টির সহায়ক। এই বিচিত্র পণ্যসম্ভার জৈবিক জীবনের প্রয়োজনে নয়, যান্ত্রিক স্টেটাসপ্রধান জীবনের প্রয়োজনে উৎপন্ন। অভিজাত ও বিত্তবানদের সঙ্গে সমাজের ঊর্ধ্বসোপানমুখী মধ্যবিত্তের (যাঁদের 'আপার মিড্‌ল' বলা হয়) একাংশও আজ কলকাতার সমাজে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। কলকাতা শহরের সর্বত্র আজ তাই এই ভোগ্যপণ্যের বিচিত্র বাজার এবং ততোধিক বিচিত্র ক্রেতাবিক্রেতায় ভরে গিয়েছে, যা একপুরুষ আগেও অভাবনীয় ছিল।"[২২] এমন পর্যবেক্ষণের মধ্যে চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই, আছে গভীর সন্তাপ। অন্তঃসারহীন, দেখনদারী-সর্বস্ব একটা শহর-সংস্কৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন শানিত বয়ানে আর কে লিখেছেন? অথচ সেই নাগরিক সংস্কৃতিতেই চিরকাল বহাল থেকেও তিনি চিরকাল ব্যতিক্রমী।

শাশ্বত-স্বভাব না কি সাময়িকতা না কি নির্দিষ্ট সমসাময়িকতা কোন উপায়ে নিরূপিত হবে সাহিত্যের সামাজিকতা? তার মীমাংসা যে দার্শনিক প্রশ্নকে উদ্ভাসিত করে তারও আগে আসে নৈর্ব্যক্তিকতার আয়োজন ও প্রয়োজনকে বোঝা তথা কাল-দৃষ্টির অবলম্বন নির্ণয়। "চল্লিশের দশকের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, তেভাগা আন্দোলন) বিশালত্বে ও ব্যাপকতায় এতটাই অমোঘ ও সুদূরপ্রসারী, যে তার প্রভাব বাঙালির সামাজিক জীবনে দীর্ঘদিন ধরে পড়েছে এবং এখনও পড়ছে। লেখকেরা যেহেতু সমাজ ও সময়ের প্রতিনিধি ও প্রতিবেদক, ফলে তাঁদের সৃষ্টিতেও এই গুরুত্বপূর্ণ দশকের মহা ঘটনাগুলি তরঙ্গের কম্পন তুলেছিল। তবে লেখক ও সমাজতাত্ত্বিকের প্রকাশরীতি তো একরূপ নয়। সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন, কারণ ও উপায়

বাৎলানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে যে কোন শিল্পী বৃহৎ সামাজিক ঘটনার অভিঘাতকে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে রেখে ব্যঞ্জিত করেন। এ যেন Macroকে Microর আতশকাঁচে ধরার চেষ্টার মতো। ... ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় লেখক আসলে এককের অনুভূতিকে বহুমাত্রিক করে তুলতে চান। সিন্ধুকে বিন্দুতে ধরার চেষ্টা না-হলে পাঠকের মনোহরণ করা যায় না।"[২৩]

সুবল সামন্ত সম্পাদিত "বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা" গ্রন্থটির প্রথমার্ধে সাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী'র "উপন্যাস ভাবনা" থেকে একটি তাৎপর্যময় উল্লেখ উদ্ধৃত করা যায়, যেখানে তিনি লিখছেন - "বাংলা উপন্যাস এখন যথার্থই এক সুবিশাল সুপারমার্কেট। ... সুপার মার্কেটের পটভূমি এক অলৌকিক জগৎ, বিষয়বস্তু একপ্রকার বয়স্ক রূপকথা। কলকাতা... শুধুই কলকাতা। সে-কলকাতাও একধরনের নগরমনস্ক মধ্যবিত্তের পারিবারিক চতুষ্কোণ বা ফাইভস্টার কালচারের সুদূর গ্রহনক্ষত্রলোক। সাধারণ মধ্যবিত্তের একটা স্বাভাবিক শ্রেণী মোহ থেকেই যায় অচরিতার্থ ইচ্ছেপূরণের স্বপ্নে। ... দেশভাগের পর তাঁরা অনেকেই আকৈশোর নগরিক জীবনযাপনে গ্রামবাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা শুধুই কলকাতানির্ভর জীবন জীবিকা সুবাদে বিশেষ একটি সিস্টেমের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে নগরজীবনের তলানীতেও নেমে যেতে পারছেনা দৈনন্দিনে। সংক্ষিপ্ত 'আপনবৃত্তে' বসবাস, এঁদের কোন সমাজ নেই। নতুবা হালফিলের এই কলকাতা শহরও হয়ে উঠতে পারত এ-সময়ের বাংলা উপন্যাসের জরুরী বিষয়সামগ্রী। বিগত চার দশকে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠা নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের সুউচ্চবর্গের মানুষজন - হাই এক্সিকিউটিভ, টেকনোক্র্যাট, প্রশাসনশীর্ষের আমলাদের স্বতন্ত্র জগৎ আমাদের অধুনা সমাজজীবনে এক নতুন ঘটনা। সুবিশাল সেই কাণ্ডকারখানার ভেতর ঢুকে পড়া একজন মধ্যবিত্ত লেখক এর পক্ষে হয়তো সহজসাধ্য নয়। ...স্থিতাবস্থা ভাঙছে, শ্রেণীবৈষম্যের পুরনো সম্পর্কগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে চেয়ে জটিল রাজনৈতিক টানাপোড়েনে চঞ্চল। পুরনো সংস্কার উৎপাটিত নয়, অথচ সীমিতভাবে হলেও টেকনোলজির নতুন নতুন ধাক্কা। অথচ এরই মধ্যে জীবন হাঁটে সুখে বিষাদে। কিন্তু পালাবদলের এই জটিল সময়কে ধারণ করে যথার্থ উপন্যাস তৈরি হচ্ছে কোথায়, কতটুকু? প্রতি বছর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকায় উপন্যাসের সংখ্যা যত দীর্ঘতর, শালপ্রাংশু ঔপন্যাসিকের ভগ্নাংশ খুবই সংক্ষিপ্ত!"[২৪]

অধ্যাপক অরূপকুমার দাস প্রণীত "সত্তর দশক পূর্বাপর সময়-স্মৃতি-সাহিত্য" ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত প্রায় দুই দশক ব্যাপী রাজনৈতিক-ইতিহাস প্রবাহের প্রেক্ষাপটে সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতিকে সবিশেষ যত্নে এবং গভীর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সুধী পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করেছে। লেখক আত্মপ্রত্যয় ঘোষণায় মুখবন্ধেই বলেছেন "আমি নিজের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, অনুভব, সূত্রায়নে ইতালিয় দার্শনিক জিওভান বাতিস্তা ভিকো-র ভাবনা পথের অনুসারী। তাই সত্তর দশককে বোঝার ক্ষেত্রেও পরিপার্শ্ব শাসন করা ধারণার কাছে মাথা বন্ধক দিয়ে বিষয়কে বোঝার পথে যাইনি। সমকালের মধ্যেই যে বাচন নিজের অজস্র ফাঁক পূরণ করতে অজস্র বানানো 'লোককথা'কে ইতিহাস বলে চালাতে চায়, তার ফাঁক ও ফাঁকি সমাজের সর্বস্তরে তো চিহ্নিতই; অচিহ্নিত শুধু এই ন্যাবা চোখের প্রাক্তন বিপ্লব পথের

নানা ধারায় সাঁতরে পাড়ে ওঠা ভাবুকদের কাছেই। সময়কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বুঝতে ও জানতে হলে প্রচলিত প্রধান ধারার কথনগুলোকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে মনে করে নিলে কিছুই জানা হয় না। সময়কে জানতে হলে এই কথাগুলো থেকে একটা জটিল ব্যবধানে দাঁড়াতেই হয়।"[২৫]

প্রতিমুহূর্তে পূর্ণতা ও অপূর্ণত্বের দ্বন্দ্বে মুখরিত মানবজীবন; চলমান ভাঙা-গড়ার খেলায় সুদীর্ঘকালের আনন্দ-বেদনার বৃত্যান্ত, মহত্ব ও ক্ষুদ্রতার আখ্যান নানা অর্থে, নানা কৌণিকতায় সাহিত্যিকের মনের কোণে যে দৃশ্যকল্প গড়ে তোলে তা থেকে আরম্ভ হয় রচনার অভিসার পাঠক মনের সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে। জীবনরসিক সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে আর শৈলীতে আছে সত্যের স্পন্দন। তাইই নব নব রূপে এবং প্রত্যয়ে প্রবর্তিত হয়ে পাঠকমনে বিবিধ হিল্লোল সঞ্চার করে। পৃথিবীর নানা রূপ ও রসের আস্বাদন সাহিত্যিক সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে ধরা দেয় এবং তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়। তাই একই বিষয়েকে নানাভাবে দেখবার নিয়ত প্রয়াসে সাহিত্যের মহাজগৎ ক্রমপ্রসারিত হয়েই চলে।

সূত্র

১। David Popenoe; Private Pleasure, Public Plight: American Metropolitan Community Life in Comparative Perspective; Transaction Publishers, 1984.
২। Herbert Spencer; *The Principles of Ethics*. 2 vols.; Williams and Northgate; London; 1892.
৩। F.E. Merrill and M.A. Elliott; Social Disorganization; Harper and Bros.; New York; 1950.
৪। H.D. Stein and R.A. Cloward; Social Perspectives on Behavior; Free Press; New York; 1958.
৫। Stuart Carter Dodd; Dimensions of Society; McMilan Co.; New York; 1942.
৬। Karl Thompson; "The Marxist Perspectives on Society"; Marxism, Social Theory; Revise Sociology; April, 2016; https://revisesociology.com/2016/04/10/the-marxist-perspective-on-society/
৭। John Keats; "Ode on a Grecian Urn"; Great Odes of 1819; The Poems of John Keats at the Internet Archive; Editor Ernest de Sélincourt; Dodd, Mead & Company; New York; 1905.
৮। সাহিত্যে মূল্যবোধ: নবীন এষণা; দেবার্চনা সরকার (সম্পাদনা); সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার; ঢাকা; ২০১৭.
৯। মৃণাল কান্তি ভদ্র; "মার্টিন হেইডেগারের সত্তাবাদী দর্শন"; মনন বিশ্ব পরিচয়; সংকলক: চিরঞ্জীব শুর; আলোচনা চক্র (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ); ২০১৭; পৃষ্ঠা - ৮৩.
১০। শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত; "সাহিত্য-সমালোচক রোলঁ বার্ত"; মনন বিশ্ব পরিচয়; সংকলক: চিরঞ্জীব শুর; আলোচনা চক্র (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ); ২০১৭; পৃষ্ঠা - ১৬৮.
১১। দেবেশ রায়; "উপন্যাসের সংকট"; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে পঠিত কবি অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ মনিরুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা, ১৪ই জুন, ২০১৫; golpopath.com/2015/07/

blog-spot_56.html
১২। দেবেশ রায়; "উপন্যাসের সংকট"; যথাপূর্ব
১৩। তপোধীর ভট্টাচার্য; বাখতিন; এবং মুশায়েরা; কলকাতা, ২০০৯.
১৪। Mikhail Mikhailovich Bakhtin; *The Dialogic Imagination: Four Essays;* Edited by Michael Holquist; Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist; Ninth Paperback Printing; University of Texas Press, Austin; 1994.
১৫। মোহাম্মদ আজম; "বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব"; এবং এই সময়, বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক; অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক); দ্বাদশ বর্ষ, ৩৬তম গ্রীষ্ম সংখ্যা; ১৯৯৬.
১৬। রাহুল দাশগুপ্ত; "উত্তর-ঔপনিবেশিক আখ্যান"; উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য; সংকলক: চিরঞ্জীব শুর; আলোচনা চক্র; কলকাতা; মে, ২০১৭; পৃষ্ঠা - ৭২.
১৭। রবিন পাল; উপন্যাস তত্ত্ব কিছু কথা; এবং মুশায়েরা; কলকাতা; ২০১৯; পৃষ্ঠা - ২০৫.
১৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; ২০০৪; পৃষ্ঠা - ২০-২১.
১৯। দেবেশ রায়; উপন্যাস নিয়ে; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; ১৯৯১; পৃষ্ঠা - ২০০.
২০। হীরেন চট্টোপাধ্যায়; উপন্যাসের রূপরীতি; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; ২০১১; পৃষ্ঠা - ১৭৭.
২১। বিনয় ঘোষ; বাংলার নবজাগরণ: সমীক্ষা ও সমালোচনা; https://shilposhahitto.wordpress.com/tag/ বিনয় ঘোষ/
২২। বিনয় ঘোষ; মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ; প্রকাশ ভবন; কলকাতা; ১৯৭৩; পৃষ্ঠা - ২১৮.
২৩। আসরফী খাতুন; বাংলা কথাসাহিত্য চল্লিশের সময় ও সমাজ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা; ২০১৪; পৃষ্ঠা - ৫০৯-৫১০.
২৪। সুবল সামন্ত (সম্পাদনা); বাংলা উপন্যাস: বীক্ষা ও অন্বীক্ষা; এবং মুশায়েরা; কলকাতা; ২০১১; পৃষ্ঠা - ৪৩-৪৪.
২৫। অরূপকুমার দাস; সত্তর দশক পূর্বাপর সময়-স্মৃতি-সাহিত্য; করুণা প্রকাশনী; কলকাতা; ২০২১; পৃষ্ঠা - ৫.

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও তৎকালীন সমাজ : একটি নারীবাদী বিশ্লেষণ

লাকী কর
গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

সাহিত্য সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিফলন। আবার সমাজ-সংস্কৃতিও সাহিত্যের দ্বারা দিগন্ত লাভ করে। এই সূত্রে সাহিত্যে সাহিত্যিকের উপস্থাপনের দক্ষতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে সাহিত্যিক তাঁর কল্পনা শক্তি, চিন্তা-চেতনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের বিকাশ ঘটান নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে, যা পাঠককুলকে পথ দেখায়, তাদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিচ্ছবি তাই সমাজের নিয়ম-কানুন, প্রথা, রীতি, মতাদর্শ সাহিত্যে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ভারত তথা বাংলার সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পুষ্ট। এখানে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের নিরিখে লিঙ্গ ভূমিকা নির্মিত হয় এবং লিঙ্গ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে সেগুলি পালিত হয়। নারী অবদমন ও পুরুষ প্রভাবের নিরিখে সমাজে লিঙ্গ রাজনীতি বিরাজ করে। নারীর এই অবদমিত অবস্থানের প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় সাহিত্যিকেরা নারীর জীবন-বাস্তবতা-পরিণতির দিকে আলোকপাত করেছেন কখনো সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা থেকে, কখনো সমাজকে সচেতন করতে, আবার কখনো নিতান্ত সামাজিক ছবিটিই তুলে ধরেছেন। আসলে উপস্থাপনা একটা কৌশল, যে কৌশলে লেখক ঠিক যতটুকু, যেভাবে দেখাতে চান ততটুকু সেভাবেই তুলে ধরেন। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রেক্ষাপটে মূলত নারীকে আত্মত্যাগী, স্নেহময়ী, সেবা প্রদানকারী পত্নী, জননী, বিধবা প্রভৃতি রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে; ঠিক যেমন সমাজ প্রত্যাশা করে। এমনকি নারী কেন্দ্রিক সাহিত্যগুলিতেও এমনই উপস্থাপনার হদিস মেলে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকলেও, একটু ভিন্ন ধরনের নারী চরিত্র উপস্থাপিত হলেও তার পরিসর ও তার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ না করায় তা উপেক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ সমাজও সঠিক বার্তা না পেয়ে গতানুগতিকতা বজায় রাখে। পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আসলে একধরনের লিঙ্গ রাজনীতি কাজ করে। বাংলা সাহিত্যও এর শিকার। তবে ব্যতিক্রম বিরল হলেও যে একেবারেই নেই তা হয়তো নয়। এমনই ভিন্ন স্বাদের নারী উপস্থাপনার নিদর্শন হিসেবে সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৬১) এর ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই উক্ত গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধটিতে সমাজতাত্ত্বিক ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যে নারী কিরূপে ধরা দিয়েছে? তাঁর সমসাময়িক অন্যান্যদের সাহিত্যের নারী

উপস্থাপনার থেকে তাঁর উপস্থাপনা কীভাবে পৃথক? সর্বোপরি, তাঁর সাহিত্যিক নিদর্শন আদতেও ভিন্ন স্বাদের কিনা? - তা উদঘাটন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক কিছু বাঙালি সাহিত্যিকের বিভিন্ন ধরার নিদর্শন এর সাথে তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী উপন্যাস যথা- 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহনা' (১৯৪৩) এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও নারীবাদী সমালোচনার নিরিখে ধূর্জটি সাহিত্যে নারী উপস্থাপনার ভিন্ন স্বাদ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: সাহিত্য, সংস্কৃতি, উপস্থাপনা, পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গ রাজনীতি

সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই সমাজ-সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, মানুষের জীবনের যাবতীয় দিক ফুটে ওঠে। এখানে লেখক তাঁর কল্পনা শক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটান সৃষ্টির মাধ্যমে। সমাজ তথা পাঠককূলও এর দ্বারা সমৃদ্ধ হন। তাদের আত্মগোলব্ধি ঘটে, অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং নতুন ভাবনা-চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কালের নিয়মে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সময়ের নিরিখে বাংলার সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্য। সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের যাত্রাপথকে যুগধারায় তিন পর্বে বিভক্ত করা যায়। যার শুরুতেই রয়েছে প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) যে সময়ে 'চর্যাপদ' এর নিরিখে হাজার হাজার বছর আগের বাংলার সমাজ জীবনের পরিচয় মেলে। এরপর আসে মধ্যযুগ (১২০০-১৩৫০)। এই পর্যায়ে তেমনভাবে লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন মেলেনি। প্রাচীন যুগের অন্তিম পর্ব থেকে মধ্যযুগের সূচনাকাল এবং তার পরবর্তী বেশ কিছুকাল পর বাংলা সাহিত্য পুনরায় নব্য দিশা লাভ করে অনুবাদ সাহিত্যের হাত ধরে। সেসময় বিবিধ পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ যথা - রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত প্রভৃতি সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এরপর একে একে সাহিত্যিক পদাবলী, কবিগান ইত্যাদি সাহিত্যিক নিদর্শনের সাথে বাংলা পরিচিত হয়। উক্ত দুই পর্বের সাহিত্যের মূল বিশেষত্ব ছিল অলৌকিক শক্তি, দেব দেবীর আরাধনা, প্রচলিত লোকাচার-প্রথার প্রতিফলন। ক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে সূচিত হয় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। বিশেষত এই সময়েই ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলা সাহিত্য নতুন রূপ লাভ করতে থাকে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যেও পালাবদল ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজ-সাহিত্য থেকে ঊনিশ শতকের বাঙালি বহু কিছু গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ সাহিত্যে দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষ ও তার জীবন মুখ্য হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও সে সময় সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তাই তো উনিশ শতক শুধু বাংলা নয়, বাংলা সাহিত্যেও নবজাগরণ পর্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।[1] সেই সময় থেকে একের পর এক দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, নারী জীবন, নারী মুক্তি, পরিবেশ রক্ষা তথা নানাবিধ সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু বাঙালি সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যিক নিদর্শন রেখেছেন। এদের মধ্যে রাজা

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সাহিত্যের বিবিধ ধারার সাক্ষী। এ যুগে একের পর এক ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি লেখনীর বিকাশ ঘটে। এই সময় লেখকেরা ভিন্ন স্বাদের লেখা লিখতে থাকেন এবং তাদের সৃজনশীল দক্ষতার নিরিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।[2]

এ কথা ঠিক যে সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাই সমাজ যে ভাবধারা ও মতাদর্শে পরিচালিত হয় সাহিত্য তারই অনুসারী, আবার সাহিত্যকে অনুসরণ করেই সমাজ অগ্রসর হয়। ভারত তথা বাংলার সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের আধার। এপ্রসঙ্গে নারীবাদী কর্মী তথা সমাজবিজ্ঞানী Bhasin (1994)[3] কে অনুসরণ করে বলা যায়, পিতৃতন্ত্র হলো পিতার শাসন, যেখানে নারী অবদমিত, পুরুষ প্রভাবশালী। এর থেকেই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য ও অসাম্যের ছবি প্রকট হয়। আর এগুলি স্বীকৃতি পায় লিঙ্গ ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে। সমাজ ব্যবস্থার উপস্থাপক হিসেবে সাহিত্যও এগুলির অবতারণা করে। এই প্রেক্ষাপটে Walby (1991)[4] বলেন, সমাজে পুরুষত্ব, নারীত্ব তথা লিঙ্গ পরিচিতির ধারণা গড়ে ওঠে মূলত সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে। শৈশব থেকেই শিশু তার লিঙ্গ ভূমিকা পালন করতে শেখে। সমাজ একটি দর্পণের বিপরীত দুই মেরুর নিরিখে পুরুষ ও নারীকে নির্মাণ করে। পুরুষকে গড়ে তোলে দৃঢ়, সক্রিয়, চপল, উদ্যোগী হিসেবে; অন্যদিকে নারীকে গড়ে তোলে সহযোগী, নিষ্ক্রিয়, নম্র, আবেগপ্রবণ হিসেবে। তিনি আরো বলেন, পাঠক যে পাঠ্য পাঠ করেন সেগুলিও লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণের অন্যতম ধারক ও বাহক। লেখকরা তাঁদের লেখায় শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থাপনায় গতেধারা রূপ তুলে ধরেন। সেখানে কন্যারা উপস্থাপিত হয় গৃহকর্মে মায়ের সহায়ক হিসেবে এবং পুত্ররা উপস্থাপিত হয় পিতার সহায়ক ও দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রূপে। এভাবেই তাদের বর্তমান-ভবিষ্যৎ লিঙ্গ ভূমিকাগুলি লিঙ্গ অচলাধ্যাসের মাধ্যমে নির্মিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাহিত্য যেন সমাজের অনুকরণ মাত্র। তাই সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় লিঙ্গ বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যেও নারীকে মূলত ভালো মা, গৃহবধূ, আত্মত্যাগী, বিধবা, ... হিসেবেই উপস্থাপন করা হয় লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। শুধুমাত্র পুরুষ লেখকরা নন, লেখক-লেখিকা নির্বিশেষে অধিকাংশ লেখায় নারীকে দুর্বল, অবলা, ত্যাগী, স্নেহময়ী রূপে তুলে ধরেন। আর পুরুষকে ঠিক এর বিপরীত রূপে।

বাংলার সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পট পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলার সামাজিক বদলের সাথে সাথে বাঙালি নারী, তাদের শরীর সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ার বিষয় হয়ে উঠেছে। এর থেকেই নব্য নারীর উদ্ভব। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এই নব্য নারীর ভাবনা এবং সমাজে তাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে ধরা দেয় বাংলা সাহিত্যে।[5] গবেষক Roy and Roy (2020)[6] বলেন, সমাজের দর্পণরূপী সাহিত্যে সাহিত্যিকেরা তৎকালীন সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান, তার করুণ বাস্তবতা-পরিণতি তুলে ধরতে

শুরু করেন। নারীকে তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে নির্ধারণ করেন। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে নারী উপস্থাপনার এই যাত্রাপথ চলতে থাকে। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারী কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা সমুজ্জ্বল। প্রমুখের সমসাময়িক আরো এক অন্যতম বাঙালি সাহিত্যিক হলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), ওরফে ডি পি মুখার্জি, যিনি আবার একজন সমাজতাত্ত্বিকও বটে। তিনি তাঁর সাহিত্যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নারী উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র কল্পনাশক্তি নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীল মননের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং যুক্তির নিরিখে সমালোচনামূলক উপস্থাপনা করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক হয়েও সাহিত্যের জগতে বিশেষত বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি যে বিশেষ নিদর্শন রেখেছেন এবং উপস্থাপনা ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে নজির গড়েছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এই প্রেক্ষাপটেই উক্ত গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধটিতে ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যে নারী কিরূপে ধরা দিয়েছে? তাঁর সমসাময়িক অন্যান্যদের সাহিত্যের নারী উপস্থাপনার থেকে তাঁর উপস্থাপনা কীভাবে পৃথক? সর্বোপরি, তাঁর সাহিত্যিক নিদর্শন আদতেও ভিন্ন স্বাদের কিনা? - তা উদঘাটন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক কিছু বাঙালি সাহিত্যিকের বিভিন্ন ধরার নিদর্শন এর সাথে তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী উপন্যাস যথা- 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহনা' (১৯৪৩) এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও নারীবাদী সমালোচনার নিরিখে ধূর্জটি সাহিত্যে নারী উপস্থাপনার ভিন্ন স্বাদ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ওরফে ডি.পি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের চাত্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে অধ্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সুবক্তা ও সাহিত্য সমালোচক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বেশ দখল ছিল। তিনি মোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে দশটি বাংলায় ও নয়টি ইংরেজিতে। ইংরেজিতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'Personality and the Social Sciences' (1924), 'Diversities' (1958), 'Basic Concepts in Sociology' (1932) প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য ত্রয়ী উপন্যাস হলো 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১০৪৩) । এছাড়াও রয়েছে 'চিন্তয়সি' (১৯৩৪), 'আমরা ও তাহারা' (১৯৩১), 'কথা ও সুর' (১৯৩৮) প্রভৃতি।[7]

বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের পর সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় নারী, তার জীবন ও বাস্তবতা যেভাবে ফুটে উঠেছে তার থেকে একপ্রকার ভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাসে। যার প্রথমে রয়েছে 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) উপন্যাসটি এবং এর সূত্র ধরেই একে একে 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩)। এর মূল চরিত্রটি হল একটি পুরুষ চরিত্র - খগেন্দ্রনাথ ওরফে খগেন বাবু। তারই জীবন ও যাপনের অন্তস্থল, কালের নিয়মে জীবনের বাঁক ও মিলন যথাক্রমে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। মূল চরিত্রটি পুরুষ চরিত্র হলেও তাকে ঘিরে যে নারী চরিত্রগুলি (মাসিমা, সাবিত্রী, রমলা) গড়ে উঠেছে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে মানব সমাজে নারী, পুরুষ কেউই একক

বিরাজমান নয়। সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় উভয়েরই গুরুত্ব সমান। পুরুষ শাসিত সমাজ সে কথা খোলা মনে স্বীকার না করলেও তা আসলে সর্বতোভাবে সত্যি। কল্পনার আধার রূপি সাহিত্যেও সমাজ নির্দেশিত পথেই উপস্থাপনা মেলে। উপন্যাস, ছোট গল্প, কাব্য ইত্যাদির মত বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ধারাতেও নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক, জীবন কাহিনী প্রভৃতির নিরিখে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা এবং তার রূপকে বার্তা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উক্ত উপন্যাসের নায়ক যদি খগেন্দ্রনাথ হন তবে রমলা নায়িকা। যদিও শুধু রমলা নন এখানে উপস্থিত প্রত্যেক নারী চরিত্রের ভূমিকাই প্রেক্ষিত সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসের কাহিনী বিবরণ শুরু হয়েছিল খগেন বাবুর মৃতা স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সে প্রসঙ্গেই খগেন বাবুর প্রতি তার উকিলের সান্তনা সূচক উক্তি ("মেয়ে মানুষ হিংসেতে সব করতে পারে কিন্তু ছেলের মা হতে পারে না, এই দেখুন না পাঁচ পাঁচটি মেয়ে!"[৪])-র নিরিখে তথাকথিত সমাজের পুত্র প্রত্যাশা ও অপ্রত্যাশিত কন্যা সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দায়ী করা, তার স্বভাবগত ত্রুটি নির্ধারণ ও একাধিক কন্যা সন্তানের পিতা হিসেবে আক্ষেপ প্রদর্শন, এমনকি মৃতার প্রতি সমালোচনার মতো ঘৃণ্য প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে বাঙালি নারীর করুণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন লেখক। এর গোটা পর্ব জুড়ে একদিকে যেমন লেখক মাসিমার স্নেহশীল হৃদয়বৃত্তি; সাবিত্রীর মতো নব্য মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহবধূর পরনির্ভরতা, স্বল্প জ্ঞান, বিলেতি অনুকরণ প্রিয়তা, দেখনদারি, বন্ধুবাৎসল্যের উদযাপন, নিজের মতো থাকার সখ এবং আদতে একজন আদ্যপ্রান্ত বাঙালি স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন; তেমনি আবার তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়েও রমলার মতো শিক্ষিতা, আধুনিকা, স্বাধীনচেতা, উদার; স্বামীর অত্যাচার-অন্যায়-অবহেলার সাথে আপোষ না করে, সমাজের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কলকাতা শহরে একাকী জীবন কাটাতে পারা; নিজের জীবন উপভোগ করা, নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া; সম্পর্কের নিরিখে দায়িত্ব পালন করতে পারা ও পুরুষের নিকট দুর্বলতা স্বীকার না করার মতো দৃঢ় নারীর চরিত্রায়ন করতেও সক্ষম হয়েছেন।

উক্ত প্রথম দুই নারী চরিত্র অর্থাৎ মাসিমা এবং সাবিত্রীর ন্যায় নারী চরিত্র তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিলক্ষিত হলেও রমলার মতো নারীর নিদর্শন নেই বললেই চলে। হয়তো বা কিছু ক্ষেত্রে আংশিক, কিংবা কিছু কিছু দিক রয়েছে মাত্র! রমলা একাকী থাকতেন, তিনি বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা কোনটাই নন। বরং সন্তানের মৃত্যুর পর স্বামীর অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে তিনি নিজে তাকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। নিজের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার করে তিনি একা থাকতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে সামাজিক বাধা নেহাত কম আসেনি, তবে তার শিক্ষা, জ্ঞান সেসবের তোয়াক্কা করেনি। একাকী থাকতেন মানে এই নয় যে তিনি গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতেন। সামাজিক মেলামেশা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনেও তিনি ছিলেন অবিচল। রমলা ছিলেন বিলেত ফেরত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা, আধুনিকা নারী। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, গান গাইতেন। তবে সবই করতেন উপভোগের তাগিদে, নিজেকে ভালো রাখার জন্য। নিজেকে ভালো রাখার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্যের কথা ভাবতেন না। বন্ধুত্বের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। অন্তত সাবিত্রীর মৃত্যুর

পর তিনি খগেন বাবুকে যেভাবে আগলেছেন কিংবা খগেন বাবু তাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন এর থেকে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যেমন স্নেহশীলা হয়ে খগেন বাবুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তেমনি আবার অধিক যুক্তিবাদী, জ্ঞানী খগেন বাবু সাবিত্রীকে বোঝার ক্ষেত্রে যে একটু বেশিই কঠোর ছিলেন এবং সাবিত্রীর তাকে বোঝার বিষয়ে অধিক উদ্যোগী ছিলেন অবলীলায় সেই সমালোচনাও করেছেন। এই খগেন বাবুই কিন্তু একদিন রমলাকে তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন রমলাই সাবিত্রী কে পরামর্শ দেন উচ্ছন্নে যাবার জন্য, তাঁকে অনুকরণপ্রীয়তায় উদ্বুদ্ধ করেন। রমলা সাবিত্রীর বন্ধু এবং তার নিজ গুনে সাবিত্রী, সুজন, বিজনদের কাছে রমাদি হয়ে উঠেছিলেন।

তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একাকী থাকা নারীর পক্ষে ভগিনীর ন্যায় বন্ধুর মৃতদেহ মর্গ থেকে ছাড়িয়ে তার সৎকারের ব্যবস্থা করা; সদ্য স্ত্রীহারা পুরুষ বন্ধুর সাথ দেওয়া, তার দেখভাল করা; কিংবা সুজন, বিজনদের মত পুরুষ বন্ধুদের ডেকে যখন তখন সাহায্য নেওয়া, আড্ডা দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া-নেওয়ার মতো বিষয়গুলো সহজ ছিল না। সাহিত্যেও এমন ঘটনা বিরল। তাইতো রমাদি হয়তো আর দ্বিতীয় টি নেই! হ্যাঁ বড়দিদি আছে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' (১৯১৩)[৯]! যেখানে শরৎ বাবু দেখিয়েছেন কিভাবে মাধবী কৈশরে বিধবা হয়ে কোলকাতায় পিতার বাসায় ফিরে এসে অন্দরমহলের দায়িত্ব নিলেন এবং শুধু ভাই-বোন নয়, ভৃত্য থেকে শুরু করে পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছে বড়দিদি হয়ে উঠলেন। তার পিতা যথেষ্ট বৃত্তশালী ছিলেন তাই স্বাচ্ছন্দের অভাব ছিল না। তবে তৎকালীন সমাজে বিধবার স্বাচ্ছন্দ তো দূরের কথা, সে কথা ভাবাও এক প্রকার অপরাধ ছিল। এ কথা ঠিক যে সকলে তাকে মান্য করতো, সকলের ওপর তার জোর ছিল। এই মান্যতা আসলে একপ্রকার রাজনীতি। এক নারীকে তার জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি থেকে দূরে রাখা, একপ্রকার ভুলিয়ে রাখার কৌশল মাত্র। শৈশবে পিতা, বিবাহের পর স্বামী, বৈধব্যের পর পুনরায় পিতা ও পিতার মৃত্যুর পর দাদার আশ্রয় এবং সবশেষে গৃহত্যাগী হওয়া - এই ছিল মাধবীর জীবনের পর্ব। বিধবা হয়ে নতুন করে জীবনে এগোনোর কথা ভাবাও ছিল পাপ। সেখানে তার প্রতি অন্য পুরুষের অভ্যস্ততা ও নির্ভরশীলতার জানান পাওয়া ছিল ভয়ংকর অস্বস্তির ও নিন্দার। তাইতো এক অদ্ভুত অভিমানে মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে তাড়িয়ে দেয়। পরে পথ দুর্ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথের আহত হবার খবর পাওয়ায় তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এসব ঘটনা মাধবীর সখী মালতি জানলে মনে মনে তাকে চরম ভৎসনা করে। অপরাধবোধ, ভৎসনা এসবই যেন মাধবীর প্রাপ্য ছিল। সাথে উপরি ছিল পিতার মৃত্যুর পর দাদার সংসারে নিজেকে বাড়তি মনে হওয়া। শেষ অবধি সেই সময়কার প্রায় সমস্ত গল্পের বিধবা নায়িকাদের ন্যায় মাধবীরও অন্তিম গন্তব্য কাশী। মাঝখানে সাহিত্যিক কিঞ্চিৎ মোড় ঘুরিয়ে ছিলেন যেখানে মাধবী তার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধার করে তার ভাগ্নেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়, তবে বিধবা মেয়ে মানুষ ক্ষমতাশালী পুরুষ এবং প্রশাসনের কাছে হেরে যায়। সাহিত্যিক তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তিনি মাধবীকে ত্যাগ, সেবা তথা সমাজ নির্দেশিত নিয়তির পথে নিয়ে গেছেন। শুধু সান্তনা এই সুরেন্দ্রনাথ তার সারা জীবনে 'বড়দিদি'কে কখনো ভোলেনি। মাধবী আসলে তো সকলের জন্য বড় দিদি নয়, সে 'বড়দিদি' হয়ে উঠেছে।

লেখক চাইলেই মাধবীকে উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত করতে পারতেন; সুরেন্দ্রনাথের সাথে তার সম্পর্কের মোড় ঘোরাতে পারতেন; আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বাধিকার অর্জনে এগিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। সমাজের বেড়াজালের উর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেননি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর পাশাপাশি রবি ঠাকুরও তাঁর 'চোখের বালি' (১৪০৫)[10] উপন্যাসে বিধবা বিনোদিনীকে ধর্মরক্ষার দোহাই দিয়ে শেষ অবধি কাশী পাঠিয়ে ছিলেন। বিবাহিত মহেন্দ্রর সাথে শিক্ষিতা, রূপবতী বিধবা বিনোদিনীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে সমাজ অধর্ম বলে প্রতিপন্ন করেছে। তবে এ অধর্মের দায় সম্পূর্ণরূপে চাপানো হয়েছে বিনোদিনীর উপর। শুরুতে বিহারী তাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল বটে, তবে সব সময় যে উদ্ধার হতেই হবে এমনটাও তো নয়। শুধু সমাজ কেন আশালতার কাছেও বিনোদিনী চোখের মনি থেকে হয়ে উঠল চোখের বালি। অথচ স্ত্রী আশালতার প্রতি মহেন্দ্রর তীব্র আকর্ষণ থাকলেও এক সময়ে বিনোদিনীর রূপ, বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষার প্রতি মহেন্দ্র মন হারিয়েছিল। সেক্ষেত্রে দোষ তো তারও কিছু কম ছিল না। রবি ঠাকুর মেম সাহেবের কাছে বিনোদিনীর শিক্ষা অর্জনের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন ঠিকই, তবে সেই শিক্ষাকেই আবার তার বৈধব্যের জন্য দায়ী করা হয়েছে। লেখক যেন সর্বদাই চেষ্টা করেছেন বিনোদিনীকে কোন না কোন অবলম্বনে বাঁধতে। তা সে বিনোদিনীর মায়ের পিতৃহারা কন্যার বিবাহ নিয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রতি আর্জি প্রকাশ করাই হোক, কিংবা বৈধব্যের পর স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে বিনোদিনীর রাজলক্ষ্মীর গৃহে আসা হোক, অথবা বিহারীর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াই হোক - এসবই যেন তার প্রমাণ। শুধু বিনোদিনী নয়, আশালতাও কিছু কম যায়নি। তাকেও কোমল হৃদয়া, স্নেহময়ী, স্বামীর ভোগ্যপণ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার স্বামী মহেন্দ্রের অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে তারই অক্ষমতা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতকিছুর পরেও আশালতা কিন্তু এসব কিছু তার ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে স্বামীর সংসার করেছে। বিনোদিনী এবং আশালতা উভয়ই শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছে।

এই আলোকে, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের সাবিত্রীকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে খানিক কার্পণ্য করলেও রমলাকে উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীন, স্বাবলম্বী হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। আসলে সাবিত্রীর খামতিগুলো যেন রমলার মধ্যে দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। রমলা বিধবা নয় ঠিকই তবে সেই সমাজে স্বামীর সাথে না থাকা বৈধব্যের থেকেও কঠিন ছিলো, এমনকি এর থেকে স্বামী পরিত্যক্ত হওয়া যেন যুক্তিসম্মত ছিল। কোনো স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেবে এমন নিদর্শন একপ্রকার অসম্ভব ছিল, যদিও উল্টোটা সর্বক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। আসলে পুরুষ চায় নারীকে চালাতে, তার ওপর ক্ষমতা কায়েম করতে। স্ত্রী ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ হার, তবে স্ত্রীর মৃত্যু সৌভাগ্যের। তাইতো প্রচলিত প্রবাদে বলা হয় 'ভাগ্যবানের বউ মরে'। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অন্যায় মেনে না নিয়ে, ভাগ্যের সাথে আপোষ না করে রমলার স্বামীর ঘর ছেড়ে একাকী বাস করা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম দৃষ্টান্ত। মেয়েদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার পেছনে রয়েছে হাজারও বাধা। কখনো বা অর্থনৈতিক বাধা, আবার কখনো বা আবেগীয় পিছুটান। তবে রমলার এই দুইয়ের কোনটিই ছিল না। তাই লেখক যেন যাচাই অর্থে খগেন বাবুকে দিয়ে মন্তব্য করান, "আপনার অর্থের অভাব ছিল না, আর কাউকে মানুষ

করবার দায়িত্ব ছিল না, ছেলেপুলে থাকলে কি হত বলা যায় না, হয়নি তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন ও পেরেছেন।"[11] উত্তরে রমলা বলেছিলেন তার সন্তান বেঁচে থাকলে যেভাবেই হোক তিনি নিজেই তার সন্তানের দায়িত্ব নিতেন। সে সময়ে দাঁড়িয়ে এ কথা ভাবা এবং বলতে পারাও যে কম সাহসিকতার পরিচয় নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে শুধু লেখক রমলার সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারার ক্ষমতার দিকে আলোকপাত করেননি, সাথে এক নারীর তার সম্পত্তির অধিকার অর্জনের দিকেও আলোকপাত করেছেন। তাইতো লেখক দেখান, খগেন বাবু যখন ধরেই নিয়েছিলেন রমলা স্বামীর ঘর ছাড়লেও তার স্বামীর অর্থেই জীবনযাপন করেন, তখন রমলা জানিয়েছিলেন সে সম্পত্তি আসলে তার পিতার। বিবাহের সময় তার বিধবা মা সর্বস্ব দিয়ে তার বিয়ে দিয়েছিলেন, তাই সেই সম্পত্তি সে নিজের বলেই মনে করে। এই নিজের অধিকারের দাবি জানাতে সবাই পারে না কারণ তখনকার সমাজে বাঙালি হিন্দু মেয়েদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। আসলে রমলা স্বাধীন হতে চেয়েছিল তাই পেরেছিল। শরৎ বাবুর 'মাধবী' তো তার পিতার সম্পত্তি দাবি করতে পারেনি, এমন ভাবনাও তার মনে আসেনি কখনো। তবে তাঁর 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪)[12] র বিন্দুবাসিনী যথেষ্ট পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করেছে, ভোগের রূপ যা ভিন্ন আরকি! সংসার-সন্তান পরিবার-পরিজন, প্রিয়জনের স্বার্থে ব্যয়। তাতেই আত্মতুষ্টি। আলাদা করে নিজের জন্য ভাবার দৃষ্টান্ত এখানে উপেক্ষিত। ঠিক যেন আদর্শ বাঙালি গৃহবধূ। আর রবি ঠাকুরের বিনোদিনীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না, স্বামীর মৃত্যুর পরই পত্রপাট তাকে শ্বশুরালয় থেকে বিদায় করা হয়।

রমলা স্বাধীনচেতা, তাই তার দৈনন্দিন জীবনযাপন এমনকি তার পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও স্বচ্ছন্দকে গুরুত্ব দিতেন। তাই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ খগেন বাবু তাকে জর্জেট শাড়ি ছেড়ে খদ্দর পড়তে বললে এবং তাতেই তাকে অধিক মানাবে বলে নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে গেলে রমলা বলেন, "আমাকে মানাবার জন্য ব্যস্ত কেন?"[13] - এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লেখক আসলে রমলার প্রতিবাদী সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, যুক্তিপ্রিয়, বিদ্যান খগেন বাবু বারংবার নিজের চিন্তা ভাবনা তার ওপর আরোপ করতে চাইলে তিনিও সন্তর্পণে যুক্তি দিয়ে তার সমালোচনা করেছেন। তাইতো মেয়েদের বুদ্ধি, গাম্ভীর্যের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুললে রমলা বলে,
"মেয়েদের ভাগ্য তাদের হির হির করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে - তাই পট পরিবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে, কাল যে ছিল কিশোরী আজ সে হলো নববধূ, কালকের নববধূ আজকের .... মা। তারপর বিধবা, পিতামহী, অনাবশ্যক জঞ্জাল। আমরাই সত্যকারের বায়োস্কোপ দেখি, আমাদের সংস্কার সাজানো নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে মালা গাথার সময় আমাদের নেই, সুবিধে নেই। আমাদের স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতি করেন অনেকে, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশক্তি নেই তাই আমাদের আক্ষেপ নেই।"[14]

রমলার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লেখক আসলে সমাজে সাধারণ মেয়েদের চিরাচরিত স্রোতে বয়ে চলার দিকটির কথা বলেছেন। তাদেরকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো সম্পর্কের ভূমিকায় অবনত হতে হয়। আর এই ভূমিকা পালনে তাদের কোন ভুল হলে, কিংবা এর বাইরে যেতে গেলেই অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এসবের

মাঝে তাদের বিদ্যা চর্চার, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার ফুরসৎ মেলেনা। মেয়েরা একে একে এই ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে বিস্মৃত হয়ে পড়ে তাই তাদের আক্ষেপ হয় না, অভ্যাস হয়ে যায়। এই অভ্যাস এমনই যে কারো শত অবহেলা, প্রত্যাখ্যান, অত্যাচার সত্ত্বেও তারই সেবায় ব্রতী থাকে তারা। ভুলে যায় সমস্ত কিছু। হয়তো ভোলে না, মেনে নেয়। তাই এক স্থানে রমলার কণ্ঠে লেখক বলছেন,

"বিধাতা চুলের মুঠি ধরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি থামলেন, ক্লান্তিতে, আমরা তৎক্ষণাৎ উঠে তারই জন্য জল এনে দিলাম, তাকে বিজন করতে লাগলাম, তাহাতেই কত সুখ, ভাবলাম এই তো সুখের জীবন- কিন্তু আবার টান শুরু হল।"[15]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে আসলে বাংলার সাধারণ মেয়েদের করুন বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঠিক যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁইমাচা' (১৯৩১)[16] র ক্ষেন্তির জীবন। অভাব-অনটনে জেরবার এক দরিদ্র, অসহায় পিতা সহায়হরির কিশোরী কন্যা ক্ষেন্তিকে তার থেকে প্রায় তিনগুণেরও অধিক বয়সী পাত্রের দ্বিতীয়পক্ষ হিসেবে পাত্রস্থ করা, যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে দৈনন্দিন অত্যাচারকে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া এবং শেষে ক্ষেন্তির মৃত্যু, ভাগ্যের কাছে তার হার। শুধু ক্ষেন্তি নয় রবি ঠাকুরের নারী কেন্দ্রিক ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪)[17] র বিন্দুর জীবনকেও তো মৃণাল বাদে সকলেই তার ভাগ্য বলে প্রতিপন্ন করেছে।

তাহলে বলা যেতেই পারে যে ধূর্জটিপ্রসাদ আপামোর বাঙালি সমাজের নিকট মডেল হিসেবে রমলা চরিত্রটির উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। খগেন বাবুর মত যুক্তিবাদী মন সাধারণ নারীর মধ্যেও প্রগাঢ় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সন্ধান করে; না পেলে সমালোচনা করে, অথচ তাদের প্রেক্ষিত বুঝতে চায় না। তাইতো এক স্থানে রমলার কণ্ঠে লেখক খগেন বাবুদেরকে যে কোনো মানুষের খামতি-পূর্ণতা সবটাই গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। শুধুমাত্র স্বাধীনতা, সোচ্চার, নির্ভীকতা, সেবা পরায়নতা, স্নেহশীলতা নয়, রমলার চরিত্রে দৃঢ়তাও প্রখর। তাইতো যে মুহূর্তে রমলা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি খগেন বাবুর অভ্যাসে পরিণত হয়েছেন, কিংবা খগেন বাবুর প্রতি তার মন কোথাও গিয়ে ভাবিত, দুর্বল সেই মুহূর্তেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে 'অন্তঃশীলা'র প্রায় অন্তিম পর্ব পর্যন্ত রমলা চরিত্রের এই দৃঢ়তা লেখক বজায় রেখেছেন। তবে খগেন বাবুর সান্নিধ্যের অভাবে এবং তার চিঠির ব্যাকুলতায় শেষ পর্যন্ত রমলাও নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। ছুটে গিয়েছেন খগেন বাবুর কাছে কাশীতে। যে কাশীতে "মাসিমা", "মাধবী", "বিনোদিনী", "কাশীবাসিনী" (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এঁর 'কাশীবাসিনী')[18] কে ধর্ম রক্ষা করতে যেতে হয়, জীবনের শেষ ঠাঁই খুঁজতে যেতে হয় সেই কাশীতেই রমলা গিয়েছেন নিজের বন্ধুকে খুঁজতে। রমলা কাশীতে পৌঁছন ধূর্জটিপ্রসাদের 'আবর্ত' (১৯৩৭)[19] উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। কাশীতে পৌঁছে খগেন বাবুর সঙ্গে রমলার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা একত্রে থাকার কথা ভাবেন। তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে দুজন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির একত্র বাস একেবারেই সমাজ প্রত্যাশিত ছিল না। মাসিমা এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তবে এ বিষয়ে তার রাগ রমলার উপরেই ছিল। যদিও একত্রে থাকার সিদ্ধান্ত তাদের দুজনেরই। রমলা এবং খগেন বাবুর সম্পর্ক পরিণতি পায় ত্রয়ীর শেষ উপন্যাস

'মোহানা' (১৯৪৩)[20] র হাত ধরে। যেখানে দেখা যায় মাসিমার মৃত্যুর পর রমলা ও খগেন বাবুর একত্রে থাকার আর কোন বাধা থাকে না। আসলে সামাজিক বাধা তো ছিল, তবে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হিসেবে তারা তা মানেন নি। মাসিমার প্রতি খগেন বাবু নেহাত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন মাত্র। পরবর্তীতে তারা কানপুরে সংসার পাতেন, রমলা মা হতে চান (যদিও কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি)। এরপর খগেন বাবু তার বৃহত্তর সামাজিক জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বৃহত্তর জগতের কথা ভাবতে সাবিত্রী তাকে বাধা দিত, রমলা তা করেনি। রমলাও তার নিজের জগত খুঁজে নেন। তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। তবে খগেন বাবু রমলার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি বরং তার অতীত জীবনের লড়াইয়ের কথা মনে করে তার প্রতি অধিক স্নেহশীল হয়েছেন। শেষটা হয়তো আর পাঁচটা গল্পের মত নয়, রমলা ও খগেন বাবুর সংসার হয়তো তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে সংসার করা নয়। এখানে গতেধারা সাংসারিক জটিলতা নেই, আছে একে অপরকে বোঝা, বুঝতে না পারলেও একে অপরকে স্পেস দেওয়া, সম্মান করা।

ধূর্জটিপ্রসাদ যেভাবে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে নারী উপস্থাপনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শনগুলি থেকে বেশ ভিন্ন স্বাদের। তাঁর সাহিত্যে তিনি নায়িকাকে পতিব্রতা স্ত্রী, জননী, ত্যাগী রুপে তুলে ধরেননি। নারীকে, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এ কথা ঠিক যে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথমটির বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে তুলনার রেশ মিলেছে। স্বল্প শিক্ষিতা নারীর যুক্তি, বোধ প্রশ্নের মুখে পড়েছে। নারীর সাহিত্যচর্চা, সংগীত চর্চা নিতান্ত লোক দেখানো বিলাসীতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে এর পাল্টা যুক্তি তর্কের উত্থাপনও ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ চাইলে রমলার অতীত জীবনের লড়াইকে আরো মশলা মাখিয়ে উপস্থাপন করতে পারতেন, সাবিত্রীর প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে জিতিয়ে দিতে পারতেন, রমলাকে শেষ অবধি ত্যাগ কিংবা ধর্মাচরণের পথে নিয়ে যেতে পারতেন। তাতে হয়তো পাঠকের মন ভরতো তবে পরিবর্তনের বার্তা পাঠক পেতো না, ফলত ভিন্ন কিছু ভাবার বা করার অবকাশ থাকতো না।

সাহিত্য যেমন সমাজের প্রতিফলন, তেমনি সাহিত্যই আবার সমাজকে পথ দেখায়। এ প্রসঙ্গে Virginia Woolf কে অনুসরণ করে বলা যায়, "Books are the Mirrors of the soul."[21] অর্থাৎ বই বা পাঠ্য হল আত্মার প্রতিচ্ছবি। যেখানে লেখকের চিন্তা-ভাবনার নিদর্শন মেলে। পাঠক তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে সমাজতাত্ত্বিক-সাহিত্যিক যেভাবে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও চেতনার নিরিখে নারী উপস্থাপনা করেছেন তা সত্যিই পরিবর্তনকামী, সাহিত্যের গতানুগতিক ধারার থেকে ভিন্ন স্বাদের। তবে তা যে সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গ পক্ষপাত মুক্ত এ কথাও বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কিন নারীবাদীতাত্ত্বিক Kate Millett (2016) এঁর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় মূলত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান যেখানে অহরহ পুরুষত্ব ও নারীত্বের রূপকে লিঙ্গ ভূমিকা পালন চলে। এই ভূমিকার নিরিখে সমাজে উচ্চ-নীচ বিভাজন সৃষ্টি হয়। যেখানে পুরুষ থাকে উচ্চস্থানে, নারী নিম্নে। সাহিত্যেও একই ধারা পরিলক্ষিত হয়।[22] সেক্ষেত্রে উক্ত পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ধূর্জটি সাহিত্যকে একেবারে লিঙ্গ রাজনীতি মুক্ত বলে দাবি করা

হয়তো ঠিক হবে না। এ কথা ঠিক যে সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ বরাবর প্রগতি, সমতার কথা বলেছেন। তবে তা তিনি বলেছেন তাঁর সমাজতাত্ত্বিক নিদর্শন 'ব্যক্তিত্ব' (personality) র ধারণার নিরিখে। যেখানে তিনি সামাজিক সংযোগের চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিকেই মানুষ অর্থাৎ 'পুরুষ' হিসেবে স্বীকার করেছেন। যে কেবল 'আমি' অর্থাৎ individuality তে বিশ্বাসী নয়, গোষ্ঠী বা দলগত মনোভাবে বিশ্বাসী।[23] তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে উক্ত ধারণার নিদর্শন মেলে। তবে তিনি যে প্রগতি ও সাম্যের কথা বলেছেন তা নারীবাদী প্রেক্ষাপট থেকে বলেননি। অন্তত তাঁর অন্তঃশীলা'র অন্যতম নারী চরিত্র সাবিত্রীর উপস্থাপনা সে কথাই বলে। সাবিত্রী একজন স্বল্প শিক্ষিতা, বাঙালি গৃহবধূ যে তার বন্ধুদের থেকে বিলেতি আদব কায়দা অনুকরণ করতে শিখলেও অনুসরণ করতে পারেনি। তার জ্ঞান, যুক্তি ও বোধের অভাব ছিল। সে তার উচ্চশিক্ষিত, বিচক্ষণ, যুক্তিবাদী, জ্ঞানী স্বামীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। সে তার স্বামীর ন্যায় যে কোন সাহিত্য ও সংগীতকে তর্ক ও সমালোচনার নিরিখে উপভোগ করত না। খগেন বাবু কিন্তু সাবিত্রীর ক্ষমতা ও সীমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তারপরেও তিনি প্রত্যাশা রেখেছেন সাবিত্রী প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে বুঝবে এবং তার সাথ দেবে। তিনি সাবিত্রীর গুণগুলোকে স্বীকার করলেও তার খামতিগুলি মানতে পারেননি। আসলে তিনিও হয়তো অন্যান্য স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছেন, তবে তা অন্যভাবে। সাবিত্রীর তাকে বুঝতে পারা যেন অনিবার্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। যে কর্তব্যে ব্যর্থ হয়ে সাবিত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সাবিত্রীর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে হয়তো বা তার আচরণগুলি স্বাভাবিক ছিল কারণ সে তো সেভাবেই গড়ে উঠেছে। তাই তার পক্ষে নিজেকে ভেঙেচুরে হঠাৎ করে নতুন রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ঠিক এই কথাই রমলা খগেন বাবুকে বুঝিয়েছিলেন। তিনি তাকে যেকোনো মানুষের ভালো-মন্দ উভয় দিককেই গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে খগেন বাবু একটা সময়ের পর রমলা দেবীর প্রতি যতখানি উদার ছিলেন, সাবিত্রীর প্রতি তা ছিলেন না। তবে সাবিত্রীর সন্দেহবাতিকতা, কুটকাচালি সভাব, রূপ সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নারীর উচ্চশিক্ষার প্রতি সংকীর্ণ মনোভাব সত্যিই নিন্দনীয়। খগেন বাবু চেয়েছিলেন সাবিত্রী যেন এসব থেকে মুক্ত হয়। তবে সাবিত্রীর এই মনোভাবের পেছনে দীর্ঘকালের যে সামাজিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান তা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেও মানতে চাননি। আর মানতে চাননি বলেই ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছেন সাবিত্রির ওপর। সব ক্ষেত্রেই যে যুক্তি-জ্ঞান এক নয়, তাও যে প্রেক্ষিত নির্ভর একথা ভুলে গেছেন তিনি। লেখক নেহাত কম চালাক নয়, তাই তো সন্তর্পণে সাবিত্রী, খগেনের টানাপড়েনের বিষয়টি যৌক্তিকতার আলোকে সমালোচনার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। আর রমলাকে তুলে ধরেছেন শিক্ষিতা, আধুনিকা, বুদ্ধিমতী, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী নারী হিসেবে। রমলাই যেন তাঁর সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলির মূল আলোক বিন্দু যা বাংলা সাহিত্যে নারী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সত্যিই নজিরবিহীন। তবে সমালোচনামূলক উপস্থাপনা সত্ত্বেও যে তুলনার রেশ তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে তা সে দুই ভিন্ন রুপা নারী চরিত্রেরই হোক কিংবা নারী-পুরুষের - তা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের ভিন্ন ধারার উপস্থাপনাও যে লিঙ্গ রাজনীতির প্রশ্নের মুখে পড়েছে সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।

তথ্যসূত্র:-

Bali, Purnima. 'Evolution of Bengali Literature: An Overview', International Journal of English Language, Literature and Translation Studies, Vol. 3, Issue. 1, 2016, pp. 325-332

Bhasin, Kamla, What is Patriarchy?, 2nd ed., New Delhi: Kali for Women, 1994

De, Aritra, 'Colonial Encounters and the Women's Question in Late Nineteenth Century Bengali Literature', World History Bulletin, vol. XXXVI., No. 2., pp. 67-70

Millett, Kate, Sexual Politics, Columbia: Columbia University Press, 2016

Mitra, Avijit, 'Dhurjati Prasad Mukherji from the Personality to the Plane of Sociology', The Bengali Intellectual Tradition, Ed. Amal Kumar Mukhopadhyay, Kolkata, 2015, p. 298-326

Roy, Supendra Nath, & Kanika Roy, 'Influence of Gender Inequality in Bengali Literature', International Journal in Management and Social Science, Vol. 08, Issue. 10, 2020, pp. 81-85

Walby, Sylvia, Theorizing Patriarchy. Reprinted., UK: Basil Blackwell Ltd, 1991

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, পু. মু. ১১, কোলকাতা: বিশ্বভারতী পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৪০৫

পানিগ্রাহী, উমাপদ, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও চিন্তাধারার ইতিহাসের রূপরেখা, সং. ২, কোলকাতা: কল্যাণী পাবলিশার্স, ২০১৬

মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'অন্তঃশীলা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭

মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'আবর্ত', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭

মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'মোহানা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭

https://youtu.be/CcDyII2jwQg?si=BAuoZlAwiNxyz4Ce, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১:৩৫ মিঃ

https://youtu.be/3PB00bw997w?si=RPF1xsd4nAtP5wZs, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৬:৩২ মিঃ

https://youtu.be/0XZn4kj04eg?si=3DTzLrAzFzDa3vTQ, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৮:৪৫ মিঃ

https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/14091/1/Unit-6.pdf,

২৪ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১২:৩০ মিঃ, পৃ. ৬৬-৭৫
https://youtu.be/hdfo8cABHLU?si=FD42830vm-i0RR3q, ২৫ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৯:৩৫ মিঃ
https://youtu.be/s44zx75ENpU?si=_ldCDIzY0C2namCs, ২৫ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১১:১২ মিঃ

Endnotes

২৪ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১২:৩০ মিঃ, পৃ. ৬৭-৭৪

2 Bali, Purnima, 'Evolution of Bengali Literature: An Overview', International Journal of English Language, Literature and Translation Studies, Vol. 3, Issue. 1, 2016, pp. 329-332

3 Bhasin, Kamla, 'What is Patriarchy?'. 2nd ed., New Delhi: Kali for Women, 1994, p. 3

4 Walby, Sylvia, Theorizing Patriarchy. Reprinted., UK: Basil Blackwell Ltd, 1991, pp. 91-92

5 De, Aritra, 'Colonial Encounters and the Women's Question in Late Nineteenth Century Bengali Literature', World History Bulletin, vol. XXXVI., No. 2., pp. 67-70

6 Roy, Supendra Nath, & Kanika Roy, 'Influence of Gender Inequality in Bengali Literature', International Journal in Management and Social Science, Vol. 08, Issue. 10, 2020, pp. 81-84

7 পানিগ্রাহী, উমাপদ, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও চিন্তাধারার ইতিহাসের রূপরেখা, সং. ২, কোলকাতা: কল্যাণী পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ২৯৩-২৯৪

8 মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'অন্তঃশীলা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ১৯৫৭, পৃ. ১

9 https://youtu.be/hdfo8cABHLU?si=FD42830vm-i0RR3q, ২৫ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৯:৩৫ মিঃ

10 ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, পু. মু. ১১, কোলকাতা: বিশ্বভারতী পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৪০৫, পৃ. ৯-২৪২

11 মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'অন্তঃশীলা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ১৯৫৭, পৃ. ৮৫

12 https://youtu.be/s44zx75ENpU?si=_ldCDIzY0C2namCs, ২৫ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১১:১২ মিঃ

13 মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'অন্তঃশীলা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭, পৃ. ৩৭

14 তদেব, পৃ. ৮২

15 তদেব, পৃ. ৮২
16 https://youtu.be/CcDyII2jwQg?si=BAuoZlAwiNxyz4Ce, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ১:৩৫ মিঃ
17 https://youtu.be/3PB00bw997w?si=RPF1xsd4nAtP5wZs, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৬:৩২ মিঃ
18 https://youtu.be/0XZn4kj04eg?si=3DTzLrAzFzDa3vTQ, ২২ জুলাই, ২০২৪, সময়- ৮:৪৫ মিঃ
19 মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'আবর্ত', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭ পৃ. ১৭১-৩১২
20 মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'মোহানা', ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, খ. ১, কোলকাতা: দে জ পাবলিসিং, ১৯৫৭ পৃ. ৩-১৫৯
21 https://www.goodreads.com/work/quotes/2651199-between-the-acts, 24 July, 2024, Time-3:00pm
22 Millett, Kate, Sexual Politics, Columbia: Columbia University Press, 2016
23 Mitra, Avijit, 'Dhurjati Prasad Mukherji from the Personality to the Plane of Sociology', The Bengali Intellectual Tradition, Ed. Amal Kumar Mukhopadhyay, Kolkata, 2015, p. 305

পূর্ব ভারত

বৌদ্ধধর্মে নারীর স্থান

মন্দিরা পাল
সহকারী অধ্যাপক, বি. এড. বিভাগ
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ :

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা এবং আচার অনুষ্ঠান ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রথমদিকে বা বৌদ্ধ সংঘে নারীদের প্রবেশের অধিকার পর্যন্ত ছিলো না। পরবর্তীকালে গৌতমী এবং প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধদেব নারীদের সংঘে প্রবেশাধিকার দেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে নারী হয়ে জন্মানো তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল হিসাবে দেখানো হতো। নারীদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মাচরন সাধনা তথা বোধিসত্ত্ব লাভের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব পর ছিলো না বলে মনে করা হত। নারীদের গৃহস্থ কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন বুদ্ধদেব। যদিও বহু নারী বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে শ্রমনা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুনী পদে আসীন হয়েছিলেন। তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম নীতি ও প্রনয়ন করা হয়েছিলো যা পুরুষ ভিক্ষুদের ছিলো না। পুরুষ ভিক্ষুদের তুলনায় সন্ন্যাসিনীদের নিম্নস্তরের বলে গণ্য করা হতো, প্রতজ্ঞাদীপ্ত ও দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন হবার পরেও। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং নারীকে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও নিয়ে আশা হয়। একমাত্র নারীদের জাতপাতের বিভাজন ছিলো না। এমনকি নারী দেবদেবীদের শক্তির আধার রূপে উপাসনা করা হয়। এই নারীদেবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'তারা'। নারীদের কার্যকলাপ বৌদ্ধ মঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিশেষ কোনো আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও সরকার থেকে গৃহীত হয়নি। তবুও ভিক্ষুনী সম্প্রদায় তাদের শিক্ষাদান, যোগদান এখন চালিয়ে যাচ্ছেন প্রকৃত বাধাসত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুনীগণ ধর্মশাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর দেখেছেন।

মূলশব্দ : বোধিসত্ত্ব, বিভাজন, বৌদ্ধসংঘ, বৌদ্ধ ভিক্ষুনী, নিম্নস্তর, শ্রমনা।

বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সমাজেও নারীরা আপন সৃজনী শক্তির সাহায্যে নিজেদের চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করে চলেছেন। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম ছিলো না। বৌদ্ধযুগেও নারীরা আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বৈদিক যুগের মতো বৌদ্ধযুগেও তন্বতত্তানে পরিপূর্ণ পরিসোসা, ক্ষেমা, বিশাখা , সুজাতা, উৎপলবর্ণা প্রমুখ নারীদের গুণকীর্তনে বৌদ্ধসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত। প্রসিদ্ধ সূত্রপিটাকে বলা হয়েছে যে, নারী বা পুরুষ সকলেই নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে নারী, পুরুষ সকলের সমানাধিকার ছিলো। তাই জনসাধারণ সহজেই এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারীরাও পিছিয়ে ছিলো না। গৃহ কর্তব্য পালনের সাথে সাথে ধর্মাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্মশিক্ষাপ্রদানেও

এগিয়ে এসেছেন। যদিও এই পথ খুব মসৃণ ছিলো না। বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ থেকে শুরু করে গুরুর কাছে শিক্ষাগ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই নারীকে তার প্রতিভার প্রমাণ নিতে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, সমাজসেবা সকল ক্ষেত্রেই নারীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধসঙ্গ ছিল অবারিত দ্বার। সকলের প্রবেশের অধিকার ছিল। তবে প্রথমদিকে মহিলাদের সংঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধ মনে করতেন স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসী দলে প্রবেশ করলে সঙ্গে সমস্যা দেখা দেবে। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ যখন প্রথম প্রসঙ্গ উত্থাপন কারণ তখন বুদ্ধ বলেছিলেন, "স্ত্রী লোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয়, তাহা হইল এই ধর্ম সহস্র বৎসর অব্যহত থাকিবে; তার তাহাদের বৌদ্ধসঙ্গে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অল্পকালের মধ্যেই সত্য ধর্ম লোপ হইবে"।[১] পরবর্তীকালে অনেক সাধনার পর বুদ্ধদেব মহিলাদের সঙ্গে প্রবেশের অনুমতি দেন। নারী সন্ন্যাসিনীরা উচ্চমর্যাদা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হলেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর থেকে সর্বদা নিম্নস্তরের বলেই গণ্য করা হতো। মনে করা হতো গৃহকর্ম নারীদের ধর্মাচরনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, নারীরা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকাই শ্রেয়। মহাযান সূত্রে নারীদের বোধিসত্ত্ব লাভের জন্য তিনটি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে।

(১) নারীকে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

(২) বোধিসত্ত্বের নীচের স্তরে নারীকে স্থান দেওয়া।

(৩) বোধিসত্ত্বের উপরের স্তরে নারীকে স্থান দেওয়া। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিকেই প্রাধাণ্য দেওয়া হয়েছে। এমনকি কিছু সূত্রে নারীকে পুরুষে পরিবর্তন হতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে।

তবুও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন নারীদের নাম আজও উজ্জ্বল তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন —

আম্রপালি গণিকা :

বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে আম্রপালী গণিকার আশ্রমে বিশ্রামে করেছিলেন তখন আম্রপালী তার সাথে দেখা করেন। বুদ্ধের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শোনার পর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সর্বোপরি আম্রপালীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

বিশাখা : বিশাখা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বুদ্ধ যখন তার শিষ্যদের নিয়ে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে আসেন। তখন বিশাখা বৌদ্ধভিক্ষুদের অভ্যর্থনার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভিক্ষুকদের অন্নদান, পরিব্রাজক শ্রমণ দের অন্নদান ও বিশ্রামের ব্যবস্থা, ভিক্ষুকদের বর্ষায় বস্ত্রদান প্রভৃতি কাজ তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘের জন্য করেছিলেন। তিনি নগরের পূর্বদিকস্থ একটি সুরম্য উদ্যান উৎসর্গ্য করেন, তার নাম ছিল পূর্বারাম।

সুজাতা : বৌদ্ধসঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার ছিল অনেক সাধ্য সাধনার ফল। গৌতমী এবং আনন্দের অনুরোধে নারীরা সঙ্গে প্রবেশাধিকার পায়। তবে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেন, যা ছিল প্রায় মনুর নিধানের অনুরূপ -

(১) ভিক্ষুদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তিশ্রদ্ধা করবে।

(২) যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই, ভিক্ষুনী সেখানে বর্ষাযাপন করিবেন না।

(৩) প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুণী ভিক্ষু সঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে উপবাসদি ধর্মানুষ্ঠান করবেন ও সঙ্ঘের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন।

(৪) বর্ষার উৎসব উদযাপিত হলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুনী-সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রত পালন করবেন।

(৫) দুই বৎসর অধ্যায়নের পর উভয় সঙ্ঘ থেকে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করবেন।

(৬) শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

(৭) ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধরা ভিক্ষুণীদের সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

এই ধর্মানুশাসন গ্রহণ করে মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের প্রথম শিষ্যা হলেও। সুজাতা সম্ভ্রান্ত বংশের পুত্রবধূ হয়ে তিনিও বুদ্ধের শিষ্যা হলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম হলেও নিয়মনীতি কিন্তু ভিক্ষুদের তুলনায় বেশি ছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পুণ্য বলে ব্রাহ্মণ্যপাদ অরূঢ় হতে পারতেন, এমনকি অর্হৎ হবারও অধিকারিণী ছিলেন।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হবার পরে বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহ ফিরে বেণুবনে ষষ্ঠ বর্ষা যাপন করেছিলেন, সেই সময় ক্ষেমতারাণীর দীক্ষা হয়। তথাগতের সদুপদেশ পাবার পর ক্ষেমতা সংসার ত্যাগ করে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তিনি তথাগতের সর্বদা দক্ষিণ পার্শ্বে থাকতেন। তাই তাকে 'দক্ষিণ হস্ত' শ্রবিকা বলা হত।

উৎপলাবর্ণা : উৎপলাবর্ণা এক ধনবান গৃহপতির কন্যা ছিলেন। অপরূপ রূপ লাবণ্যের অধিকারী উতপলাবর্ণাকে বিবাহ হলে শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।এই আশঙ্কায় ধনপতি কন্যাকে বৌদ্ধধর্মের দীক্ষিত করলেন। উতপলাবর্ণা ক্রমেই অর্হৎ পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তথাগতের বামদিকে বসতেন বলে তাকে বামহস্ত পত্রিকা বলা হত।

থেরীগাথাঃ পুর্ণা, ভিষ্যা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধম্মদন্ডা ইত্যাদি নারীদের উল্লেখ থেরীগাথায় পাওয়া যায়। সূত্রপিটকে থেরগাথা ও থেরীগাথা নামক দু'খানি গাথা সংগ্রহ পুস্তক আছে, সেখানে রচয়িতা, রচয়িতীদের নাম ও জীবনকাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

থেরীগাথার গাথাগুলি অতি সুন্দর ও লেখিকার সুবুদ্ধি এবং ধর্মশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল তপস্বিনীরা বৌদ্ধধর্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ সেই উপদেশ শ্রমন করতেন। বৌদ্ধ নারীদের আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক অনুভূতি কত গভীর ও সমৃদ্ধ ছিলো তার প্রথম হল ভিক্ষুণীগণ রচিত 'থেরিগাথা' সংকলন। এই গ্রন্থটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি সেই যুগেই নারীদের শিক্ষার মান কত উচ্চ ছিল। পাঁচ শতাধিক গাথার সংকলন এই গ্রন্থটি সত্যিই অভিনব ও বিস্ময়কর। এটি হল একান্তর জন ভিক্ষুনীর রচনার সংকলন। এই গাথাগুলির মূল বক্তব্য হল বৌদ্ধসংঘের ত্যাগ ও পরিপূর্ণ নির্মাণের মহিমা প্রকাশ। কীভাবে এইসব নারী ত্যাগের ধর্মে দীক্ষিতা হয়ে সংঘে প্রবেশ করেছেন ও কীভাবে জীবনে শান্তি পেয়েছেন, তার

কাহিনী ছাত্র ছাত্র অনুরণিত। এদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ আচার্যা, ধর্মোপদেশদাত্রী ও সমাজসেবিকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। 'ধম্মদিন্না' নারী উপদেষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা 'ধম্মকথিকা' হিসাবে সম্মানিতা হন। এছাড়া সুক্কা, পাটচারা প্রভৃতি ছিলেন ধর্মকথিকা ও সুবক্তা। সুক্কা খুব সহজ, সুরল ভাষায় বৃহৎ জনসভাতে ও বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ দীক্ষা দিতেন। ভিক্ষুণী পাটাচারা ছিলেন বিশেষভাবে বিনয়পিটক জ্ঞানসম্পনা ও তিনি পাঁচশো শোকাতুরা নারীকে বৌদ্ধসংঘে অনয়ন করে। তাদের নির্বাণের পথে চালিত করেন। এছাড়া সুলননন্দা, ভদ্দা-কাপিলানী, ভদ্দা-কুন্তলাকেশা প্রভৃতি নারী বৌদ্ধ সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছেন।[২]

বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রে দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন নারীরা থাকলেও নারীদের উপর বিধিনিষেধও কম ছিল না। বিহারে তাদের গতিবিধি এবং কাজকর্মের উপর যথেষ্ট বিধি নিষেধ ছিল। ভিক্ষুনী পদে উন্নীত হবার জন্য নারীদের বহু বছর নিয়ম নীতির মধ্যে অতিবাহিত করতে হতো। শিক্ষালাভের সময় শুরুর কাছে একা শিক্ষাগ্রহণও করা যেত না। Tosmo দেখিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে নারীদের কতকগুলি বাধা অতিক্রম করতে হতো প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় রীতিনীতি, সঙ্গে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, ভিক্ষুদের তুলনায় তারা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বৌদ্ধসংঘের ভিক্ষুণী যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তারা কখনই 'Arhot'। পর্যায় উপনীত হতে পারতেন না। বৌদ্ধ সঙ্গে নারীদের প্রবেশাধিকার ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অধ্যয়নের অধিকার থাকলেও তাদের যথেষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হতো।[৩]

গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বৌদ্ধধর্ম বহু শাখায় বিভাজিত হয়ে যায়। বিশেষত বজ্রযান এবং মহাযান শাখায় তন্ত্রসাধনায় নারীদেরও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা যায়। হিন্দুধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মে নারীকে শক্তির প্রতীক বলে চিহ্নিত করা হতো। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পুরুষ দেবতার মতো নারীদেবীরও আর্বিভাব ঘটে। নারীদেবীকে পুরুষদেবতার শক্তিরূপে দেখা হতো। ফলে তন্ত্রসাধনায় বইয়ে পঞ্চরক্ষা দেবীর কথা বলা হয়েছে। এরা হলেন মহাপ্রতিসরা, মহাসহস্রপ্রমালিনী, মহামন্ত্রানুসরিনী, মহাসিতবতী, মহাময়ূরী। বিভিন্ন আসনে বসে থাকা এইসব বলুভূজা দেবীদের প্রত্যেকেরই সাথা অনেকগুলো এবং প্রত্যেকের বর্ণ আলাদা। বৌদ্ধতন্ত্র নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলে তারা। তারার বিভিন্নরূপ ধ্যানীবুদ্ধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে বলা যায় ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির ফুলের নীলপদ্ম হাতে শ্যাম তারা, রত্নসম্ভব ফুলের বজ্রতারা এবং একজটাসহ শ্যাম তারার মূর্তিই বেশি পাওয়া গেছে। নারী দেবদেবীর পাশাপাশি বৌদ্ধতন্ত্রে যোগসাধনাকে যে কোন সম্প্রদায়ের নারীকে আসতে পারতেন। এক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না। নারীকে মূলত প্রজ্ঞা এর কণার আধাররূপে বৌদ্ধতন্ত্রে দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে তাদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি থাকলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে বিশেষত সংঘের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাদের অধিকার, সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রভৃতি বিষয়ে। ক্রমশ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের প্রাচীন জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। তারা সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বৌদ্ধ সমাজেও নারীদের পুরুষদের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষরাই নারীদের শিশুক এবং পুরুষরা

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে আসছে। Rita Gross দেখিয়েছেন যে, "Discarding Patriarchal Gender Roles and Adopting more Attractive, Equitable and Human alternatives; Advocacy that Woman be Economically, Competent rather than continuing to rely on Men for their Maintenance". (Rita Gross, 1996)। বৌদ্ধধর্মে সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হলেও নারীদের কথা সেইভাবে উল্লেখ বা আলোচনা করা যায়নি। বর্তমানে বৌদ্ধনারীরা তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্মে নারীদের অবস্থার প্রভূতি উন্নতি ঘটবে। Diana Y. Paul বলেছেন, "Women Practicing Buddism were forced to Overcome traditional Negative Stereotypes of Women in order to practice the Dharma and Continue on the Path to salvation".[৫]

এখনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেছে। সরকারদের থেকে তাদের জন্য বিশেষ কোনো আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয় না। তবুও তারা গ্রামে গিয়ে সেবা, শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছেন। নারী সমানাধিকারের কথা যতই বলা হোক না কেন? বৌদ্ধ নারীরা আজও পিছিয়ে আছে এবং তারা আজও লিঙ্গ বৈষম্যের স্বীকার।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ (২০১২), বৌদ্ধধর্ম, পত্রলেখা পাবলিশার্স, কোলকাতা - ৯, পৃঃ ৯৯।
২. চক্রবর্তী, অতুলানন্দ (১৩৩৯), প্রাচীন ভারতে নারী যজ্ঞ ও শিক্ষায় অধিকার, পৃঃ ২৫৯-২৬৫।
৩. Tosmo, Karma Lekshe (1999), In Buddhist Woman across Cultures: Realizations, Albany - State University of New York Press, PP. - 1-44.
৪. Gross, Rita (1999), Feminism Lay Buddhism and the Future of Buddhism, Albany - State University of New York Press, PP. - 277-289.

গ্রন্থপঞ্জী

Banarjee, J.P. Education in India,fifth ed, Central Library, Kolkata, 2006, PP.- 43-44.
মিশ্র,সুবিমল, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস,দ্বিতীয় সং, রিতা বুক এজেন্সি, কলকাতা, (২০১১), পৃ:৫৪-৫৫
ঘোষ, রনজিত যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা , দ্বিতীয় সং, শোভা বুক এজেন্সি, কলকাতা (২০১০), পৃ: ৪৯-৫৬।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২): বাংলার নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষা

মুহাম্মদ ইসহাক
সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম -৪৩৩১, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ:

নারী শিক্ষা, নারী মুক্তি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলার ইতিহাসে একটি অবিসংবাদিত ও অবিস্মরণীয় নাম। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি তথা সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। 'নারীমুক্তির বিষয়টি যতো বেশি প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করছে, নারীসমাজ বাঁধার অর্গল ভেঙে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যতো এগিয়ে আসছে রোকেয়ার নাম ততো বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, জন্মের শতবর্ষ পার হয়ে গেলেও তাঁর মহিমা কোনোভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার নয়, বরং দিনে দিনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে এবং আগামী দিনের রোকেয়ার তাৎপর্য নতুনভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। রোকেয়ার মতো এমন কালজয়ী প্রতিভা উপনিবেশিক ভারতের নারী সমাজে বিশেষ দৃশ্যগোচর হয় নি। এর একটি বড় কারণ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনদৃষ্টিভঙ্গির সমগ্রতা, যা তাঁর সাহিত্যে ও কর্মে নানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।'[১] তখনকার মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা নিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। তবে বেগম রোকেয়া নানান বাঁধা পেরিয়ে জ্ঞান অর্জন ও সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। সমাজের নানান অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন। তিনি নারী সমাজকে জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সমাজে নারী যদি শিক্ষিত না হয় তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের অগ্রগতি সম্ভব নয়। 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো ধরনের যোগ্যতা রোকেয়ার ছিল না ; কিন্তু বাংলায় তো বটেই, এমনকি মৌলিক ইংরেজি রচনাতেও তিনি যে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তা উচ্চতর ডিগ্রিধারী নারীর পক্ষেও ঈর্ষণীয়।'[২] ব্রিটিশ শাসনামলে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করলেও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শিক্ষা ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে নারী সমাজের কখনো উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হবে না। তাই তিনি নারী সমাজকে জাগ্রত ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: নারী শিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, পর্দাপ্রথা, নারী জাগরণ, নারী আন্দোলন, পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারীর ক্ষমতায়ন।

বেগম রোকেয়ার চিন্তায় ছিল কিভাবে নারী সমাজকে এগিয়ে নেয়া যাবে? কারণ তিনি নিজেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে পারেনি। পরিবার ও সমাজের নানান কুসংস্কার ও বাঁধার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 'নারীশিক্ষার আলো প্রজ্জ্বালনে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল এবং সমিতি (আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম)

বা মুসলিম মহিলা সমিতি। আমৃত্যু সমাজের নানাবিধ সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত রেখে নারীশিক্ষার কাজ করে গেছেন তিনি।'[৩] তিনি মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে বিভিন্ন কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নারী শিক্ষা নিয়ে তখনকার সমাজে নেতিবাচক ধারণা ছিল। বেগম রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন, "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন: এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি-তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"[৪] তিনি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন, 'আমরা সমাজের অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরুপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে-সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরুপ গুণের আবশ্যক।'[৫] বেগম রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন নারীর মুক্তির জন্য সবার আগে শিক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে। অজ্ঞতা ও প্রচলিত কুসংস্কার প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা। 'রোকেয়া তাই নারী-শিক্ষা বিস্তারকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ব্রত পালন করতে গিয়ে সেদিন তাঁকে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে দাড়াঁতে হয়েছিল।'[৬]

ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার আন্দোলনে পেছনের ইতিহাস বেশ পুরানো। সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের জনগণ বসবাস করে। হিন্দু সমাজের নারী শিক্ষার সাথে অনেকে জড়িত ছিলেন। ভারতের হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষার জন্য যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য - বিদেশিনী মিসেস উইলসন (মিস কুক), মিস মেরী কার্পন্টার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন (দক্ষিণানন্দ) মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ।[৭] এছাড়া আরো অনেকে নারী শিক্ষার প্রসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় নারীদের শিক্ষা ব্যাপারে কাজ করেছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালে ২০ আগস্ট ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। 'সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে মেয়েদের শিক্ষা চালু করা ও অবরোধ প্রথা দূর করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমাজে আশ্রয়হীনা, পতিতা, বিধবা, অত্যাচারিত মেয়েরা ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় পেত। ব্রাহ্মসমাজ নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।'[৮] নারী শিক্ষায় হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে তখনও মুসলিম সমাজে নারীরা শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। তখনকার সময়ে মুসলিম

সমাজে নারী জাগরণের প্রভাব পড়েনি। 'ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই হিন্দু -মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়ে গিয়েছিল শিক্ষা, চাকরি ও প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে। নবযুগের যেসব প্রগতিসূচক ও আধুনিক ধ্যানধারণা এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল তা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেই সমাজে প্রসারিত হয়েছিল বলে হিন্দু -মুসলিম উভয়েরই ধারণা ছিল -বাংলার নবজাগরণ মোটামুটিভাবে হিন্দু সমাজের ব্যাপার।'[৯]

সে সময় মুসলিম সমাজে নারীদের শিক্ষা ব্যাপারে কেমন অবস্থা ছিল, তাও জানা প্রয়োজন। নারী শিক্ষার বিষয়ে বেগম রোকেয়ার চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি। তখন 'মুসলিম নারীদের পর্দা নষ্ট হওয়ার ভয়ে স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোর আগ্রহ ছিল না। মেয়েদের গৃহশিক্ষাই তারা পছন্দ করতেন এবং এই গৃহশিক্ষা মূলত ছিল ধর্মীয় শিক্ষা। শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাই নয়, বাংলা ভাষা শিক্ষাও মুসলিম মেয়েদের জন্য সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল।'[১০] যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তখনকার সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। নারী -মুক্তি অর্জনের জন্য নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখার প্রথায় মূলোচ্ছেদ - এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আমরণ তিনি আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এছাড়াও মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে নারীদেরকে নিয়ে নারী সংগঠন স্থাপনেও অগ্রগামী ছিলেন।'[১১] লেখক মোরশেদ শফিউল হাসান তাঁর বইয়ে বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিষয়ে লিখেছেন, "মুসলমান নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় রোকেয়া নাম্নী এই বিধবা রমণীটি ছিলেন -তাঁর কালে -বলতে গেলে একেবারেই একা। গোড়ায় সেদিন কোন সহৃদয় ব্যক্তিত্বই, সাহস করে, তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রায় নিঃসঙ্গ পদাতিকের। হ্যাঁ, সঙ্গী ছিল রক্ষণশীল সমাজের সন্দেহ, অন্ধবিশ্বাস, ঘৃণা, অপবাদ আর লাঞ্ছনা।"[১২]

প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও রোকেয়া থেমে থাকেননি। তিনি সংগ্রাম ও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। নারীমুক্তির জন্য ও শিক্ষা লাভের জন্য তাঁর মহৎ অবদান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন।[১৩]

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এযাত্রায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ জন। উল্লেখ্য যে, ১৯০৯ সালে বেগম রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। রোকেয়া তাঁর স্বামীর সাথে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১১বছর সংসার জীবনযাপন করেছিলেন। অল্প বয়সে রোকেয়া স্বামীহারা হন। স্বামীর মৃত্যুর পরে রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলেন। পারিবারিক কারণে "রোকেয়া অতিষ্ঠ হয়ে অগত্যা ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে চিরদিনের জন্য সাধের ভিটা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ সালের ১৬ ই মার্চ কলকাতায় অলিউল্লাহ লেনের একটি

ছোট বাড়ীতে আটজন ছাত্রী নিয়ে নূতনভাবে স্কুল আরম্ভ করেন। পরে ৮৬/এ,লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে তা স্থানান্তরিত হয়। রোকেয়ার অক্লান্ত সাধনায় স্কুলটি একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা -প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে।"[১৪] কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বেও আরো দুটি মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় চালু ছিল। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরদৌস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। অপরটি ১৯০৯ সালে সোহরাওয়ার্দী পরিবারের খুজিস্তা আখতার বানু প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা হলেন খুজিস্তা আখতার বানু।[১৬] 'শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীমুক্তি সাধনে স্কুল দুটির ভূমিকা কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১৩ সালের ৯ই মে তারিখে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ১৩ নম্বর ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে সরানো হয়।'[১৭]

১৯১১ সালের ১৬ মার্চ আটজন ছাত্রী ও দুটো বেঞ্চ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র শিক্ষক ছিলেন বেগম রোকেয়া। "প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি নেই ঠিকই; কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা সবকিছুতেই তাঁর অগাধ জ্ঞান। কলকাতার সমাজ তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে তিরস্কার করতে লাগল।এবার রোকেয়া তেমন ভয় পেলেন না। লোকনিন্দাকে দুমড়ে ফেলে তিনি সামনে এগোতে থাকলেন। ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ১৪ নং রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে স্কুলের প্রথম সভা আহ্বান করলেন ২ এপ্রিল ১৯১১ সালে। এ সভায় মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলীকে স্কুল পরিচালনা কমিটির সম্পাদক করা হলো।"[১৮] স্কুলের লেখাপড়া এগিয়ে যাচ্ছে বেগম রোকেয়ার কঠোর পদক্ষেপে। কিন্তু নানা সমস্যাও দেখা দেয়। এসকল বাঁধা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করতেন। স্কুল 'প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন থাকার পরও রোকেয়া রোজ ঘুরে ঘুরে স্কুল দেখতেন। কখনো শিক্ষয়িত্রীদের সাথে আলাপ -আলোচনা করতেন। কখনওবা তাঁর টেবিলে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতেন। স্কুলের সবার প্রতি ছিল তাঁর সমান নজর। রোকেয়ার স্বপ্ন পূরণ হলো স্কুলটির সুনাম অর্জনের মাধ্যমে।'[১৯]

বেগম রোকেয়ার সময়ে সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করেন, 'কেবল মানসিক বিকাশ নয় বরং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। সুগৃহিণী হওয়ার জন্যও সুশিক্ষা প্রয়োজন। কারণ পারিবারিক দায়িত্বসমূহের সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। একইভাবে সন্তানের জন্য জননী হওয়ার জন্যও সুশিক্ষা প্রয়োজন। কারণ সন্তানের লালনপালন মায়ের ওপর নির্ভরশীল এবং সন্তানের প্রথম শিক্ষা অর্জিত হয় মায়ের নিকট থেকে।'[২০] বেগম রোকেয়া ধর্ম ও বর্ণে উদারপ্রকৃতির চিন্তার মানুষ ছিলেন। তাঁর চিন্তা চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক। সমাজের মধ্যে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য কথা বলেছেন। প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে গেছেন। বেগম রোকেয়া তাঁর 'বোরকা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক -জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করতি হইবে। শিক্ষার অভাবে আমরা

স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন।"[২১]

নারী জাগরণের ইতিহাসে উনিশ শতককে বাঙালি নারী জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা যায়। এসময় বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের নারী জাগরণের আন্দোলন বেগবান হলেও মুসলিম সমাজে নারী জাগরণ অনেকটা অনগ্রসর ছিল। বাঙালি মুসলমান নারীদের জাগরণ ও সচেতন করতে আন্দোলন, সংগ্রাম ও লেখনী ধারণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। মহিয়সী নারী রোকেয়ার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল ও নূর জাহান বেগম প্রমুখ।[২২] বেগম রোকেয়া যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানেও কঠোর পর্দা প্রথার নামে নারীদের অবরোধ প্রথায় রাখা হতো। এরকম অবরোধের মধ্যে তাঁর শৈশব জীবন গড়ে উঠেছিল। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী শুধু পুরুষ নয় - আত্মীয় নন এমন মহিলাদের সামনে গেলেও মহিলাদের পর্দা করে যেতে হতো।[২৩]

তখন মুসলিম সমাজে নারীদের কিভাবে অবরোধ প্রথায় রেখেছিলেন তা বেগম রোকেয়া তাঁর 'অবরোধ -বাসিনী' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বেগম রোকেয়া 'অবরোধ -বাসিনী' গ্রন্থে লিখেছেন, "সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন ; সেই জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচী-কর্ম করিতে থাকিবে, -নড়িবে না। এমন কি দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।"[২৪] সমাজের নারীর বাস্তব জীবনের অধিকার সম্পর্কে ও নারীর চিন্তা -চেতনার জাগরিত করার জন্য তিনি অবরোধ -বাসিনী গ্রন্থটি লিখেছেন। শিক্ষাবিদ শাওয়াল খান লিখেছেন, "বেগম রোকেয়া লিখেছেন মেয়েদের জন্য, মায়েদের জন্য। অধিকারহীন নারী জীবনের দুঃখ একটা একটা করে তুলে সমাজকে তা জ্ঞাত করা এবং তার প্রতিবধান করা ছিল তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র। তিনি তাঁর মাকে অবরোধবাসিনী (১৯২৮) উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন অবরোধ প্রথার কঠোর সমর্থক। অবরোধ প্রথাকে জীবনের আরাধনা মনে করতেন।"[২৫]

সে যুগে নারীর প্রতি অবরোধ, অনুশাসন ও বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও সামাজিক বিবেকবোধ জাগ্রত করতে সংগ্রাম করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্য চর্চা, শিক্ষাবিস্তার ও বিভিন্ন রকমের কর্মকাণ্ড নারী সমাজের জন্য আলোকিত পথ নির্মাণ করেছেন।[২৬] ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনেও বাঙালি নারীদের ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন। মুসলমান মেয়েদের সমাজের কঠিনপর্দা ও অবরোধ প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়।[২৭] মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য নারী সমাজকে

শিক্ষায় এগিয়ে নেওয়া জরুরি।[২৮] স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি। তিনি এ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্নভাবে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করে তুলেছিলেন।[২৯] আধুনিক বিশ্বে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেখা যায়। কিন্তু একসময় নারীর ভোটাধিকার নিয়ে অনেকেই বিরোধিতা করেছিল।[৩০] সাহিত্যিক আবদুল কাদির বেগম রোকেয়ার সাহিত্যের চিন্তা -চেতনার সম্পর্কে লিখেছেন, "মতিচুর ১ম ও ২য় খণ্ড, Sultana's Dream, পদ্মরাগ, অবরোধ -বাসিনী প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে তাঁর জীবনের ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়া আছে। মতিচুর ২য় খণ্ডে সৌরজগৎ, ডেলিশিয়া-হত্যা, জ্ঞান -ফল, নারী-সৃষ্টি, নার্স নেলী, মুক্তি -ফল প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা আছে। মেরী করেলির Murder of Delicia উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত গল্পটিতে তিনি দেখায়ইয়াছেন যে, পুরুষ -শাসিত সভ্যদেশেও নারীর দুঃখের অবধি নেই ; আর নার্স নেলীতে গৃহের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হইয়াছে।"[৩১]

মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশের রংপুর জেলায় পায়রাবন্দে জন্মগ্রহণ করলেও অঞ্চল, জেলা, বিভাগ ও দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়। ভারতের রোকেয়া ইন্সটিটিউট অব ভালু এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (রিডার) প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রোকেয়া সম্পর্কে লিখেছেন, "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র মত উদ্ভাসিত হচ্ছেন রোকেয়া। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানডায়। তাঁর লেখা ভারতীয় ভাষা ছাড়াও অনূদিত হয়েছে জার্মান, ফরাসি ও স্প্যানিস-এ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা চর্চায় অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় রোকেয়ার যুক্তিবাদী চপতনায় উৎস নির্ণয়।"[৩২] বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে লক্ষ্য করার মতো। বেগম রোকেয়ার আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতিফলন আজকের পৃথিবীতে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব সেবায় নোবেল পুরস্কার পান মাদার থেরেসা, জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী হেলে থনিং স্মিড, পেপসিকোর সিইও ইন্দ্রা নুয়ি, আইসিআইসি আই ব্যাংকের এমডি ও সিইও চন্দা কোছার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রাগান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রমুখ।[৩৩] আশার কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতেও নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে। নারীর অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন হয়েছে। এদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদের স্পীকার, শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী, শিক্ষক, পুলিশ, বিচারক, সংসদ সদস্য, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যাংকার, উদ্যোক্তাসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নারীদের পদচারণা রয়েছে।[৩৪] বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের নারীর শিক্ষার বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পূর্বের চেয়ে বেশি। তাছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন, স্থানীয় নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন সময়ে নানান নির্বাচনে নারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।[৩৫]

১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পায়রাবন্দে এক মুসলিম জমিদারবাড়িতে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জমিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের চৌধুরী এবং মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা। তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন রোকেয়ার। বড় বোন করিমুন্নেসা, বড় ভাই ইব্রাহীম সাবের ও স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি শিখতে সহযোগিতা করেছেন। রংপুরের এই সাবের পরিবারে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। তবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা প্রচলন ছিল না। তিনি সমাজের নানা অসঙ্গতি ও নানান অনিয়ম লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি সমাজের নানান প্রসঙ্গে নিয়মিত লিখে গেছেন নবপ্রভা, মোহাম্মদী, মহিলা, নবনূর, মাহে নও, ভারত মহিলা, নওরোজ ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- মতিচুর প্রথম খণ্ড (১৯০৪), সুলতানার স্বপ্ন মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান লেডিস ম্যাগাজিনে প্রকাশ (১৯০৫), সুলতানার স্বপ্ন (ইংরেজিতে লেখা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ ১৯০৮), মতিচুর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯৩১)। মিসেস আর.এস হোসেন নামে সাহিত্যে লেখা -লেখি করতেন। মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মারা যান। কলকাতার সোদপুরে শায়িত আছেন বেগম রোকেয়া। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে বাঙালি নারী জাগরণে, নারী মুক্তি আন্দোলনে, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও সংগ্রামের জন্য বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালির ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. হক, মফিদুল (২০০৭), নারীমুক্তির পথিকৃৎ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১১।

২. হক, মফিদুল, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১।

৩. ডিনা, সালোয়া সরিফা (২০২২), 'রোকেয়ার প্রগতি ভাবনা ও আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম', রোকেয়া- পাঠ, রোকেয়া দিবস, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, পৃ. ৫১, ৫৬।

৪. ইসলাম, সাইফুল মুহাম্মদ, (২০২১), শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ : বেগম রোকেয়া, (সম্পাদক), কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৪।

৫. ইসলাম, সাইফুল মুহাম্মদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬, ৩৭।

৬. হাসান, শফিউল মোরশেদ (১৯৮২), বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১০।

৭. হাসান, শফিউল মোরশেদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১।

৮. বেগম, মালেকা (২০১০), বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,

ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ৩৫।
৯. বেগম, মালেকা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৭।
১০. বেগম, মালেকা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮।
১১. ভিক্ষু, জিনবোধি, 'বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', The Chittagong University Journal of Arts and Humanities, Vol.34, 2018, published in October, 2023, p. (17-36).
১২. হাসান, শফিউল মোরশেদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১।
১৩. সুফী, হোসেন মোতাহার (২০১৪), নারীবাদ ও বেগম রোকেয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩২।
১৪. কাদির, আবদুল (১৯৭৩), রোকেয়া -রচনাবলী, (সম্পাদিত), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রণীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ০৯।
১৫. হাসান, শফিউল মোরশেদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪। দেখুন, সুফী, হোসেন মোতাহার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩।
১৬. সুফী, হোসেন মোতাহার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩।
১৭. সুফী, হোসেন মোতাহার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩।
১৮. মনি হায়দার (২০০৯), বেগম রোকেয়া, কথা প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪, (১ম প্রকাশ), পৃ. ৩১।
১৯. হায়দার, মনি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪।
২০. মান্নান, মো: আবদুল ও মেরী খানম, সামসুন্নাহার (২০০৬), নারী ও রাজনীতি, অবসর, ঢাকা, পৃ. ২৭১।
২১. কাদির, আবদুল, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬১।
২২. পত্রনবীশ, শান্তা (২০২১), 'বিশ শতকে বাংলার নারী জাগরণ : বেগম পত্রিকা ও বেগম ক্লাবের ভূমিকা ', ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৩৯-৪০, ২০১৬-২০, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, পৃ. ৪১৮।
২৩. মান্নান, মো: আবদুল ও মেরী খানম, সামসুন্নাহার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৭২।
২৪. কাদির, আবদুল, সম্পাদিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫০৪।
২৫. খান, শাওয়াল (২০০৯), শিক্ষাজগৎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২১১, ২১২।
২৬. আখতার, নাসিমা (২০১৮), 'রোকেয়ার রাজনৈতিক চিন্তা ও বর্তমান নারীদের রাজনীতি চর্চা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', ইতিহাস, বায়ান্ন বর্ষ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ৬৫।
২৭. খাতুন, তনুজা (২০২২), 'ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারী ', পূর্বভারত (মানুষ ও সংস্কৃতি), বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪, ইস্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি ফর দ্যা স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, আলীপুরদুয়ার, ডিসেম্বর, পৃ. ৪৩।
২৮. ইসহাক, মুহাম্মদ (২০২১), নারী জাগরণ ও শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা', উন্নয়ন বিতর্ক, চল্লিশতম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ৮১।
২৯. ভিক্ষু, জিনবোধি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪। দেখুন, হোসেন সুফী, মোতাহার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭১।

৩০. ইসহাক, মুহাম্মদ (২০১৯),'নারীর ভোটাধিকার ও রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা', সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ১৫০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ৩৩।
৩১. কাদির, আবদুল সম্পাদিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯৩-৫৯৪।
৩২. প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২২), 'রামমোহন হতে রোকেয়া - যুক্তিধারার উৎস সন্ধানে ', রোকেয়া -পাঠ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪১।
৩৩. সিনহা, পিয়া (২০২৩),'নারীর ক্ষমতায়ন : সেকাল ও একাল', মন্ডল, পরিমল ও মাহাতি, রঞ্জন (সম্পাদনা), সাহিত্য, সমাজও সংস্কৃতি, কগনিশন পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃ. ২৩।
৩৪. ইসহাক, মুহাম্মদ, নারী জাগরণ ও শিক্ষা', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৪।
৩৫. ইসহাক, মুহাম্মদ, 'নারীর ভোটাধিকার ও রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৩।

পূর্ব ভারত

রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধ: রংপুর

মল্লিকা রায়
এম.ফিল (অধ্যয়নরত)ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

সারসংক্ষেপ :

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। রংপুর ছিল ৬ নং সেক্টরের অধিনে। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার। সমগ্র দেশের ন্যায় রংপুর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অপরিহার্য অবদান রেখেছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগ হতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষ আপ্রাণ সংগ্রাম ও যুদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মার্চের শুরু থেকেই উত্তাল হয় রংপুর শহর। ৩মার্চ রংপুরে অবাঙ্গালীর গুলিতে প্রথম শহীদ হন মাত্র বারো বছরের বালক শংকু সমঝদার। ফলে শহরের পরিস্থিতি আরো জটিল হতে শুরু করে। ২৮ মার্চ রংপুর ও আশেপাশের সাধারণ জনতা দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে অসীম সাহসের পরিচয় দেন। মূলত, এই দিন থেকে শুরু হয় রংপুরে মুক্তযুদ্ধ। মার্চ মাস হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর দফায় দফায় যুদ্ধ হয়। বিক্ষিপ্ত এই যুদ্ধগুলোতে অগণিত মানুষ শহীদ হয়েছেন। তাছাড়া রংপুরে শত শত মেয়ে ও নারীকে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ও রংপুর টাউনহলে ধরে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয় এবং তাদের ধর্ষণ ও নানা পাশবিক অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। ধর্ষণ ও নির্যাতনের ফলে অনেক নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। ধর্ষণ, কান্না, রক্ত, নির্যাতন, চিৎকার ও হাহাকারে ছেয়ে পড়েছিল গোটা রংপুর শহর। তবে পুরুষদের পাশাপাশি কতিপয় নারীও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা উদ্যম, অসীম সাহসিকতার সাথে জীবন-মান-ইজ্জত বাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছিল। এসময় এই অঞ্চলের অনেক মানুষ জীবন বাঁচাতে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নভেম্বরের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নেয়। ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে যৌথবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ চালায়। যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পাক-হানাদার বাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়ে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশংকায় এবং প্রাণনাশের ভয়ে আত্মসমর্পনের ঘোষণা দেয়। অতঃপর ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু রংপুর অঞ্চল সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর। দীর্ঘ সংগ্রাম ও যুদ্ধের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

শব্দ সূচক: রংপুর, মুক্তিযুদ্ধ, নারী মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট।

রংপুর বাংলাদেশের উত্তর সীমানায় অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকেই রংপুর প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ, কামরাজ্য ও মন্থনাকোট- এর ধারাবাহিকতায় রংপুর এসেছে।[১] একথা সত্য যে, জগতের সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বহু আয়াসলব্ধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রমাণ যোজনা করে এদের ইতিহাস লিখিত হয়েছে।[২] কালের পরিক্রমায় বাঙ্গালি সত্তার নিজস্বতা, অধিকার, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাদেশিক চেতনা, ভৌগোলিক অবস্থানে থেকে স্বকীয় সত্তার অধিকার বোধ, তারপর স্বরাজ কায়েমের বিরুদ্ধে ভিনদেশীয় রাজা জমিদারদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনরোষ। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ, ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন সময়কাল পর্বে গোষ্ঠী ভিত্তিক, এলাকা-ভিত্তিক, ইস্যুভিত্তিক নানা প্রতিরোধ-যুদ্ধ, আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে এদেশের কৃষক, শ্রমিক,-মজুরসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ।[৩] আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন ন'মাসে সীমাবদ্ধ ছিল না, তেমনি তা সীমাবদ্ধ ছিল না ২৪ বছরে। মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের ব্যাপার, কিন্তু মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘদিনের।[৪] ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে আসলেও পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করার মাধ্যমে তাদের শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫] শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দু'শো বছর শাসন করেন তারা। দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অতঃপর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক কুটকৌশলের ফাঁদে পূর্ব বাংলার আপামর জনতা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়। ফলে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান নাম দেয়া হয়। যদিও এই দুই অঞ্চল ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথক ছিল প্রায় এক হাজার মাইলের অধিক। তাছাড়া ভাষা,সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, অর্থনীতি প্রভৃতি দিক থেকে দুই অঞ্চল পরস্পর থেকে আলাদা ছিল। কেননা মানুষের সামগ্রীক কার্যকলাপ তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।[৬] ভারত থেকে বিযুক্ত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও সে ধর্ম যে স্বার্থবাদী অভিজাত্যের ব্যবহার ধর্ম তা বুঝতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের।[৭] ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে ছয় দফা(১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান(১৯৬৯), সাধারণ নির্বাচন (১৯৭০) এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা হলেও রংপুরে রাজনৈতিক নেতা, সকল পেশার মানুষ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

অজানাকে জানার, অনুসন্ধান করার অন্যতম উপায় হলো গবেষণা। রংপুরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে গবেষণাটি করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুরে ঘটে যাওয়া বিমর্ষ ঘটনাগুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া এ অঞ্চলের নারী

মুক্তিযোদ্ধা ও নারী বীরাঙ্গনাদের লোমহর্ষক বিবরণ, যা বেদনাদায়ক। যদিও অনেক বীরাঙ্গনা সমাজের ভয়ে এখনো নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। তাদের খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রংপুরের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য সাহস দেখিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরার দায়িত্ববোধ থেকে গবেষণাটি করা। তাই বলতে পারি, অনুসন্ধিৎসু মনে নিজে জানা এবং অপরকে জানানোর জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা :

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক আলোচনা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর নির্বিচারে গণহত্যার যে রক্তখেকো ভয়ানক ঘটনার সূচনা করেছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দীর্ঘ ৯ মাস অর্থাৎ ২৭৬ দিন পর তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে এ কথা সত্য যে, হঠাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, দীর্ঘ ইতিহাস।

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ বলা হয় এবং একশত বছরের বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম হয়।[৮] ভারত বিভক্ত হওয়ায় সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছিল বঙ্গদেশ এবং পাঞ্জাবের লোকেরা।[৯] পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন ঢাকা টিকাটুলিতে কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক ভাষণে বলেন, " উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা "। সাথে সাথে ছাত্র সমাজ না না বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল ভাষার জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রাম গোটা দেশ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে রংপুরেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলরত অবস্থায় সালাম,রফিক,জব্বার পুলিশের গুলিতে নিহত হলে সন্ধ্যার দিকে এই খবর রংপুরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত রংপুরের জনতা বিরাট মিছিল বের করে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করে। রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে ১৯৫৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রংপুরে প্রথম নির্মিত হয় শহীদ মিনার। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীরা এই শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রংপুরের নেতৃবৃন্দগণ ব্যাপক অবদান রাখে। নির্বাচনের পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগণ কূটকৌশলে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। ফলে বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে "সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে" ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবি গুলো হলো :

প্রথম দফা: শাসনতন্ত্রের কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পূর্বক পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গুলো হবে সার্বভৌম।

দ্বিতীয় দফা : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : যুক্তরাষ্ট্র (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয় অঙ্গরাজ্য সমূহের হাতে থাকবে।

তৃতীয় দফা: মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থা : এ দফায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় -

ক. দেশের দু'অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রার লেনদেন হিসাব রাখার জন্য দু'অঞ্চলে দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।

খ. দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চল থেকে মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। এ ব্যবস্থায় পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চতুর্থ দফা : রাজস্ব, কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা : সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। শাসনতন্ত্রে এ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বিধান থাকবে।

পঞ্চম দফা : বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য : বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা মেটাবে।

ষষ্ঠ দফা : প্রতিরক্ষা: আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশ গুলোকে নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হবে।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উল্লেখিত ৬ দফা কর্মসূচি অনুমোদন দেয়া হয়। এই ছয় দফা দাবিকে বলা হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ছয় দফা প্রণীত হলে, কেবল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নয় বরং পশ্চিমা রাজনীতিকরা পর্যন্ত সে সময় ৬ দফার বিরুদ্ধে কট্টর লগ্ন এবং অশালীন সমালোচনা শুরু করেন।[১০] এদিকে, ছয় দফাকে রংপুরবাসী স্বাগত জানায়। ছয় দফার পরে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ছাত্রদের ১১ দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, প্রত্যেক কর্মসূচিতে রংপুরে নেতৃবৃন্দ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি ভোট পেয়েছিল আওয়ামী লীগ।[১১] মূলত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ঘোষণা থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণে তার বজ্র কঠিন, দূরদর্শী এবং জাতির স্বার্থে নিবেদিত একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। [১২]

"জয় বাংলা" শব্দটি প্রথমে ধ্বনিত হয় ১৯৬৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ৪ই এপ্রিল তারা ঊনসত্তর জয়ী বঙ্গবন্ধুকে এক প্রাণঢালা সংবর্ধনার আয়োজন করেন। ছাত্র-যুবকেরা উল্লাস ধ্বনিতে তালমাতাল শ্লোগান দিচ্ছিলেন "জয় বাংলা"। এই অপূর্ব জয়ধ্বনি ও শক্তি মন্ত্র দেশের মাটির গন্ধ নিয়ে আকাশে-বাতাসে এক অপূর্ব শিহরন জাগিয়ে তোলে। বঙ্গবন্ধু নিজে তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলানের "জয় বাংলা"।[১৩]

১৯৭১ সাল। রংপুর শহরের প্রত্যেকটা দিন ছিল অত্যন্ত বিভীষিকাময়। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে দেশের পরিচিতি ক্রমশ উত্তাল এবং জঙ্গি হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল একাত্তরের ৭ মার্চ থেকেই। ঐদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম বলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।[১৪]

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু ভুট্টোর বিরোধিতায় ১লা মার্চ দুপুরে ০১:০৫ মিনিটে এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তাছাড়া রেডিওতে সরকারি ঘোষণা দেয়া হয় যে, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২-৭ মার্চ পর্যন্ত ৬ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচি অনুসারে রংপুরের রাজপথে নেমে আসে ছাত্র-জনতা। পুরো শহর জুড়ে মিছিলের ডামাডোল শুরু হয়। ফলে বাঙালি ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘর্ষের একটা আশঙ্কা থেকে যায়। তাই রংপুরের সৈয়দপুরে বাঙালি ও অ-বাঙালি বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা রোধকল্পে প্রধান সড়ক ও মোড়ে ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সৈয়দপুর সেনানিবাসের অপর একটি অবাঙালি ইউনিট ২৬ এফ এফ রেজিমেন্টকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে সময় সৈয়দপুর সেনানিবাসে ৩ ইস্টবেঙ্গল, ২৬ এফ এফ রেজিমেন্ট এবং ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অবস্থান করছিল। এই ইউনিটগুলো আবার রংপুস্থ ২৩ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনে ছিল। এছাড়াও এই ব্রিগেডের অধিনে ছিল ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানি, বিগ্রেড ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি। এর ওপর আরেকটি ইউনিট ২৯ ক্যাভালরি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ২৩ পদাতিক ব্রিগেডের সাথে রংপুরে সংযুক্ত থাকলেও এটি ছিল ১৪ পদাতিক ডিভিশনের সংগঠনের ইউনিট এবং এবং ১০ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ছিল রংপুরে। এই দিনে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এই চার নেতা মিলে এক বৈঠকে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করেন। ২ মার্চ এই ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করেন ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতা আ.স.ম.আব্দুর রব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২মার্চ থেকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এদিন রাতে রংপুরের নেতাবৃন্দ যেমন-রফিকুল ইসলাম গোলাপ, জাকির আহমেদ সাবু,হারেস উদ্দিন সরকার, মুখতার(এলাহী শহীদ), আবুল মনসুর আহমদ, জায়েদুল আলম, ইলিয়াস আহমেদ লুলু, অলক সরকার, আব্দুল মালেকসহ অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে রংপুর কলেজের ছাত্রাবাস সেন্ট্রাল রোডের পাঙ্গা হাউজের ছাদে

রংপুরের ছাত্রনেতারা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রউফের সাথে বৈঠক করেন।

৩ মার্চ ছাত্রলীগের পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। সমাবেশে ছাত্রলীগ ৫ দফা ভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে। এদিন বিভিন্ন স্থানে মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। সারা দেশের ন্যায় রংপুরেও এদিন হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে রংপুরে ছাত্র জনতা মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলটি স্টেশন রোড ঘোড়াপীর মাজার এলাকায় পৌঁছালে অবাঙালি ব্যবসায়ী সরফরাজ খানের বাসা থেকে মিছিলে গুলি চালানো হয়। গুলিতে মারা যান সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র গুপ্ত পাড়ার কিশোর শঙ্কু সমঝদার। তিনি মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের প্রথম শহীদ। ফলে রংপুরে জনসাধারণ বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অবাঙ্গালীদের দোকানপাট ভাঙতে শুরু করে। দিনে আবুল কালাম আজাদ, ওমর আলী নামে দুজন নিহত হন। হত্যার প্রতিবাদস্বরুপ রংপুর প্রেসক্লাবের ছাদে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা শেখ শাহী। ফলে দুপুর ২.০০ টার দিকে রংপুর শহরে কারফিউ জারি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ৩ মার্চ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় রংপুরে। তাই ৪ মার্চ কারমাইকেল কলেজের ল্যাবরেটরির তালা ভেঙে বোমা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করেন ছাত্ররা। পল্টনের জনসভায় ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং জনসাধারণ সুষ্ঠু ভাবে হরতাল পালন করেন । কিন্তু রংপুরে, জনতার উপর গুলিবর্ষণ এর প্রতিবাদস্বরূপ মিছিল চলতে থাকে।

৭ই মার্চ ভোর থেকে দেশের অগণিত মুক্তিকামী সকল পেশার মানুষ রেসকোর্স ময়দানে ভিড় জমাতে শুরু করে। লাখ লাখ মানুষের চোখে তখন মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার স্বপ্ন। রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণটি হল :

" আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। আজ ঢাকা,চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়।..... ভাইয়েরা, আমার প্রতি বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা, মানুষের অধিকার চাই।..... হাতে যা আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম,মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, "জয় বাংলা"।

এদিকে ৭ মার্চের সকাল থেকে রংপুরের সাধারণ জনতা রেডিও নিয়ে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষায় বসে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শোনার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, ঐতিহাসিক ভাষণটি রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়নি সেদিন। পরের দিন ৮ই মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় রেডিওতে রেসকোর্স ময়দানে রিকর্ডকৃত ভাষণটি সম্প্রচার করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি এতটাই অগ্নিমূর্তি ছিল যে নিমিষে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠে রংপুরের জনসাধারণ। বাংলাদেশের কবে

নির্মলেন্দু গুণ শেখ মুজিবুরের ৭ মার্চের ভাষণকে বলেছেন একটি মহাকাব্য। আর সেই মহাকাব্যের মহাকবি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। [১৫]

১৭ই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর ৫১তম জন্মবার্ষিকী। জন্মদিনে এ মহান নেতা শপথ নেন যে জনগণের সার্বিক মুক্তি তার একমাত্র চাওয়া। এ সময় রংপুর তথা সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। সরকার ২৩ মার্চ "পাকিস্তান দিবস" পালন করেন। দিনটিকে ঘিরে তৎকালীন শাসক ইয়াহিয়া খদন জাতির উদ্দেশ্যে রেডিওতে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও বাঙ্গালীদের আন্দোলনের মুখে অজ্ঞাত কারনে তা স্থগিত হয়ে যায়। এদিকে বঙ্গবন্ধু এই দিনটিকে "প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে সারা দেশে "প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে দিনটি পালিত হয়।

রংপুরের মানুষ সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে ২৪ মার্চ। [১৬] এই দিনে নিসবেতগঞ্জের হাটে সেনাবাহিনীর তিন সেনা সদস্যের উপরে যুবক শাহেদ আলী ও কয়েকজন যুবক দা, কুড়াল,বল্লম দিয়ে আঘাত হানে এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়। ফলে বিকেল চারটার দিকে পাকহানাদার বাহিনী গনেশপুর এলাকাকে ঘটনাস্থল ভেবে পুরো এলাকা জ্বালিয়ে দেয়। শুরু হয় রংপুরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

১৬ই মার্চ থেকে কালক্ষেপনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সাথে লোক দেখানো সমঝোতা বৈঠক শুরু করে পাকিস্তান সরকার। অন্যদিকে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলতে থাকে। হঠাৎ ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আলোচনা স্থগিত করে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন এবং গণহত্যার আদেশ দেন। অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর রাও ফরমান আলী এবং ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্ব দেয়া হয় খাদিম হোসেন রেজাকে। মূল পরিকল্পনা মোতাবেক রাত ০১.০০ টা থেকে অপারেশন শুরু করার কথা থাকলেও পথে বিলম্ব হওয়ার কথা ভেবে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীরা ১১.৩০ মিনিটের দিকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তৎকালীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[১৭] তাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক হত্যা। রমনার কালিবাড়ি রক্তের স্রোতে লাল হয়ে ওঠে। [১৮]

এদিন রংপুর শহরে কারফিউ জারি করা হয়। ঢাকা থেকে চারজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা হেলিকপ্টার যোগে রংপুরে আসেন এবং মাত্র ১৫ মিনিট আলোচনা করে আবার হেলিকপ্টারে ঢাকা চলে যান। এ সময় কর্তৃপক্ষ রংপুরে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমতি দেন। ফলে গভীর রাতে গোটা শহর, গুলির শহরে পরিণত হয়। এ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি : This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with what ever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. [১৯]
রেকর্ডকৃত বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণাটি তৎক্ষণাৎ ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম

পাঠিয়ে দেন। পরের দিন বিবিসির প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। [২০] পরে আব্দুল হান্নান মিয়া ও জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি প্রচার করেন। পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আছে- বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।[২১] ঘোষণাটি রংপুরের বাতাসে স্বপ্ন সুরে মিশে যায় জনসাধারণ হৃদয়ে। প্রকৃতপক্ষে ২৫ মার্চ এর পর থেকে সারাদেশে যুদ্ধের ডামাডোল বাজে।

২৮ই মার্চ রংপুরের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে রংপুর শহর ও আশেপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে আসতে শুরু করে। তাদের হাতে বড় কোনো অস্ত্র ছিল না। দেশীয় অস্ত্র যেমন লাঠি, দা, ছুরি, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে "এসো ভাই, অস্ত্র ধরো, ক্যান্টনমেন্ট দখল কর", স্লোগান দিতে দিতে ক্যান্টনমেন্টের দিকে আসতে থাকে। রংপুরে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হলো সাঁওতাল, ওরাঁও, মালো, তুরি, কোচ, কোলহে, পাহাড়িয়া,মাহাতো, মুষহর,মাহলে, রাজবংশী প্রভৃতি।[২২] এদের মধ্যে বিশেষ করে ওরাঁও, সাঁওতাল, রাজবংশীরা তীর, ধনুক নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করতে আসে। বালারখাইল পার হয়ে ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটের কাছে পৌঁছাতেই হানাদার বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের ভেতর হতে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকেন। এতে শত শত মানুষ গুলিবিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলে অনেকে মারা যায়। প্রায় পাঁচশত-এর বেশি লাশ ঘাঘট নদীর পাড়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় পাক হানাদার বাহিনীরা। এই হত্যাকাণ্ডের খবর রংপুরের গ্রাম গ্রামান্তরে এবং সারাদেশে পৌঁছে যায়। এই দিনের পর থেকে পাক হানাদার বাহিনীরা বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষকে মারতে শুরু করে। ২৮ই মার্চের শহীদদের স্মরণে নিসবেতগঞ্জ স্মৃতিসৌধ রক্ত গৌরব নির্মাণ করা হয়েছে। [২৩]

ক্যান্টনমেন্ট হত্যাকান্ডের পর জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতে পাড়ি জামাতে শুরু করে। রংপুর সদরের বাসিন্দা বিনয় কুমার রায় বলেন, ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও এবং হত্যাকাণ্ডের পর রাস্তাঘাটে মানুষকে পাখির মতো গুলি করতে থাকে পাক হানাদার বাহিনীরা। তখন রংপুরে থাকা আর নিরাপদ মনে হয়নি। তাই পরিবারসহ তুষ ভান্ডারের ভেতর দিয়ে সিতাই বর্ডার পার হয়ে ভারতের ময়নাগুড়ি নামক স্থানে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছাই। পরে ক্যাম্পে আশ্রয় নেই।[২৪] ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল, নব্য প্রতিষ্ঠিত রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলামকে সৈয়দপুরে হত্যা করা হয়। ৩ই এপ্রিল রংপুর শহরের দক্ষিণগঞ্জ শ্মশানে রংপুরের সুবিখ্যাত রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট শহীদ ইয়াকুব মাহফুজ আলী জররেজ সহ ১১ জন বাঙালিকে হাত ও চোখ বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়। এভাবে দিনের পর দিন পাক হানাদার বাহিনীরা বাঙালি হত্যায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

মুজিবনগর সরকার :

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি)
উপ রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সর্বনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এ এইচ এম কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী	খন্দকার মোস্তাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (অব.)এম.এ.বি.ওসমানী, এম. এন.এ.
চিফ অফ স্টাফ	কর্নেল (অব.) আব্দুর রব
ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং বিমান বাহিনী প্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার

রংপুরবাসী মুজিবনগর সরকারকে স্বাগত জানায় এবং এই সরকারের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবে এই আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল, এদিনেই ঝাড়ুয়ার বিল পদ্মপুকুর মাদারগঞ্জে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায় পাক হানাদার বাহিনীরা। উল্লেখ্য, এ দিনই মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে। তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনকে বিভক্ত করেন ১১ টি সেক্টরে। প্রতি সেক্টরের ভার অর্পণ করা হয় একজন সেক্টর কমান্ডারের উপর। [২৫] পুরো রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে ৬ নং সেক্টর গঠিত হয়। এটি পাঁচটি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল। সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ শত এবং গেরিলা ছিল ৬০০০। উইং কমান্ডার এম কে বাশারকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। [২৬] এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকট বুড়িমারীতে।[২৭] মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পরোক্ষ সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায় এবং তারা প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। [২৮] মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ।[২৯] রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ দল সমর্থনকারী নেতারা হলো সিদ্দিক হোসেন এমসিএ, শেখ আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট আব্দুল গনি, মীর আনিসুল হক পেয়ারা প্রভৃতি। ছাত্রদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম গোলাপ(ছাত্রলীগের সভাপতি), মমতাজ জাকির আহমেদ সাবু (সাধারণ সম্পাদক), হারেস উদ্দিন, অলোক সরকার, ইলিয়াস আহমেদ আবুল, মনসুর আহমেদ, মাহবুবুল বারী, মুখতার ইলাহী প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রদের অবস্থা ছিল খুব করুন। শিক্ষা ক্রমহ্রাসমান হারে ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। স্কুল-কলেজের বেতন প্রদান করা অধিকাংশ পিতা-মাতার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। [৩০] সেসময় প্রায় স্কুল কলেজ গুলো বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-নারী সংগঠকেরা নানাভাবে সুসংগঠিত হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধে সব সংগঠিত এইসব

দলের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের বাঁচিয়ে রাখা, তাদের ট্রেনিং দেয়া, কাজের সাথে যুক্ত করা, মুক্তিযুদ্ধের জন্য লোকজন রিগ্রেট করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহিলা ও নারী কর্মীদের এক বিশাল দলকে ভারতে সংঘটিত করা হয়।[৩১] রংপুরে নারী মুক্তিযোদ্ধা আকলিমা খন্দকার ভারতের চ্যাংড়াবান্ধায় একমাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সাথে আরো চারজন সহযোদ্ধা নারী পারভীন সুলতানা, মাহমুদা ইয়াসমিন, রশিদা বেগম ও শারমিন আক্তার গিনি) একই সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।[৩২] প্রশিক্ষণকালে তাদের রাইফেল স্টেনগান, এল.এম.জি, গ্রেনেড এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আরেক নারী মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ পারভীন বলেন নার্স হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা ওষুধ খাওয়ানো তার কাজ ছিল।[৩৩] বৃহত্তর রংপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের অধিবাসী ছিলেন নারী সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি (বীর প্রতীক)। তারামনের বাড়ির পাশেই ছিল রাজিবপুর মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। এখানেই তার বাপ, ভাই, স্বামীর পরিচিত পরিবেশে তারামনের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ হয়। [৩৪] জীবনের প্রথম যুদ্ধ তিনি শুরু করেন ১১ নং সেক্টরে। [৩৫] রংপুর শহরে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্টকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী আর্মিরা এই জেলাতে ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়। [৩৬] রংপুরে অবাঙালি বিহারীরা পাকিস্তান হানাদারদের বাঙালি নিধনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। রংপুরের রেলওয়ে স্টেশন শহরগুলোতে তাদের বসবাস ছিল। বিহারী অধ্যুষিত সাবেক রংপুর জেলা এবং একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পাকিস্তানি সেনা হেডকোয়ার্টার্স রংপুর হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে রংপুরে হচ্ছে এমন একটি শহর যা মুক্তিযুদ্ধে সুদীর্ঘ ৯ মাসের এক দিনও মুক্তি বাহিনীর পরিপূর্ণ দখলে আসেনি। [৩৭]

৮ই জুন ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল রংপুরে প্রবেশ করে। ফলে রংপুরে মুক্তিবাহিনীদের মনোবল দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই দিনেই রংপুর রেডিও স্টেশনের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ করে বিক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা। এই মাসে মুক্তিবাহিনী ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। রংপুরের অন্তর্গত সাহেবগঞ্জের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, সেক্টর কমান্ডার বাশার বাহিনীকে সুসংগঠিত করে একটি কার্যকর সুদক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলেন। দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা যেমন- দক্ষিগঞ্জ শ্মশান গণহত্যা, উত্তর রামনাথপুর ধাপপাড়া গণহত্যা, ঝারুয়ার বিল ও পদ্মপুকুর গণহত্যা, দমদমা ব্রিজ গণহত্যা, বানিয়াপাড়া গণহত্যা, সাহেবগঞ্জ গণহত্যা, লাহিড়ীরহাটে হত্যা করেন শত শত সাধারন মানুষকে। শঠি বাড়ির যুদ্ধে এবং ২১ নভেম্বর মির্জাপুর ১৬ নং ইউনিয়নের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের পরিচয় দেয়। মাত্র সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকার কতিপয় সাহসী যুবক একসাথে সকাল ১১টায় অতর্কিতভাবে সম্মুখ অবস্থানে আক্রমণ করেন। ঘটনা স্থলে চার/ পাঁচজন নিহত হন। [৩৮] তাদের মধ্যে কিছু হানাদার বাহিনী ধরা পড়ে পরাজয় বরণ করেন এবং বাকি হানাদাররা পালিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী যেমন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, মুক্তিফৌজ, অনিমিত বাহিনীতে যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, কৃষকসহ সকল পেশার মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এছাড়াও মুজিব বাহিনী এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী যুদ্ধে অবদান রাখে।

৭ই নভেম্বরের দিকে, ৬ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ভুরুঙ্গামারী দখল করে। [৩৯] মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের চিহ্নিত করে ধরে ধরে মারা হতো। একটি গোষ্ঠী হিসেবে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করা ছিল সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য।[৪০] এ সময় রংপুর অঞ্চলের গংগাচড়া, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, পীরগাছা এবং সদর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করতে থাকে। রংপুর জেলার প্রায় প্রতিটি থানায় মুজিব বাহিনী তৎপর ছিল। রংপুরে মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন মুকুল মুস্তাফিজুর রহমান।

বাঙ্গালীদের অধিকার আদায়ের এই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার, চক্রান্ত, কূটনৈতিক তৎপরতা সত্ত্বেও নভেম্বর মাসের শেষের দিকে হিয়াহিয়া খান বুঝতে পারলেন যে কোন অবস্থাতেই বাঙালিদের দমন করে রাখা যাবে না। তখন তিনি যুদ্ধ বিরতির কৌশল হিসেবে, এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক করণের উদ্যোগ নেন।[৪১] যুদ্ধবিরতি করতে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ইচ্ছা পোষণ স্বরূপ ভারত আক্রমণ করেন। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের সেনাবাহিনী মিলে গঠন করা হয় যৌথ বাহিনী। ৪ই ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। । চার ও পাঁচ ডিসেম্বরের দিকে মিত্রবাহিনীর হামলায় পাক হানাদার বাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়েন এবং ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যম বেড়ে যায়। ১২ই ডিসেম্বর -এর মধ্যে সৈয়দপুর ও রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত রংপুরে সকল ইউনিট মিত্রবাহিনীর দখলে চলে আসে। ১৩ই ডিসেম্বর মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সহযোগিতায় গংগাচড়া থানায় ২১২ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। রাজাকারদের কাছ থেকে তিনটি এল.এম.জি সহ ২০৯ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।[৪২] পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তান হানাদার৷ বাহিনী ১৪ই ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বরও রংপুরের যুদ্ধ চলে। ইতোমধ্যে এই দিন বিকেল তিনটায় পাকবাহিনীর পক্ষ থেকে ৩৪ বিগ্রেডের অধিনায়ক ব্রিগ্রেডিয়ার নাইমের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসে। ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রংপুর সেনানিবাসের রংপুরে ভারতীয় ৬৬ পার্বত্য বিগ্রেডের বিগ্রেডিয়ার শর্মার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তার নির্দেশে বিভিন্ন অংশের তার বিগ্রেডের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।[৪৩] ১৭ই ডিসেম্বর রংপুর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়। বিজয়ের পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই ডিসেম্বর রংপুর টাউন হল থেকে শতাধিক বিবস্ত্র নারী ও ১৬৭ টি মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়। রংপুরে তারা শত শত নারীকে ধর্ষণ করে।[৪৪] কুমিল্লা,খুলনা, যশোর ও রংপুর জেলায় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।[৪৫] ধর্ষণ ও জঘন্যতম কাজে পাকিস্তানীদের শান্তি কমিটির সদস্যরা সাহায্য করে। রংপুরের নারী বীরাঙ্গনা মনসুরা বেগমকে পাক হানাদার বাহিনীরা রংপুর টাউনহলে ধরে নিয়ে যায়। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এ অবস্থায় তাকে হিংস্র পশুরা গণধর্ষণ করে এবং প্রচন্ড নির্যাতন করে। ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। পাক হানাদারদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার কারনে স্বামী তাকে মেনে নেননি।[৪৬] মনসুরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সমাজের ছুড়ে দেওয়া কলংক মাথায় নিয়ে কঠিন ভাবে পার করছেন জীবনের দিনগুলি।

১৯৭১ সালের শ্রাবন মাসে খান সেনারা রুপালী রানী সিংহকে রেলওয়ের গুমটি

ঘরে ধরে নিয়ে যায়। সে সময় তিনি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। কন্যার বয়স মাত্র ২১ দিন। রেলওয়ের গুমটি ঘরে রুপালী রানী সিংহকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, পাক হানাদাররা তাকে মৃত্যু মনে করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলেন।[৪৭] মনসুরা বেগম এবং রুপালী রানী সিংহ দুজনেই বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্মান প্রাপ্ত এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন। এছাড়াও মোছা: আয়শা বেগম এবং আনোয়ারা বেগম রংপুরের বীরাঙ্গনা নারী। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় গনধর্ষনের শিকার রংপুরের সুইটি আক্তার পুতুল মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তিনি এখনো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গেজেটপ্রাপ্ত হননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছর পার হলেও সরকার কর্তৃক তাকে প্রাপ্ত সম্মান না দেওয়ায়, তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেন, ভারত ও রাশিয়ার অবদান ভুলবার নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লন্ডনে অর্থ সংগ্রহের অভিযান চলে।[৪৮] এজন্য বাঙালি জাতি আজীবন বৃটেনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।[৪৯]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের শরণার্থীর থাকা খাওয়াসহ সব রকম ব্যবস্থা করেন। প্রায় এক কোটি শরণার্থী চিকিৎসা,আশ্রয়, সাহায্য-সহযোগিতার কাজটি করেছেন মিসেস ইন্দিরা। [৫০]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘ ন'মাস এ বেতার কেন্দ্র ওজস্বিনী ভাষা ও দীপ্ত কণ্ঠে অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলার আপামর জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।[৫১] ইথারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচন্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"। [৫২] তাছাড়া যুদ্ধকালীন, নারীদের ভূমিকার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম। এর সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম মুশতারি শফি, গান গেয়ে, কবিতা পড়ে, নাটক করে তারা মানুষের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছেন। এদের মধ্যে কল্যাণী ঘোষ, ফেরদৌসী রহমান, মনিরা জামান, লায়লা জামান, স্বপ্না রায়, শাহিনা আক্তার, সানজিদা খাতুন, আলিয়া নওশীন, মাহমুদ সহ অনেকে নাম পাওয়া যায়। [৫৩] স্বাধীনতার সময় শত শত প্রবাসী বাঙালি বিশ্ব সমর্থন আর অর্থ যুগিয়ে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছেন, অগণিত বিদেশী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।[৫৪] অনেক দেশি ও বিদেশী সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের বর্বরতার খবর বিশ্বমননে তুলে ধরেছেন। ২৫ শে মার্চের ভয়াল রাতের ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর আকস্মিক হামলা ও সর্বাত্বক গণহত্যা এবং এরপর সারা দেশে পরিচালিত খুন ও জ্বালাও পোড়াও অভিযান এর সংবাদ বহির্বিশ্বে যাতে প্রকাশ পেতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশ থেকে ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক বহিষ্কার করে। তথাপি গণহত্যার ঘটনা চেপে রাখা যায়নি। [৫৫] দমিয়ে রাখা যায়নি বাঙ্গালীদের। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, স্বাধীন বাংলার আপামর জনতা।

আমরা বাঙালিরা ইতিহাস বিমুখ জাতি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একবার দুঃখ করে

বলেছিলেন বাঙালির ইতিহাস না লিখলে বাঙালি মানুষ হবে না।[৫৬] প্রতিটি জাতির কিছু দিন থাকে যাকে বলা হয় "রেড লেটার ডে", অর্থাৎ লাল বা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দিন। ২১ই ফেব্রুয়ারি শহীদ বা ভাষা দিবস, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬ই মার্চ জাতীয় স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, এ দিনগুলো বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য "রেড লেটার ডে", বা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দিন। [৫৭]

বাঙালি জাতি বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুর ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনে ছিল। রংপুরে সকল পেশার মানুষ, নারী, কিশোর ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে শহীদ হয়েছে অগণিত মানুষ। নাবালক বালিকা, নারী, গর্ভবতী নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বিজয়ের পরের দিন রংপুর টাউন হল থেকে উলঙ্গ,বিবস্ত্র নারী উদ্ধার করা হয়। তাদের অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছেন, অনেকে গোপনে চেপে গেছেন সমাজের-লোক লজ্জার ভয়ে। যারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঠান্ডা করে দিতে চেয়েছিল বাঙালি জাতিকে, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল বাঙালি জাতিকে, যারা পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে শুধু মাটি চেয়েছিল মানুষকে হত্যা করে, ইতিহাস সাক্ষী, বাংলার মাটিতে তাদের কবর হয়েছে। যারা আদেশ দিয়েছিল," Kill Bengalis, rape their women,burn their houses and loot their valuables" - বেলুচিস্তানের কসাই কুখ্যাত টিক্কা খান, আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি, ফরমান আলী, ইয়াহিয়া খানের স্থান হয়েছে আঁস্তাকুড়ে। [৫৮]

১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে।[৫৯] ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পূর্বাঞ্চলীয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল্লাহ খান নিয়াজী পূর্বাঞ্চলীয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজী তার পয়েন্ট ৩৮ রিভল বার যখন হস্তান্তর করেন, অশ্রু ধারায় সিক্ত ছিলেন তিনি। [৬০] ১৬ই ডিসেম্বর নিয়াজি ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলেও সেদিনও রংপুরে যুদ্ধ চলে। ১৭ই ডিসেম্বর রংপুরে অবস্থানরত পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করে এবং রংপুর অঞ্চল সম্পন্ন শত্রুমুক্ত হয়। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অবশেষে, ৩০ লাখ বাঙালির তাজা প্রাণ, আড়াই লাখ মা-বোনের ইজ্জত এবং প্রায় ১৩ হাজার ভারতীয় সৈন্যের আত্মদানের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়।[৬১] আর এই স্বাধীনতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার দুঃখী মানুষদের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন-এটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। [৬২]

সূত্র ও তথ্যনির্দেশ:

১. হোসেন, মোস্তফা তোফায়েল, "বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, রংপুর,বাংলাদেশ: আইডিয়া প্রকাশন, প্রথম প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১১, ৪র্থ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ: ২১৫।

২. গোলাপ, আবদুস সোবহান, " মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, প্রথম

প্রকাশকাল: ২০১৭, পৃ: ১০৯।
৩. মান্টু, মফিজুল ইসলাম,"বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-সংস্কৃতির সংগ্রাম", প্রথম সংস্করণ,রংপুর, বাংলাদেশ : আইডিয়া প্রকাশন, প্রথম প্রকাশকাল: একুশে গ্রন্থমেলা, ফেব্রুয়ারি,২০২০, পৃ: ১২।
৪. মতিন, এম এ, মেজর জেনারেল (বীর প্রতীক), পিএসসি(অব.), সাবেক উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮), "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সতেরো'শ সাতান্ন থেকে উনিশ'শ সাতচল্লিশ", প্রথম সংস্করণ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ: ১৯।
৫. রহিম, মুহম্মদ আবদুর, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, " বাংলাদেশের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, ৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০: নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৭৭, সপ্তদশ সংস্করণ: মে, ২০১৩, পৃ: ৩০৯।
৬. রহমান,মাহবুবুর "বাংলার ইতিহাস,প্রাচীনকাল থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত", প্রথম সংস্করণ, ১২ বাংলাবাজার,সিকদার ম্যানশন, ঢাকা-১১০০: বুকস ফেয়ার, প্রথম প্রকাশকাল: ২০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ:২৬।
৭. হোসেন, আইয়ুব " বৃহত্তর রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, (রাজশাহী,নওগাঁ,নাটর,চাঁপাইনবাবগঞ্জ)", প্রথম সংস্করণ: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০: গতিধারা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৮,পৃ: ১৩।
৮. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল "বাংলার ইতিহাস(১৭৫৭-১৯৭১), প্রথম সংস্করণ: ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০: শিখা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশকাল: বইমেলা ২০১৬, পৃ: ১৯০।
৯. মুরশিদ, গোলাম "হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি",প্রথম সংস্করণ: হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশকাল: ২০০৬, পৃ: ১৯৩।
১০. রহমান, শেখ হাফিজুর " বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট ", প্রথম সংস্করণ, ৩৮ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা),ঢাকা-১১০০ : জোনাকি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৮, ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৭। পৃ: ১৪৭।
১১. আলী, এ বি এম রমজান "মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ", প্রথম সংস্করণ: স্টেশন রোড, রংপুর, প্রকাশক: এম কামরুল রেজা, প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ: ৫।
১২. ঐ, পৃ-৫
১৩. সাঈদ, শামসুল আলম "একাত্তরের বিজয়",প্রথম সংস্করণ, কাকলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশকাল: অক্টোবর,২০১৪, পৃ:২৬ ।
১৪. ঐ, খপৃ:২৫।
১৫. আসলাম সানী(সম্পা.),"ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১২০৫: জার্নিম্যান বুকস, প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি,২০১৮, পৃ:২৩।
১৬. মোস্তাফিজ, মুকুল "মুক্তিযুদ্ধে রংপুর",প্রথম সংস্করণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০:গতিধারা,প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি,২০১১/ ফাল্গুন, ১৪১৭,পৃ:২৯।
১৭. করিম, সরদার ফজলুল "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ", প্রথম সংস্করণ,৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০: সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল,১৯৯৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ :ফেব্রুয়ারি, ২০১৯,পৃ:১২৯।
১৮. সরকার, মোনায়েম "বাংলাদেশ ২৫ মার্চ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চায়", প্রথম সংস্করণ, ,ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি,২০১৮/ ফাল্গুন, ১৪২৪,পৃ:৬৭
১৯. শাহনেওয়াজ, এ কে এম " ১৯৭১,হাজার বছরের উত্তরাধিকার", প্রথম সংস্করণ, ৩৮/২ক,বাংলাবাজার(দোতলা), ঢাকা-১১০০: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ:১৬১

২০. হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার " বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯০৫-১৯৭১", প্রথম সংস্করণ,জিলানী মার্কেটে(দোতলা), নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ:আগস্ট,২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি,২০১৮, পৃ:৪২০।
২১. ইসলাম, মুস্তফা নুরউল ও সৌমিত্র শেখর (সম্পা.), " মুক্তিযুদ্ধের চল্লিশ বছর",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, প্রথমপ্রকাশ: বই মেলা, মাঘ ১৪১৯/২০১৩, পৃ: ৩০৭।
২২. গোলাপ, আবদুস সোবহান " মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশকাল: ২০১৭, পৃ:২৬।
২৩. হোসেন, তোফাজ্জল (মুক্তিযোদ্ধা), " ১৯৭১'র বিজয়, অতঃপর অর্থনীতির সমৃদ্ধি" প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: কনকর্ড এম্পোরিয়াম, প্রথম প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৭,পৃ:১৫১।
২৪. সাক্ষাৎকার, বিনয় কুমার রায়, রংপুর, বয়স ৮৩, তারিখ- ১৬/১২/২০২৩ইং, সময়: ১২:৩০ মিনিট।
২৫. সুফী, মোতাহার হোসেন "রঙ্গপুরের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কার্যক্রম,অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা,অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা,ফাল্গুন, ১৪২২/ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ:২৩৯।
২৬. খালেক , আব্দুল (কবি ও ইঞ্জিনিয়ার)," বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: ঢাকা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশকাল: ২০১৭, পৃ:১৯৬।
২৭. বিশ্বাস, সুকুমার "মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১১০০: মাওলা ব্রাদার্স,প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৭,পৃ:২৬৩।
২৮. ঠাকুর, মো: আবদুল কাইউম "পলাশী থেকে বাংলাদেশ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১০০০: সিঁড়ি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা, ২০১১, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ: আগস্ট, ২০১২, পৃ:৩৮৮।
২৯. আলী, মোহাম্মদ সা'দত (সম্পা.),"মুক্তিযুদ্ধ ৭১,বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০: শব্দরূপ,প্রথম প্রকাশ:চৈত্র, ১৪১৩/ ২৬ মার্চ, ২০০৭, পৃ:১৫।
৩০. হক, আবুল কাসেম ফজলুল "মুক্তি সংগ্রাম",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, চতুর্থ সংস্করণ: মার্চ, ২০১২, পৃ: ৬১।
৩১. বেগম, মালেকা "মুক্তিযুদ্ধে নারী",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: প্রথম প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি,২০১১, পৃ:১৪৫।
৩২. খন্দকার, সাক্ষাৎকার, আকলিমা (নারী মুক্তিযোদ্ধা), রংপুর, বয়স-৬৯ , তারিখ- ২০/১২/২০২৩ইং, সময়- ৩:০০ মিনিট।
৩৩. সাক্ষাৎকার, মমতাজ পারভীন (নারী মুক্তিযোদ্ধা), রংপুর, বয়স-৬৭, তারিখ- ২০/১২/২০২৩ইং, সময়- ৬:১০ মিনিট।
৩৪. কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ(বীর প্রতীক), "মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৩/ফাল্গুন ১৪০৯, পৃ- ৭১।
৩৫. মেরী, মেহেরুন্নেসা,"বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০০০,দ্বিতীয় মুদ্রণ:ফেব্রুয়ারি, ২০০৭,পৃ:৫৩।
৩৬. হাসান, এম এ " যুদ্ধ ও নারী",প্রথম সংস্করন, ঢাকা: তাম্রলিপি,প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, চতুর্থ সংস্করণ: জুন,২০১৮,পৃ- ২৫৪।
৩৭. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, " রংপুরের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: গতিধারা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল,২০১২/ বৈশাখ, ১৪১৯, পৃ:৩২৩।

৩৮. "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পঞ্চম খন্ড",বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেনা সদর, শিক্ষা পরিদপ্তর-এর পক্ষে, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০৮, পৃ:২০৫।
৩৯. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)," বাংলাদেশের ইতিহাস(১৭০৪-১৯৭১)", প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস,প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৩/পৌষ, ১৪০০,তৃতীয় সংস্করণ: জুলাই,২০১০/ আষাঢ়, ১৪১৭, পৃ:৫১০।
৪০. খান, এম এ সালাম " মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : তৃণলতা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশকাল: একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৮,পৃ- ১৪।
৪১. মাযহার, আহমাদ, " বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ", প্রথম সংস্করণ,৩৭ বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০: বিউটি বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি,২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০৭, পৃ:৭৬।
৪২. জেলা প্রশাসন,রংপুর,"রংপুর জেলার ইতিহাস",প্রথম সংস্করণ,শাহবাগ, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, প্রথম প্রকাশকাল: ৩০ জুন, ২০০০, পৃ:২৭৩।
৪৩. শুভ, রিয়াদ আনোয়ার "রণভূমি রংপুর, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে মুক্তিযুদ্ধ",প্রথম সংস্করণ,রংপুর বাংলাদেশ: আইডিয়া প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩,পৃ: ২০৪।
৪৪. হাসান, এম এ " যুদ্ধ ও নারী",প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: তাম্রলিপি,প্রথম প্রকাশ :ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, চতুর্থ সংস্করণ: জুন, ২০১৮,পৃ- ২৫৫।
৪৫. মামুন, মুনতাসীর "শান্তি কমিটি-১৯৭১", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১১০০, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১২, ৩য় মুদ্রন: এপ্রিল, ২০১৪, পৃ:৩০১।
৪৬. সাক্ষাৎকার, মনসুরা বেগম(বীরাঙ্গনা নারী), রংপুর, বয়স-৭১ বছর, তারিখ-১১/১২/২০২৩ইং, সময়-২.১০মিনিট।
৪৭. সাক্ষাৎকার,রূপালী রানী সিংহ(বীরাঙ্গনা নারী), রংপুর, বয়স-৭৬, তারিখ-১২/১২/২০২৩ইং, সময়-৪.৩০ মিনিট।
৪৮. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ " ৭১ এর দশমাস, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ৩য় ঢাকা বইমেলা ও অমর একুশের গ্রন্থমেলা, ১৯৯৭, দ্বিতীয় প্রকাশ: আগস্ট, ২০০৭,পৃ:৪১৪।
৪৯.. ভাট্রি, মাসুদা "বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ, ব্রিটিশ দলিল পত্র", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশন: আগস্ট, ২০০৩,পৃ: ৬৭।
৫০.. হানিফ, গাজী "মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধু",প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: অমরাবতী, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮, পৃ:১০
৫১. দুলারী, নূরনবী শফিউল্লাহ "বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০০৮, পৃ: ৪০৮-৪০৯
৫২. চৌধুরী, ডা. অরূপ রতন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ :৯০।
৫৩. বেগম, মানোয়ারা "রংপুর অঞ্চলের নারী শহীদ,যোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা", প্রথম সংস্করণ, রংপুর, বাংলাদেশ: আইডিয়া প্রকাশন, প্রথম প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ:৭৬
৫৪. মামুন, মুনতাসীর "মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ:৮৮
৫৫. ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল "বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা- : হাতেখড়ি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা,২০১২, পৃ :৩৩৭
৫৬. বুলু, শাহ আবদুল মজিদ "রঙ্গিন দেশ রংপুর", প্রথম সংস্করণ, রংপুর : লেখক সংসদ,রংপুর, প্রথম প্রকাশকাল: ২১ বইমেলা ২০১০, পৃ: ১৮৭।

৫৭. শিকদার, মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মদ আলী পিএসসি (অব.), "মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১৬, পৃ: ২১৯।
৫৮. ইসলাম, মেজর রফিকুল পিএসসি," মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস", প্রথম সংস্করণ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০: কাকুলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ: এপ্রিল,২০১৪, পৃ: ৫।
৫৯. জোবায়ের, মোহাম্মদ ও তপন কুমার দে, "বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা," ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশকাল: জুলাই,২০১৬, পৃ:৩৬৩।
৬০. গুপ্ত, অজয় দাস "মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ: ১৫৪।
৬১. গোস্বামী, অরুণ কুমার "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশকাল: মার্চ, ২০১৯, পৃ: ২২।
৬২. রহমান, শেখ মুজিবুর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী", প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১২, পৃ: ix(ভূমিকা)

উনিশশো চল্লিশের দশকের নব্যবাস্তববাদী চেতনা ও ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোকে নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটির একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

প্রিয়াঙ্কা দত্ত
পি.এইচ.ডি গবেষক
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ

সারসংক্ষেপ

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশভাগ ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছিল তার সরাসরি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উপর। অন্যদিকে ১৯৪৫ সালে বিশ্বচলচ্চিত্রে আগমন ঘটেছিল নব্যবাস্তববাদী চেতনার (নিও-রিয়ালিজম), যার প্রধান বক্তব্যই ছিল বাস্তব পরিস্থিতিকে চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরা। ভারতের গণনাট্যআন্দোলনের পুরোভাগে থাকা আই.পি.টি.এ সংগঠনেরও প্রধান লক্ষই ছিল বাস্তব পরিস্থিতিকে নাটকের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা। এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' (১৯৫০) ছায়াছবিটিও দেশভাগের অভিঘাতে পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে আগত উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযন্ত্রণার কাহিনীকেই চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরেছিল। তাই উক্ত প্রবন্ধে নব্যবাস্তবাদী চেতনা ও ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোকে 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটিকে একটি ঐতিহাসিক আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস যেমন থাকবে তেমনই এই ছায়াছবিটির ব্যার্থতার কারণগুলিও এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৭সালের দেশভাগ কিভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক তথা চলচ্চিত্র জগতকে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়টি আলোচিত হবে এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ - দেশভাগ, ভারতীয় সমাজ, চলচ্চিত্র জগত, নব্যবাস্তববাদী চেতনা, নাট্যআন্দোলন।

উনিশশো চল্লিশের দশক ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছিল, অপরদিকে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বিস্ফোরণ মানব ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসাবে পরিচিত। উক্ত দশকেই আবার ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ভারতের স্বাধীনতাকল্পে শুরু করেছিলেন তাঁদের সর্ববৃহৎ সংগ্রাম 'ভারত ছাড়ো' (১৯৪২) আন্দোলন। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৪৬সালের

আগস্ট মাসে সংঘটিত 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটায়। এই পরিস্থিতিতে এসেছিল ১৯৪৭সালের দেশভাগ। দেশভাগের ফলে যে দুটি প্রদেশ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা হল পাঞ্জাব এবং বাংলা। পাঞ্জাবের মত ভয়াবহ হত্যালীলা বাংলায় পরিলক্ষিত না হলেও বাংলার মূল সমস্যাই ছিল অভিপ্রয়াণ (migration) কেন্দ্রিক। শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের আর্থসামাজিক সংগ্রাম, মানসিক টানাপোড়েন ও জীবন যন্ত্রণার কাহিনীই প্রদর্শিত হয়েছিল নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিতে যা ১৯৫০সালে মুক্তিলাভ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বচলচ্চিত্রে গঠিত নব্যবাস্তবাদী চেতনা বাংলা ছায়াছবিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল বা আদৌ করেছিল কিনা সেই বিষয়টিকে 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে এই প্রবন্ধে। ছায়াছবিটির বাণিজ্যিক অসফলতার কারণগুলিও এখানে আলোচিত হবে। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কিভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক জগত তথা চলচ্চিত্র জগতকে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়টি আলোচিত হবে এই প্রবন্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গুনগত(Qualitative) ও সংখ্যাগত(Quantitative) তথ্যকে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাপত্রটি রচিত করা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই ঘটায়নি, সাংস্কৃতিক তথা বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র জগতের উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্বে চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হলেও চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা, জনমনে এর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ইত্যাদিকে পরিলক্ষিত করে যুদ্ধোত্তরকালেই চলচ্চিত্রকে প্রথম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল।[১] যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা শুধুমাত্র কোন দেশ বা আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই সীমাবদ্ধতাকেই ধ্বংস করেছিল এবং চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণ গড়ে তুলেছিলেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব তত্ত্ব (film theory) যা ক্রমেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নব্যবাস্তববাদী চেতনা বা 'Neo-Realism'। 'নব্যবাস্তববাদ' হল একটি চলচ্চিত্র আন্দোলন যার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৫সালে ইতালিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতালির চলচ্চিত্র নির্মাতাগণকে বুঝিয়েছিল 'to appreciate the richness of the real and to discover the importance of current events.[২] বস্তুত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কের সূচনাও এই সময় থেকেই হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসচর্চায় চলচ্চিত্রের গুরুত্ব দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত বিগত শতকের শেষ দুই দশক থেকে ইতিহাস চর্চায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা স্বীকৃত হয়। থিওডোর ভাস্করণের মতে চলচ্চিত্র যেকোনো সময়ের, যেকোনো সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজমনকে তুলে ধরতে এবং তাকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গচ্ছিত রাখতে সক্ষম।[৩] দেশভাগ পরবর্তী আর্থসামাজিক অবস্থা ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে নির্মিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি এই কাজই করেছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে ভিন্ন স্বাদের ছায়াছবির বা 'Alternative films'

সূচনাকাল হিসাবে, সত্যজিত রায় পরিচালিত, ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালী' ছায়াছবিকেই ধরা হয়। কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী সময়ে, বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে নির্মিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটির নির্মাণকাল ১৯৪৮-৪৯ সাল এবং এটি মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৫০ সালে অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' মুক্তিলাভেরও পাঁচ বছর আগে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসচর্চায় এই বিষয়টি অধিকাংশক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। তাই এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসচর্চার এই শূন্যস্থানকে পূরণ করার প্রয়াস গৃহীত হবে।

নব্যবাস্তববাদী চেতনার মূল ক্ষেত্র ছিল দুটি - নান্দনিক ও রাজনৈতিক এবং উভয় ক্ষেত্রেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাস্তব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রচলিত সমাজব্যাবস্থা, চিন্তাচেতনের অন্তঃসারশূন্যতাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা।[৪] ১৯৩০এর দশক থেকেই বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়েছিল নাট্যজগতের উপর, গঠিত হয়েছিল আই.পি.টি.এ বা "Indian Peoples' Theatre Association". দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করেছিল যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যেকোনো ঔপনিবেশিক দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রাও অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এবং বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই আই.পি.টি.এ -র উদ্দেশ্যই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অসারতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট কঠিন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের জীবনযন্ত্রণার বাস্তবচিত্রকে নাটকের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।[৫] ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গঠিত উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় জনমনের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটাতেও উদ্যোগী হয়েছিল। তাই বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে নির্মিত 'নবান্ন' নাটকটি সমগ্র বাংলায় তো বটেই ভারতের বিভিন্ন স্থানেও চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু নাটকের পরিসর সীমিত। একই সময়ে বিপুল সংখ্যক জনগণের চিন্তাচেতনের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে নাটকের সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয় নাটকের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতিকে অকৃত্রিম উপায়ে উপস্থিত করাও একপ্রকার অসম্ভব। এই বিষয়গুলিকে অনুভব করেই স্বাধীনোত্তরকালে আই.পি.টি.এ সংগঠনের একাধিক সদস্য চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করেছিলেন। এই সকল সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নিমাই ঘোষ যিনি নির্মাণ করেছিলেন 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি।

'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ছায়াছবির সূচনাপর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে উক্ত ছায়াছবিটি কোন বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রকাশ না, বরং 'পূর্ববঙ্গের একদল বাস্তুত্যাগীর সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য ও কঠোর জীবনসংগ্রামের আলেখ্য এই ছায়াছবি'।[৬] এই অংশে ছায়াছবির কাহিনী আবর্তিত হয় পূর্ববঙ্গের নলডাঙ্গা নামক গ্রামের প্রান্তিক, খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে। এই সকল মানুষের মধ্যে কৃষিজীবী, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, পাটচাষী প্রমুখ সকল পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পঞ্চাশের মন্বন্তরে নিজেদের অর্ধেক জমিজমা হারিয়ে কোনমতে নিজেদের দিনযাপন করেছিলেন। এই পর্যায়ে ছায়াছবিটিকে

অনেকাংশেই ধারাভাষ্যের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছিল। বিশেষত প্রাক-স্বাধীনতাকালে বাংলার আর্থসামাজিক জীবনযাত্রাকে অনেকটা তথ্যচিত্রের আদলে তুলে ধরার প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করা যায়। ছায়াছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র 'শ্রীকান্ত' একজন কৃষক এবং পাশাপাশি একজন রাজনীতিসচেতন ব্যাক্তিও বটে। কোন ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে আসন্ন তা তিনি অনুমান করতে পারলেও তা যে দেশভাগ সেই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । তাই তিনি স্থানীয় জমিদারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। উক্ত ছায়াছবিটি ১৯৪৬-৪৭সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। এই সময়েই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুন্নাপ্রাভায়লার বিদ্রোহ, বাংলায় তেভাগার মত কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বামপন্থী আদর্শের পতাকাতলে। এমনকি শেষপর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ বলেও ঘোষিত হয়েছিল। উক্ত ছায়াছবিতেও এই সকল ঘটনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দেখা যায় মধু গাঙ্গুলি ও মুজাফফর খাঁ নামক গ্রামের দুই দুর্নীতিগ্রত ব্যাক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজনীতি সচেতন শ্রীকান্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ছায়াছবিতে শ্রীকান্তর কারাবাস এবং দেশভাগ প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। বামপন্থীগণ ১৯৪৭এর স্বাধীনতাকে একপ্রকার প্রহসন বলেই মনে করতেন এবং তাই তাঁদের কণ্ঠে বারংবার শোনা যেত -' ইয়ে আজাদি ঝুটি হ্যায়'। দেশভাগের অভিঘাতে স্তম্ভিত নলডাঙ্গা গ্রামের গ্রামবাসীদের কণ্ঠেও শোনা যায় একপ্রকার ধন্দ, উৎকণ্ঠা। তাঁরা প্রশ্ন করেন -'বাবুরা দেশভাগ নিয়ে যে হুড়াহুড়ি করলো তাঁর ফলটা কি হল জানো নাকি ?' পরোক্ষণেই আবার তাঁরাই বলে ওঠেন ' শ্রীকান্ত নেই। কে বোঝাবে দাঁড়িপাল্লা কোনদিকে ভারী হল'। এক কথায় বলা যায় উক্ত ছায়াছবিটিকে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী চেতনা, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি বা দেশভাগের আলোকে বিচার করাই যুক্তি সঙ্গত নয়। বরং সমকালীন আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের বাস্তবিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মানসিক টানাপোড়েনকেও পরিচালক উক্ত ছায়াছবির মাধ্যমে মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।[৭]

দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে বাংলার এক জ্বলন্ত বিষয় ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। ১৯৫১ সালের 'রিফিউজি কনভেনশন' এর বক্তব্য অনুযায়ী যদি কোন ব্যাক্তি ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত, রাজনৈতিক অথবা ব্যাক্তিগত মতাদর্শের কারণে নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করেন অথবা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ভবিষ্যতে সেই স্থানে প্রত্যাবর্তনের সকল ইচ্ছাও পরিত্যাগ করেন তখন সেই ব্যাক্তিকে রিফিউজি বা উদ্বাস্তু রূপে গণ্য করা হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে ভারতে আগত উদ্বাস্তু মানুষদের বলা হত পুরাতন অভিবাসী (Old migrants) এবং এরা সকল প্রকার সরকারী নীতির সুবিধা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু যে সকল উদ্বাস্তু মানুষ জন ১৯৫৮সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভারতে এসেছিলেন তাঁরা 'নতুন অভিবাসী'(New migrants) নামে খ্যাত এবং এরা সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।[৮] উক্ত ছায়াছবিটির দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পুরাতন অভিবাসীদের কথাই তুলে ধরা হয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তীকালে একাধিক গ্রামের সাম্প্রদায়িক হিংসার খবরে ভীত সন্ত্রস্ত পূর্ববঙ্গের নলডাঙ্গা গ্রামের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত স্বল্প অর্থের বিনিময়ে তাঁদের ভিটেমাটি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গের চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকান্তর গর্ভবতী স্ত্রী

শেষপর্যন্ত শ্রীকান্তকে ছাড়াই বাকি গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আস্তে বাধ্য হয়েছিলেন। জয়া চ্যাটার্জী তাঁর 'The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে যে সকল মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা হয়রানি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে, যদিও তাঁরা কিন্তু সরাসরি দাঙ্গার শিকার হন নি।[৯] নব্যবাস্তববাদী ছায়াছবির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল বাহুল্যবর্জিতভাবে বাস্তব পরিস্থিতকে চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরা এবং এক্ষেত্রে বলা যায় 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি সেই শর্ত পূরণে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার 'দি ইউনিয়ন পাওয়ারর্স কমিটি' রিপোর্ট পেশ করে জানায় যে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের 'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আক্ট' এর ন্যায় আয়কর সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি রাজ্যের হাতে নিমজ্জিত হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজ্য প্রতিবাদ জানালেও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য নীতির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা আশা করেছিলেন এই সহযোগিতার বিনিময়ে হয়তো দেশভাগের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হবে।[১০] কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশভাগের ফলে বাংলার বিপুল কৃষিজমি পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হওয়ায় বাংলার আর্থিক সঙ্গতি বহুলাংশে হ্রাস পায়। উপরন্তু রাজ্য সরকারের হাতে আর্থিক উপার্জনের প্রধান উৎসগুলির না থাকায় রাজ্যের আর্থিকভীতও দুর্বল হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত উদাসীন মনোভাব বাংলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল। উক্ত ছায়াছবিটিও উদ্বাস্তু মানুষের এই আশাভঙ্গের কাহিনীকেই তুলে ধরেছিল। ছায়াছবিতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে মাটিতে নতুন বাসস্থান, কর্মসংস্থানের আশা নিয়ে নলডাঙ্গা গ্রাম থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষজন যখন কলকাতার রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখেন পনেরো দিন আগে ঢাকা থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষদেরও বাসস্থান জোগাড় হয়নি তখন তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন, যা তাঁদের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছিল। তাই তাঁদের কণ্ঠে শোনা যায় ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি - 'ভিটেমাটি গেল তল, এখন জমির দখল লইতে আইসেছে ইস্টিশনে'।

নব্যবাস্তববাদী চেতনায় নির্মিত ছায়াছবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্টুডিয়োর পরিবর্তে প্রকৃত রাস্তাঘাট, জনবসতি, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ এবং তাঁদের জীবনসংগ্রামকে অকৃত্রিমভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা। বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও নব্যবাস্তববাদী পরিচালক জাভাতিনি বলেছিলেন -

It is not a question of making imaginary things become 'reality' (making them look true and real) but of

making things as they really are most significant, as if they were

telling their story by themselves. Thus life

itself must appear on the screen. Naturally,... It will create stories that are already far from artificiality.[১১]

উক্ত ছায়াছবিতেও গ্রামবাসীদের কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রার অংশে দর্শনা স্টেশনটিকে পিছনে ফেলে আসার দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। এই দর্শনা স্টেশনটি হল পূর্ববঙ্গের শেষ স্টেশন। তাই এর সঙ্গে যেমন উদ্বাস্তু মানুষের ভাবাবেগ জড়িত তেমনই এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। শুধু তাই নয়, কলকাতায় আগমনের পর নলডাঙ্গা গ্রামের গ্রামবাসীদের প্রকৃত অবস্থা কি হয়েছিল তা তুলে ধরার জন্য পরিচালক তৎকালীন সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনের বাস্তবিক চিত্র - স্টেশনে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়, সেখানে তাঁদের অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রা, অপুষ্টি, অনাহারের বাস্তবিক দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দী করে তাকে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে স্টুডিয়োর পরিবর্তে প্রকৃত রাস্তাঘাটের প্রকৃত দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দী করার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত বিরল এবং ব্যাতিক্রমী ঘটনা। এই বিষয়ে পরিচালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন - 'আমার তখন মনে হয়েছিল সত্যি কথা বলব এবং সত্যি যা আছে তাই দেখাব আর ছিন্নমূলের মত ছবিতে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে না এলে তা হয়না।'[১২] ছায়ছবির প্রযোজক বিমল রায় জানিয়েছিলেন যে ছায়াছবির চিত্রগ্রাহক বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি কোমরে ক্যামেরা বেঁধে পূর্ববঙ্গ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে আগত ট্রেনের জানালা দিয়ে এমনভাবে নিজের শরীরকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন যাতে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুগণ কিরূপ কষ্ট সহ্য করে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন তাঁর বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভবপর হয়।[১৩] যদিও এই সকল দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করার ক্ষেত্রে ছায়াছবির নির্মাতাগণ প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ছায়াছবিটির রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকটি খতিয়ে দেখে তৎকালীন সময়ে রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ লাল শিয়ালদহ স্টেশনে উক্ত ছায়াছবির শুটিং নিষিদ্ধ করেছিলেন, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতরের কমিশানার পি.কে.সেন ছায়াছবির নির্মাণের উপরই সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।[১৪]

উক্ত ছায়াছবিতে নলডাঙ্গা গ্রামের গ্রামবাসীদের ভিটেমাটি ত্যাগ করার দৃশ্যে দেখা যায় এক বৃদ্ধাকে, যিনি কোনমতেই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে আস্তে চাইছিলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আস্তে বাধ্য হয়েছিলেন। নিমাই ঘোষ তাঁর এক স্বাক্ষাৎকারে সেই বৃদ্ধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সেই বৃদ্ধা প্রকৃত অর্থেই একজন উদ্বাস্তু ছিলেন এবং পূর্বে কখনই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পরিচালকই তাঁকে খুঁজে বার করেন। পরিচালক তাঁকে অভিনয়ের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করেলে সেই বৃদ্ধা তাঁকে অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলেছিলেন - 'ভিটামাটি ছাইড়া চইলা আইলে বুকের মধ্যে কি আগুন জ্বলে এটা তুমি আমারে দিতে পারবা না, এটা আমি তোমারে দিমু'।[১৫] শুধু তাই নয় পরিচালক তাঁকে নির্দিষ্ট কতগুলি সংলাপ দিলেও উক্ত ছায়াছবিতে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার দৃশ্যে তিনি যেসকল সংলাপ বলেছিলেন তা তাঁর অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা থেকে নির্গত হয়েছিল। এর পরিচালকের স্ক্রিপ্টের সঙ্গে যার কোনরূপ সাদৃশ্য ছিল না। উক্ত ছায়াছবিতে দেখা যায় ছায়াছবির কলাকুশলীদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, চারুপ্রকাশ ঘোষ,

গঙ্গাপদ বোস, শান্তি মিত্র, শোভা সেন ব্যাতীত বাকি সকল ব্যাক্তিবর্গই ব্যক্তিগত জীবনেও উদবাস্তুই ছিলেন এবং 'ছিন্নমূল' ছায়াছবির মাধ্যমে প্রথমবারের জন্য তাঁরা দেশভাগের যন্ত্রণা, তাঁদের উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতার প্রতি মোহভঙ্গ ইত্যাদি বিষয়কে নিজেদের অভিব্যাক্তির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃত উদ্বাস্তুদের ক্যামেরার সম্মুখে উপস্থিত করা প্রসঙ্গে পরিচালক বলেছিলেন - 'বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে যে এর প্রয়োজন আছে তা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তাই তাঁদের আমি খুঁজে খুঁজে বার করি'।[১৬]

জন্মভূমির সঙ্গে জড়িত থাকে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় তথা আত্মপরিচয়। কিন্তু দেশভাগ উদ্বাস্তু মানুষজনকে এক পরিচয়জনিত সঙ্কটের সম্মুখীন করেছিল এবং এই বিষয়টিকে উক্ত ছায়াছবিতে তুলে ধরেছিলেন পরিচালক। ছায়াছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় দীর্ঘদিন স্টেশনে দিনযাপনের পরে এক স্বেচ্ছাসেবক নলডাঙ্গা গ্রাম থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষদের একটি ফাঁকা বাড়িতে বাসবাসের ব্যাবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে বাড়ির মালিক ও তাঁর ভৃত্য এসে ঐ সকল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যাবহার করেন। শুধু তাই নয় উদ্বাস্তু মানুষগুলি এই অসম্মানজনক ব্যাবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে ঐ ভৃত্য বলেন - 'এদের (উদ্বাস্তু) সাথে এভাবেই কথা বলা উচিৎ'। তৎকালীন সময়ে বাঙাল (পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষ) ও ঘটির (পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা) দ্বন্দ্ব সর্বজন বিদিত। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষজন যে শুধুমাত্র তাঁদের ভিটেমাটি হারিয়েছিলেন তাই নয়, সম্পূর্ণ নতুন একটি দেশে এসে নিজেদের আত্মপরিচয়ও হারিয়েছিলেন।[১৭] এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বাধীনোত্তর যুগে হাস্যকৌতুকের মোড়কে একাধিক বিখ্যাত বাংলা ছায়াছবি নির্মিত হলেও এই সমস্যার গভীরতাকে নিমাই ঘোষই প্রথম চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রথম তুলে ধরেছিলেন। পরিচালক ছায়াছবির এই পর্যায়ে শ্রীকান্তকে আর ছায়াছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করেননি। বরং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং তাঁদের পরিচয় সংকটই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল। পরবর্তী অংশে দেখা যায় কারামুক্ত হয়ে শ্রীকান্ত তাঁর স্ত্রীর সন্ধানে কলকাতায় আসেন এবং দীর্ঘ হতাশার পর যখন তিনি নিজের স্ত্রীর সন্ধান পান তখন ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সল্পক্ষণের মধ্যেই দীর্ঘ অপুষ্টি, মানসিক টানাপোড়েনের ফলে বিধ্বস্ত, শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ শ্রীকান্তর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রীকান্তর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে তাঁর সন্তান এবং এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিশ্বচলচ্চিত্রের আঙিনায় নব্যবাস্তববাদী চেতনায় নির্মিত প্রথম চূড়ান্ত সফল ছায়াছবি ছিল ইতালীয় পরিচালক রোসেলিনি পরিচালিত 'রোম: ওপেন সিটি' বা ইতালীয় ভাষায় 'Roma, Citta` Aperta' যা মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৩ সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত উক্ত ছায়াছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট এবং ক্যাথলিকরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তাকে কেন্দ্র করে। উক্ত ছায়াছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র, ছাপাখানার মালিক ফ্রান্সেস্কো ফ্যাসিবাদীদের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তাঁকে সাহায্যকারী পাদ্রী এবং মার্কসবাদী বিপ্লবী উভয়ই ফাসিবাদীদের হাতে

নিহত হন। ছায়াছবিটি দেখিয়েছিল যে দানবীয় শক্তির কাছে কতটা মানুষ অসহায়। কিন্তু আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষ সব কিছু হারিয়েও কখনও পরাজিত হয়না। 'ছিন্নমূল' ছায়ছবিতেও অনুরূপ বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছিল। ছায়াছবির একবারে অন্তিম দৃশ্যে দেখা যায় সদ্য স্ত্রীবিয়োগের যন্ত্রণাকে পিছনে ফেলে শ্রীকান্ত তাঁর সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে আগামী জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে অসহায় করে তুললেও তাঁর সদ্যজাত সন্তান তাঁর জীবনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র অনুপ্রেরণা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।

এই ছায়াছবিটির কাহিনীর বিন্যাস কিংবা প্রকৃত সাধারণ মানুষকে চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অন্যান্য একধিক বিষয়েও নব্যবাস্তববাদী চেতনার সঙ্গে এই ছায়াছবির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন - অত্যন্ত স্বল্প অর্থে উক্ত ছায়াছবিটির নির্মাণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোনরূপ প্রসাধন ব্যাবহার না করা, সঙ্গীতের অনুপস্থিতি, কথোপকথনের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের স্থানীয় ভাষার ব্যাবহার ইত্যাদি বিষয়গুলি জাভাতিনি কর্তৃক নির্দেশিত নব্যবাস্তববাদী ধারার শর্তগুলিকেই পূরণ করেছিল।[১৮] দেখা যায় ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পূর্বে ভারতে কখনই নব্যবাস্তববাদী ধারার কোন চলচ্চিত্রই প্রদর্শিত হয়নি। যদিও নিমাই ঘোষ জানিয়েছিলেন নব্যবাস্তবাদী ছায়াছবি দেখার সুযোগ না হলেও 'পেঙ্গুইন' নামক এক প্রকাশনা সংস্থার চলচ্চিত্র সমালোচনা সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা থেকে তিনি নব্যবাস্তববাদী পরিচালক রোসেলিনির 'রোম : দি ওপেন সিটি' সহ একাধিক নব্যবাস্তববাদী ছায়াছবির সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ সকল ছায়াছবির বিভিন্ন অংশের স্থির চিত্র দেখে অত্যন্ত প্রভাবিতও হয়েছিলেন।[১৯] বিখ্যাত পরিচালক পুডোভকিন এবং চেরকাশভ 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করে এক পত্র মারফৎ নিমাই ঘোষকে জানিয়েছিলেন -

... You are carrying out a great and noble task in confirming a realistic trend in Indian cinematic art to the

extent that realistic art truly express reality, it always appears profoundly nationalistic. We therefore cordially

greet you as a fighter for national cinematic art of India.[২০]

শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতে তিনি যে সকল ছায়াছবি দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে 'ছিন্নমূল ছায়াছবিটি ছিল শ্রেষ্ঠ।[২১] কিন্তু এত কিছুর পরেও ছায়াছবিটি বানিজ্যিকভাবে ব্যার্থ হয়েছিল।

উক্ত ছায়াছবিটি যখন মুক্তিলাভ করে তখন বাংলা চলচ্চিত্র জগত এক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৩০-র দশক পর্যন্ত বাংলা সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্র রূপে গণ্য হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছিল। দেখা যায় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের একটি অবৈধ বিনিয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল বোম্বাইয়ের হিন্দি চলচ্চিত্র জগত।[২২] এর ফলে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে স্টুডিয়ো ব্যাবস্থার পতন ঘটে এবং উত্থান ঘটে তারকা ব্যাবস্থার(star system)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক হিংসা ইত্যাদির ফলে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত বাংলার চলচ্চিত্র

জগত হিন্দি ছায়াছবির চাকচিক্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যুক্ত হয়েছিল দেশভাগ। ঔপনিবেশিক যুগে ছায়াছবি নির্মাণের স্টুডিয়োগুলি ছিল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং প্রেক্ষাগৃহগুলির অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গে। 'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশভাগের ফলে বাংলার প্রায় ১১৭টি প্রেক্ষাগৃহ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হয়েছিল এবং কলকাতায় থেকে গিয়েছিল মাত্র ৫৮টি প্রেক্ষাগৃহ।[২৩] এই পরিস্থিতিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের আর্থিক ক্ষতিকে পূরণ করতে গেলে প্রয়োজন ছিল অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'The Film Enquiry Committee'(1951) রিপোর্টে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অপ্রতুলতার জন্য নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।[২৪] এই পরিস্থিতিতে বাংলা চলচ্চিত্র মূলত সাহিত্যনির্ভর বা সুচিত্রা-উত্তম জুটি অভিনীত রোমান্টিক কাহিনীভিত্তিক ছায়াছবিকে কেন্দ্র করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। পাশাপাশি এখানে দর্শক রুচির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশভাগের আর্থসামাজিক অভিঘাতে বিধ্বস্ত বাঙালী দর্শকের এই সময়ে ছায়াছবি থেকে প্রত্যাশাই ছিল এমন কোন কাহিনী যা তাঁদের স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে ভুলে থাকতে সাহায্য করবে।[২৫] এমনকি পরিচালক নিমাই ঘোষও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে উক্ত ছায়াছবিটি সময়ের অনেক পূর্বে নির্মিত হয়েছিল এবং তাই দর্শকমনে এটি স্থানলাভ করতে ব্যার্থ হয়েছিল।[২৬] যদিও পরিচালক মৃণাল সেন মনে করতেন যে কাহিনী পরিবেশনার আঙ্গিকের উপর দর্শকমনে স্থানলাভের বিষয়টি নির্ভর করে এবং উক্ত ছায়াছবির কাহিনী মন্থরগতিসম্পন্ন হওয়ায় তা দর্শকমনে বিশেষ স্থান লাভ করতে পারেনি ।[২৭] ছায়াছবিটি যখন মুক্তিলাভ করে তখনও স্বাধীন ভারতে ছায়াছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে রূপরেখা নির্ধারণকারী, ভারত সরকার প্রণীত Report of the Film Enquiry Committee (১৯৫১) প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পুলিশি নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই বজায় ছিল। তাই ছায়াছবিটি নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছে এই অভিযোগে ছায়াছবি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যকে বাদ দিয়েছিল তদানীন্তন পুলিশ প্রশাসন। যার ফল স্বরূপ ছায়াছবিটি কাহিনী অনেকাংশেই পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। এসব খামতি স্বত্বেও বলা যায় নব্যবাস্তবাদী চেতনার মানদন্ডে 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি অনেকাংশেই সফল হয়েছিল এবং তাই ছায়াছবিটি বিদেশে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা লাভ করে।

তথ্যসূত্র :

১ Casetti, Francesco, THEORIES OF CINEMA: 1945-1995, trns. Francesca Chiostri, Thomas Kelso, AUSTIN: UNIVERSITY OF TEXAS PRESS, 1999, p.7

২ ibid, p. 25

৩ Bhaskaran, Theodore. S, History Through the Lens: Perspectives On South Indian Cinema, Hyderabad: Orient Blackswan, 2009, pp.17-18

৪ Nowell-Smith, Geoffrey, 'The Second Life of Italian Neo-realism' in Journal of Moving Image, No.2, 2014, p.47

৫ ঘটক, ঋত্বিক, 'গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে', অভিনয় দর্পণ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জুলাই - অগস্ট), কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৮

৬ নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ছায়াছবিটি সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত ইউটিউবে। প্রয়োজনীয় লিঙ্ক প্রদান করা হল- http://youtube/NXVSDIUKi8Q?si=ebvySvHbpymcGHyQ

৭ Biswas, Moinak 'The City and the Real: Chinnamul and the Left Cultural Movement in the 1940's'in Preben Kaarsholm , ed. City Flicks: Indian Cinema and the Urban Experience, London: Seagull Books, 2007, pp. 40-59

৮ Chatterjee, Nilanjana, 'The East Bengal Refugees: A Lesson In Survival' in Sukanta Chowdhury. ed. Calcutta : The Living City , Volume II : The Present and Future, Calcutta : Oxford University Press , 1990 , pp.70-77

৯ Chatterjee, Joya, The Spoils Of Partition: Bengal And India, 1947-1967, New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2007, p. 107

১০ ibid, pp. 77-99

১১ Casetti, Francesc, op.cit. , p. 25

১২ পরিচালক নিমাই ঘোষের স্বাক্ষাৎকার, স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন শ্রী সঞ্জয় মিত্র ও জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র, চিত্রভাষ, স. মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নন্দন মিত্র, বর্ষ ১৯, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৮

১৩ ঘোষ, বিমল, 'ছিন্নমূল কেন প্রযোজনা করলাম', চিত্রভাষ, স. মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নন্দন মিত্র, বর্ষ-১৯, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৩-১৪

১৪ পরিচালক নিমাই ঘোষের স্বাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৫ তদেব, পৃ: ৯-১০

১৬ তদেব, পৃ. ৯

১৭ Sarkar, Bhaskar, Mourning the Nation: Indian Cinema in the Wake of Partition, Hyderabad: Orient Blackswan private Limited, 2010, p.126

১৮ Biswas, Moinak, op.cit. ; pp. 47

১৯ পরিচালক নিমাই ঘোষের স্বাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২০ ১৯৫১ সালে ছিন্নমূল ছায়াছবিটি দেখে পুডোকভিন এবং চেরকাশভ একত্রিতভাবে পরিচালক নিমাই ঘোষকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। উক্ত পত্রটি 'চিত্রভাষ' পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। চিত্রভাষ, স. মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নন্দন মিত্র, বর্ষ ১৯, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৯ পৃ. ২

২১ তদেব

২২ Barnow, Erik, and. Krishnaswami, S. Indian Film, New York: Columbia University Press, 1963, pp.121-124

২৩ 'সম্পাদকীয়', রূপমঞ্চ, স. কালীশ মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, পৃ. ৬, ১৪

২৪ Report of the Film Enquiry Committee, New Delhi: Government of India, Ministy of Information and Broadcasting, , 1951, p. 27

২৫ 'নাট্যলোক ও চিত্রকথা', আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৫২, পৃ. ৮

২৬ পরিচালক নিমাই ঘোষের স্বাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৭ সেন, মৃণাল, 'বাংলা সিনেমার দর্শক ও ছিন্নমূল', চিত্রভাষ, স. মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নন্দন মিত্র, বর্ষ ১৯, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৯ পৃ. ১৭-২২

জলামুঠা রাজবাড়ীর ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

সঞ্জীব পাত্র
গবেষক

সারসংক্ষেপ:

ষোড়শ শতকে বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি অঞ্চল সন্নিহিত প্রাচীন হিজলী রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা সেই অঞ্চলে প্রায় শতবর্ষকালের (১৪৯৭-১৫৮৪) জন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটায়। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঈশা খাঁর মৃত্যু হলে মসনদ-ই-আলা শাসিত হিজলী রাজ্যের পতন ঘটে। পূর্বতন হিজলী রাজ্য থাকে বাহিরীমুঠা ও সুজামুঠা জমিদারির অধীনে, অন্যদিকে মাজনামুঠা এবং জলামুঠা নামে দুটি পৃথক জমিদারির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাব মিরকাশিম ব্রিটিশ কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, এবং চট্টগ্রামের জমিদারি অর্পণ করলে মেদিনীপুর ও হিজলী চাকলার বৃহৎ জমিদারি বন্দোবস্তগুলি চলে যায় ব্রিটিশদের অধীনে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা দেওয়ানী লাভের পর মেদিনীপুরের জমিদারদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে। জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল এবং বৃহত্তর লবণ উদপাদনের কেন্দ্র হওয়ায় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদারদের সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে উপনিবেশিক সময়কালে মেদিনীপুরের প্রাচীন জলামুঠা রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বংশের ইতিহাস লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। মেদিনীপুরের অন্যান্য প্রাচীন জমিদার বংশের মতো সুখ্যাতি না থাকার কারণে এই বংশের ইতিহাস গবেষকদের অনুসন্ধানের বাইরে থেকে গেছে। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্ট এই জমিদারি মারাঠা আক্রমণ, এবং উপনিবেশিক শাসনের সময়কাল অতিক্রম করে ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই বংশের অধীনে থাকা এগরা - কাঁথি - গড়বাসুদেবপুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মন্দির, স্থাপত্য, জলাশয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের জমিদাররা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নিজেদের অসীম অবদান রেখে গেছে।

শব্দসূচক : জলামুঠা, গড়বাসুদেবপুর, জমিদারি বন্দোবস্ত, মাজনামুঠা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত মহাভারতে ভারতের উত্তর পূর্বে তাম্রলিপ্ত, সুব্রহ্ম ও কলিঙ্গ রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। নানা সময়ে ঐ তিনটি রাজ্যের সীমানা বদল হলেও মেদিনীপুরের মূল ভূখণ্ড এই তিনটি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে দীর্ঘদিন। মহাভারতে মহাবীর কর্ণকে কলিঙ্গ অঙ্গ, বঙ্গ, সুব্রহ্ম ও পৌণ্ড্র যুক্তরাষ্ট্রের অধীশ্বর বলা হয়েছে।[১] পরবর্তীকালে মেদিনীপুর সহ বাংলার বৃহদংশ মৌর্য, গুপ্ত ও রাজা শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস অনুসারে খ্রিস্টীয় নবম শতকে (৮২২ শকাব্দ) পূর্ব মেদিনীপুর

জেলার তমলুক, বালিসিতা, তুরকা, সুজামুঠা, ও কুতুবপুর - এই পাঁচটি স্থানে পাঁচজন মাহিষ্যরাজা শাসন করতেন।[২] ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সেন রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে কলিঙ্গরাজ অনঙ্গভীমদেবের সময় দক্ষিণবঙ্গের অখন্ড মেদিনীপুর অঞ্চলে উৎকল শাসন আরও দৃঢ় হয়। অন্যদিকে রালফ্ ফিচ্ তার ভ্রমণবৃত্তান্তে অখন্ড মেদিনীপুরকে স্বাধীন হিজলী রাজ্যের অধীনে বলেছে।[৩] ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যান্বেষী রহমত খান, উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্ররোচনায় ইখতিয়ার খাঁ উপাধি নিয়ে স্বাধীন হিজলি রাজ্যের পত্তন করে। এই রাজ্য ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে অখন্ড মেদিনীপুর মোঘল শাসক জাহাঙ্গীরের অধীনে আসে। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খাঁর রাজ্য দক্ষিণ ভাগের দুটি জমিদারি মাজনামুঠা ও জলামুঠার অধিকারী হন দুই রাজকর্মচারী। মহিষাদল ও সুজামুঠা জমিদারি (বা পুরাতন হিজলী রাজ্য) তাজ খাঁর অধীন করদ রাজ্য ছিল। তাই এগুলি পূর্ববৎ স্বতন্ত্র জমিদারের মর্যাদা প্রাপ্ত হল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামে বিরাট ভূমি ভাগ ছিল তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার হিজলি রাজ্যভুক্ত খাস বা নিজস্ব ভূসম্পত্তি; অর্থাৎ এতে মধ্যবর্তী কোন জমিদারের স্বত্ব ছিল না। তাজ খাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শাসিত হতো এই দুটি অঞ্চল। ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করনের মতে, বাহাদুরের মৃত্যুর পর মাজনামুঠা ও জলামুঠা যথাক্রমে দ্বারকা দাস এবং দিবাকর পণ্ডার ভাগে পড়লো। কিন্তু তা বাহাদুরের মৃত্যুর পর নয় বরং বন্দী দশায় ('নজরবন্দী') ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) যাবার পর। কারণ, সেখানে যাওয়ার পর, দিল্লির রাজদরবারের নানা কাজ সম্পন্ন করতে করতে কখন মারা গেছেন ইতিহাসগত দিক থেকে তার কোনো তথ্য পওয়া যায় না। যাইহোক বাহাদুরের পর তার রাজ্যত্বের মধ্যে এই দুই জমিদারের অধীনে দুটি পৃথক জমিদারির পত্তন হলো। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারির পরগণাগুলো একে অপরের সীমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় বোঝা যায় জমিদারির দুটোর উৎস এক। Bayley's তার 'Memoranda of Midnapore' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন "The Majna and Jellamootah families both sprang from one source; the properties are intermingled, and are sister properties". এইসব জমিদারির নামের শেষে 'মুঠা' শব্দ প্রয়োগের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। 'মুঠা' সমষ্টি (group) অর্থে ব্যবহৃত হত। ছোট ছোট জমিদারির বা মহালের একত্রীভূত (Grouped) রূপকে প্রকাশ করার জন্য 'মুঠা' শব্দের ব্যবহার করা হয়; যেমন এক মুঠা বিচালি ('The suffix Mutha of several parganahs in East Midnapore (Hijili) is not found either in the Madala Panji or in the Ain-e-Akbari and is therefore more recent.' অর্থাৎ একগোছা বিচালি, মানে একমুঠো (মুষ্টি) চালের (Handful of rice) মতো হয়।

মি. গ্রান্টের (Mr. Grant's) ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দের রাজস্ব বিবরণী অনুসারে দিবাকর পণ্ডার জলামুঠা রাজত্ব বা জমিদারির অন্তর্গত ১৩টি পরগণা হলো- ১) জলামুঠা, ২) কেওড়ামাল বিওয়ান, ৩) দক্ষিণমাল, ৪) বাহিরিমুঠা, ৫) পাহাড়পুর (Bayley's তাঁর 'Jullamootah Report'-এ উল্লেখ করেছেন, 'Musnad Allee Shah's embrankments are the bounderies in each direction'. এই পরগণার চতুঃসীমা 'মসনদ-ই-আলার বাঁধ' নামে পরিচিত। এর মধ্যে 'তাজদীঘি' নামে পুস্করিণীটি তাজ

খাঁ মসনদ-ই-আলারই কীর্তি), ৬) গওমেশ, ৭) নয়াচক বাজার (বায়েন্দা বাজার), ৮) ভাইটগড় (সরকার জলেশ্বর), ৯) কালিন্দী বালিশাহী, ১০) বীরকুল (Bayley's তাঁর 'Jullamootah Report'-এ বলেছেন, ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বীরকূল ময়ূরভঞ্জের রাজার অধীনস্থ করদ জমিদাররা শাসন করতেন। বিসমিল্লা সাহিবের ফার্সী হস্তলিপি অনুযায়ী, তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বশীভূত করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন এবং বীরকূল অধিকারে আনেন।), ১১) আগ্রা চৌর, ১২) মীরগোদা, ১৩) ভোগরাই।[৪]

সদর রেভিনিউ বোর্ডের হিজলির দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর ক্রোমলিন (Crommelin) ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবরের চিঠির বক্তব্যকে ভিত্তি করে জলামুঠা জমিদারির আসল প্রতিষ্ঠাতাকে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ক্রোমলিনের বক্তব্য অনুসারে ভীমসেন মহাপাত্রের মৃত্যুর পরে হিজলির দুটো খাস জমিদারির মধ্যে জলামুঠা পেল তাঁর পাচক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ পণ্ডা এবং মাজনামুঠা পেল তাঁর হিসাবরক্ষক ঈশ্বরী পট্টনায়ক। যদিও 'খেজুরির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক বৃহস্পতি মণ্ডলের মতে এ তথ্য ঠিক নয়। তার মতে ভীমসেন হিজলি রাজ্যের অধিপতিই ছিলেন না। সুতরাং তাঁর পরের প্রজন্ম (ইতিহাসে অনুল্লিখিত) বা প্রিয় পাত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগের প্রশ্ন উঠে না। আবার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসুর মতে বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পরে ভীমসেনও আত্মহত্যা করেছিল। হিজলীর মসজিদে রক্ষিত কাগজপত্রে বাহাদুর খাঁর দেওয়ান হিসাবে ভীমসেনের নামই আছে; তবে ওই কাগজপত্রগুলিতে মাজনামুঠার প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরী পট্টনায়েক বা জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপণ্ডা নামক অন্য কোন কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়নি। মাজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারীর কোন উল্লেখই পাওয়া যায়নি; কেবল দেখা যায় যে, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী রাজ্য দুই জন হিন্দু কর্মচারীর হস্তগত হয়েছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারগণ মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টরকে যে বংশ বিবরণ দিয়েছিল, তাতেও ঐ জমিদারী দুইটির প্রতিষ্ঠাতাগন ভীমসেন মহাপাত্রের কর্মচারী ছিলেন; বাহাদুর খাঁর নয়। এই বিভ্রমের কারণ বোঝার জন্য বেলী প্রদত্ত ক্রোমলীনের চিঠির বিষয়বস্তুটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। চিঠিটি শুরু হয়েছে ভীমসেন মহাপাত্রের অনুষঙ্গ দিয়ে। তখন বাহিরিতে হিজলি রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পরে গোপীনাথ পট্টনায়ক বংশের সমাপ্তি ঘটে। তারপরেই খুব সম্ভব ঐ বংশীয় বলভদ্র মহাপাত্র বাহিরি রাজ্যের রাজা হন। তাঁর পিতৃব্য বিভীষণ মহাপাত্র বাহিরিতে জগন্নাথ দেউল স্থাপন করেন ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই বংশীয় রাজপুরুষ ছিলেন ভীমসেন মহাপাত্র। বাহিরিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভীমসাগর পুষ্করিণী এখনও আছে। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দের পরে পরে বলভদ্র মহাপাত্রের রাজত্বের অবসান হয়। ধরে নেওয়া যায়, ভীমসেন তখন নিশ্চয় যুবক। রাজবংশীয় এবং রাজকার্যে নিপুন ভেবে ইখতিয়ার খাঁ ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের পরে ভীমসেন মহাপাত্রকে রাজ্যের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। তখন তাঁর বয়স নিশ্চয়ই বেশ পরিপক্ক। একই সঙ্গে ইখতিয়ার খাঁ মাজনামুঠার দ্বারকা দাস ও জলামুঠার দিবাকরকে সহকারী মন্ত্রীর পদে বহাল করেন হয়তো ভীমসেনের সুপারিশে। এঁরা সবাই মূলত উড়িষ্যা থেকে আগত; কারন পট্টনায়ক, মহাপাত্র এবং পণ্ডা, সবই উড়িষ্যার পদবী। বংশলতিকা অনুসারে মাজনামুঠা ঈশ্বরী পট্টনায়কের সময়কাল শুরু

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ভীমসেন মহাপাত্র বাহিরি রাজবংশীয়। সুতরাং তাঁর আলাদা সরকার বা গোমস্তা (house-clerk) হিসাবে ঈশ্বরী পট্টনায়ক এবং পাচক হিসাবে ওড়িশার ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ পণ্ডার নিযুক্তি হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে, যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করে ঈশ্বরী পট্টনায়ক ও কৃষ্ণ পণ্ডা যথাক্রমে মাজনামুঠা এবং জলামুঠা কিনে ফেলেন। বাহিরি অঞ্চলের নামও ছিল বাহিরিমুঠা। সম্ভবত দেখা দেখিতে যুক্তি করে একই সঙ্গে দুজনে জমিদারি কিনেছিলেন, যেহেতু একই পরিবারে কাজ করতেন। কৃষ্ণ পণ্ডার পুত্র বীরুও অর্থ প্রতিপত্তির কারনে মোঘলদের থেকে 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করে। 'পণ্ডা' পদবী পরিবর্তিত হয়ে উপাধিই পদবী হয়ে যায়। সম্ভবত, প্রথম দিকে দুটো জমিদারির পরিসর ছিল ছোট। পরিসর বেড়েছিল তাজ খাঁর অধীনে খাসতালুক হবার ফলে। ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইকতিয়ার খাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস রাজত্বের পর তাঁর পুত্র দাউদ খাঁর মৃত্যু এবং শেষে তাজ খাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো, অসীম সাহসী ও শক্তিধর ভ্রাতা সেকেন্দার খাঁর সাহায্যে রাজ্য বিস্তার। এই সময় মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারিও বাহিরিমুঠা সহ তাজ খাঁর হিজলি রাজ্যের অধীনে আসে। দ্বারকা দাস এবং দিবাকর রাজদরবারে মন্ত্রী থাকায় হয়তো ক্ষতিপূরণ পেলেন। কিন্তু জমিদারি হস্তচ্যুত হওয়ায় দুজনের মনে প্রতিহিংসা বাড়তে থাকে। দুজনেই সুযোগের অপেক্ষায় প্রায় কুড়ি বছর অতিবাহিত করলেন। তাজ খাঁর শক্তিকেন্দ্র সেকেন্দার খাঁ, যাকে সরাতে পারলেই তাজ খাঁ ভেঙে পড়বেন এবং হলোও তাই। ১৬৪৮ - ৪৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বারকা ও দিবাকরের ষড়যন্ত্রে সেকেন্দারের মৃত্যু হয়। ভাইর মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে তাজ খাঁ অমর্যি কসবায় হজরৎ-মখদুম-শেখ-উল- মশায়েখ-শাহ-আবুল-হক-উদ্দীন-চিশতির কাছে ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন পরে তাজ খাঁ এবং ভীমসেনের মৃত্যু হয়। তবুও এঁদের অপেক্ষা করতে হয় ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাহাদুর খাঁর পতন পর্যন্ত।[৫]

জলামুঠা জমিদারী ও বাসুদেবপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণ পণ্ডা। ১৫৮৪ থেকে ১৬০৮ সাল পর্যন্ত তিনি জমিদার ছিলেন। রাজা কৃষ্ণ পণ্ডা নিজের নামে খেজুরী থানার অধীনে ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'কৃষ্ণনগর' নামক জনপদ বা রাজধানী স্থাপন করে প্রথমে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি এগরা থানার গড় বাসুদেবপুরে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখান থেকেই তাঁর রাজকার্য পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ চৌধুরী (১৬০৫-১৬৪৫) কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল (১৬৪৫-৮৫), হরিনারায়ণের পুত্র দিবাকর (১৬৮৫-৯৪), জমিদারী ভোগ করেন। এই বংশে যিনি জমিদার হতেন তিনি মোঘলরাজ প্রদত্ত 'চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার করতেন। অন্য ভাইদের উপাধি থাকত 'রায়'। দিবাকরের দুই পুত্র ছিল, রামচন্দ্র ও বিক্রমকিশোর। রামচন্দ্রের (১৬৯৪-১৭৩৪) পুত্র না থাকায় ছোট ভাই বিক্রমকিশোরের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ জমিদার হন। তার সময় (১৭৬৪) মারাঠারা জলামুঠা অধিকার করে। ১৭৭০ সালে ইংরেজ শক্তি মারাঠাদের কাছ থেকে সেই জমিদারি অধিকার করে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়নের পুত্র বীরনারায়ণের হাতে অর্পণ করে। এই সময় ইংরেজ সরকার জলামুঠার জমিদারদের 'রাজা' হিসাবে ঘোষণা করেন। ইংরেজরা এই বংশের সাথে জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। জমিদার হন বীরনারায়ণ। চৌধুরীর বদলে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। বীরনারায়ণের পর

(১৭৯৭) তার পুত্র নরনারায়ণ রাজা হন। নরনারায়ণ রাজা হয়ে দীর্ঘ চার দশকের বেশি, ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত রাজকার্য সম্পন্ন করে। সুশাসক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর। জেলার সমাজজীবন এবং শাসনপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার জন্য ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. স্ট্রেচী সাহেবকে যে চল্লিশটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তরে সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের তালিকায় আঠারো জনের মধ্যে বাসুদেবপুরের এই জমিদার নরনারায়ণ রায়ের নামও অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন স্ট্রেচীসাহেব। তাঁর মৃত্যু সংবাদ সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এর ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।[৬] নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তার দুই স্ত্রীর দ্বিতীয়া স্ত্রী ও প্রথমা স্ত্রীর পুত্রকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর মামলা উপস্থিত হয়। নরনারায়ণের মৃত্যুকালে তাঁর প্রথমা স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। পিতার মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে প্রথম পুত্র হিসাবে রুদ্রনারায়ন সমুহ জমিদারির অধিকার দাবী করে সদর দেওয়ানী আদালতে একটি মোকদ্দমা দাখিল করেন। এসময়ে দ্বিতীয়া রানী কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁর দুই পুত্রের নামে জমিদারির অধিকার প্রদানের জন্য কালেক্টর সাহেবের কাছে আবেদন করেন। কালেক্টর সেই আবেদন অগ্রাহ্য করলে, রাণী কমিশনারের কাছে আপীল দাখিল করেন। সেই দরখাস্তখানিও অগ্রাহ্য হলে রুদ্রনারায়ণই জমিদার সাব্যস্ত হন। অর্থাৎ রাজা নরনারায়নের প্রথমা পত্নীর সন্তান রাজা রুদ্রনারায়ন চৌধুরী ১৮৩৯ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত জমিদারি ভোগ করেন। কিন্তু রুদ্রনারায়ণের কপালে তাঁর পূর্বপুরুষদের মত দীর্ঘকাল জমিদারি ভোগ ছিলনা। মাত্র দশ মাস জমিদারি চালানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু নিয়ে বহুনাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। শোনা যায়, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি রুদ্রনারায়ণের। নিজের দুই পুত্রকে জমিদারি প্রদান করতে না পেরে, বিমাতা কৃষ্ণপ্রিয়াই তাঁকে বিষ প্রয়োগ করিয়ে হত্যা করেন।[৭]

সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে এই ঘটনা ছাপা হয়েছিল । রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর দুই বৈমাত্রেয় ভাই কৃষ্ণেন্দ্র ও কুমারেন্দ্র সমান অংশে জমিদারি ভাগ করে নেন। তাঁদের জমিদারিত্বের ঠিক দুই বছর বাদে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে সরকার তরফে আবেদন করেন যে, রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়নি, তিনিই সেই ব্যক্তি। অতএব বাসুদেবপুর জমিদারি তাঁকে ফেরত দেওয়া হোক। এসম্পর্কে বহু জনশ্রুতি এবং সংবাদপত্রের মুদ্রিত রিপোর্ট আছে। পুরাতন সংবাদপত্রের সন্ধানকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ একটি মুদ্রিত বিবরণটি দেখতে পেয়েছিলেন, পরে সেটি তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১৩৪১সনের পূজা সংখ্যায় প্রকাশও করেন।[৮] ঘটনাটি হল বিষক্রিয়ায় মৃত রুদ্রনারায়ণের দাহকার্যের জন্য তাঁর দেহ সাগর তীরে পাঠিয়েছিলেন রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া। যেসময় চিতা তৈরি হচ্ছে, সেসময় মহা ঝড় দেখা যায়। মৃতদেহ ফেলে সমস্ত লোক সমুদ্রতীর থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ঝড়ের পর দুই সন্ন্যাসী সেই পথে যাওয়ার সময় রুদ্রনারায়ণের পরিত্যক্ত দেহ দেখতে পান। তাতে নাকি তখনও প্রাণ ছিল। পরে ওষধি প্রয়োগ করে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনেন তাঁরা। নবজীবন লাভ করে রুদ্রনারায়ণ সন্ন্যাসীদের সাথে পশ্চিমাঞ্চল পরিক্রমায় চলে যান। এভাবে দুই বছর পরে, রুদ্রনারায়ণ দেশে ফিরে আসেন এবং রাজবাড়িরই একাংশে অবস্থান করে সরকারি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমিদারি ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া

সাথে সাথেই তাঁকে কারারুদ্ধ করে ফেলেন। সেই ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে যশোহরের রাজা বরদাকণ্ঠ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। তার ফলে রুদ্রনারায়ণ কারামুক্ত হন বটে, রাজ্যপ্রাপ্তি তাঁর কপালে ঘটেনি। ৪৫ জন সাক্ষীকে উপস্থিত করে মেদিনীপুর সদর আমিন আদালতে নিকটে তিনি যে নালিশ রুজু করেছিলেন, তা খারিজ হয়ে যায়। এরপরে তিনি একটা আপীলও করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। অত:পর চিরকালের জন্য দেশান্তরী হয়ে চলে যান রুদ্রনারায়ণ নামের সেই ব্যক্তি)। রাজা রুদ্রনারায়ন চৌধুরী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বৈমাত্রেয় (রানি কৃষ্ণপ্রিয়া) ভ্রাতৃদ্বয় কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ও কুমারেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকারী হন এবং তাঁরা জমিদারী বা রাজসম্পত্তি উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেন। কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ খেজুরী থানার কৃষ্ণনগরে বসবাস করে সেখান থেকেই তাঁর রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। আর অনুজ কুমারেন্দ্রনারায়ণ এগরা থানার গড় বাসুদেবপুর থেকেই তাঁর রাজকার্য পরিচালনা করেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কাঁথি মহকুমা সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উল্লিখিত ১৪টি পরগনার বস্তুতঃ রাজধানী হওয়ার সুবাদে গড় বাসুদেবপুরেও ঐ খ্রীষ্টাব্দেই (১৮৫২) প্রথমে থানা, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস, কয়েদীদের জন্য বন্দীশালা বা জেলখানা প্রভৃতি স্থাপিত হয়ে সুদীর্ঘকাল চলেছিল। পরবর্তীকালে, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে, বাসুদেবপুর থানা এলাকার অধীন সমস্ত গ্রাম ও অঞ্চলকে এগরা থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে বাসুদেবপুরে অবস্থিত থানা ও কারাগার তথা বন্দীশালা এগরায় স্থানান্তরিত হয় এবং সাবরেজিস্ট্রী অফিসসহ অন্যান্য অনেক সরকারি অফিস ধীরে ধীরে এগরা থানা শহরে অবস্থিত অফিসগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়)। রাজা নরনারায়নের ঔরসজাত রানি কৃষ্ণপ্রিয়া গর্ভে চন্দ্রামনি নামে এই বংশের প্রথম কন্যা সন্তানের জন্ম হয় (এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে)। যাকে গড় বাসুদেবপুরের পণ্ডিত কেনারাম রথের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃষ্ণনগরে ১৮৪০ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য কাজ পরিচালনা করে। কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর জমিদারি পান তাঁর পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ। উচ্চশিক্ষিত হলেও রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অত্যধিক বিলাসি এবং চরিত্রহীন ব্যক্তি। তার কারণে একদিন বিপুল ঋণ, বিধবা রাণী আনন্দময়ী এবং নাবালক দত্তকপুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণকে রেখে ১৮৭৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সমস্ত দেনা পরিশোধ করে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস ১৮৯৭ সালে ভূপেন্দ্রনারায়ণকে তাঁর সম্পত্তি ফেরত দেয়। কিন্তু তিনিও বিলাসিতা ও অন্যান্য কারনে ঋণের দায়ে জমিদারি নীলামে তুলে ফেলেন। তখন কুমারেন্দ্রের বিধবা পত্নী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী সেই সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করে বাসুদেবপুর জমিদারির ষোল আনা অংশের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এর কিছু পরে ভূপেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হলে, তাঁর বিধবা পত্নী শরৎ কুমারী দেবী কৃষ্ণনগর গ্রামের ঠাকুরবাড়িতে দেবসেবায় নিযুক্ত থেকে বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করে। অন্যদিকে রাজা কুমারেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী গড় বাসুদেবপুরে ১৮৪০ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত রাজ্যভার সামলায়।

নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত মুক্তচেতা রাজা কুমারেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে গড় বাসুদেবপুরে প্রথমে একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয় বা Middle Vernacular School প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে 'Model School' এই নামের একটি Anglo

Vernacular School এ পরিণত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী বিদ্যোৎসাহিনী রাণী হরিপ্রিয়া তাকে Middle English School এ রূপান্তরিত করেন। এরপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গড় বাসুদেবপুর রাজভবনে আমন্ত্রিত রাজা দুর্গাদাস রায় ও সভাপণ্ডিত রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত ও অনুরুদ্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও তৎকালীন হিন্দু মহাসভার সভাপতি, শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তথা তাঁর সবল হস্তক্ষেপের ফলেই এই Middle English School টি High English School রূপে উন্নীত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত হয় এবং সেই বছর (১৯৪০) থেকেই তা 'বাসুদেবপুর হরিপ্রিয়া ইনস্টিটিউশন' এই নামে নামান্তরিত হয়।[৯] কুমারেন্দ্রনারায়ণ অকাল মৃত্যুতে নিঃসন্তান রানী হরিপ্রিয়া ১৮৭১ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত দত্তক পুত্র রাজা যোগেশনারায়ণ রায়ের শাবালক না হওয়া রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয়। রাণী হরিপ্রিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ রমণী। ভূপেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তি নিলামে উঠলে, বংশের সম্পত্তি তিনি বেহাত হতে দেননি। সমূহ সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলেন। নিজের শাসনকালে একবার অর্থাভাবে খাজনা বাকি পড়লে মহলে মহলে লোক পাঠিয়ে তিনি তিন বছরের আগাম খাজনা সংগ্রহ করেছিলেন। লাঠিয়াল বরকন্দাজদের পাহারায় হাতির পিঠে চাপিয়ে বস্তা বস্তা সেই টাকা পাঠালেন সদর কাছারিতে। তখন সূর্যাস্ত আইনের ফলে জমিদারি বেহাত হওয়ার ভয় সব জমিদার পরিবারেই ছিল। বিকেলে যখন তাঁর দেওয়ান কাছারিতে পৌঁছল, কাছারির খাজাঞ্চি বলে দিল- 'এত টাকা গুনতেই রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যাবে; সুতরাং টাকা আজ নেওয়া হবে না'। রাণীমা দেবতার মন্দিরে ঢুকে পণ করে বসে আছেন, খাজনা জমা না হলে, জলস্পর্শও করবেন না। রাণীর দেওয়ান ছিলেন প্রখর বুদ্ধির মানুষ। খাজাঞ্চির সাথে কোন বিতর্কে গেলেন না। সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে গিয়ে বস্তাগুলি নামিয়ে দিয়ে আড়চোখে সূর্যের দিকে চাইলেন একবার। সূর্যদেব তখনও আকাশে। তাতেই কাজ হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সব টাকা গুণে তুলে খাজনা জমা হল। সে সংবাদ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে রাজবাড়িতে এসে হাজির হল ঘোড়সওয়ার। রাণীমা তখন দেবতাকে প্রণাম করে জলপান করলেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামের সুপ্রাচীন, প্রাচ্য সংস্কৃতিসেবী ও সম্ভ্রান্ত দানশীল 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ' বংশের শুল্ক যজুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় 'মহাপাত্র' পরিবারের জমিদার গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীমতী হৈমবতী দেবীর সন্তান হলেন রাণি হরিপ্রিয়া। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময়কার প্রচলিত সামাজিক রীতি বা প্রথানুযায়ী হরিপ্রিয়ার বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখন তাঁর সঙ্গে চতুর্দশবর্ষীয় কুমারেন্দ্রনারায়ণের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়)। রাণী হরিপ্রিয়ার দত্তক পুত্র রাজা যোগেশনারায়ণ হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত বামনদা গ্রামের 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ' বংশীয় সুখ্যাত ও সম্পন্ন 'পতি' পরিবারের সন্তান।[১০] গড় বাসুদেবপুর রাজবংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন রানী হরিপ্রিয়া দেবী। তার আমলেই গড় বাসুদেবপুরের নাম, যশ, কীর্তি, বাংলায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সময়কালীন বাংলার নবজাগরনে উদ্দিপিত এই সাহসিনী নারী স্বামী কুমারেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। গড়

বাসুদেবপুর রাজসভার পণ্ডিত তথা রাজ-টোলের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত রামকুমার চূড়ামণি, পণ্ডিত গুরুচরণ শিরোমণি ও পণ্ডিত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এবং পাঁচরোল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত মধুসূদন চূড়ামণি ও পণ্ডিত দীননাথ বিদ্যালঙ্কার। গড় বাসুদেবপুরের 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ' বংশজ রাজা কুমারেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজত্বকাল ১৮৪০ ১৮৭১) এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী, সংস্কৃত ও প্রাচ্য সংস্কৃতি অনুরাগিণী রাণী হরিপ্রিয়ার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ও অনুপ্রেরণায় এবং তাঁদের অনন্য সৎসাহসের ফলে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, এমনকি তৎকালীন বাংলার সমাজপতিদের ও পণ্ডিত সমাজের একাংশের সামাজিক বয়কটের হুমকি উপেক্ষা করেও, উল্লিখিত পাঁচজন খ্যাতকীর্তি 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' তথা টোলের অধ্যাপক পুণ্যশ্লোকা মহামহীয়সী রানি রাসমণির (২৪.৯.১৭৯৩ থেকে ১৯.২.১৮৬১) সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে (১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার) শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিনে নিত্য অন্নভোগাদি প্রদানসহ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের পুণ্য প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১১] এই মহোৎসবে উপস্থিত অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে এই পাঁচজন উদারচিত্ত পণ্ডিত তথা টোলের অধ্যাপককেও লোকমাতা রানি রাসমণি যথাযোগ্য অভ্যর্থনায়, সেবায় ও সমাদরে এবং ভোজনে, দানে ও দক্ষিণায় বিশেষভাবে পরিতুষ্ট করেন এবং রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় ও বিদায়কালে তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা শ্রদ্ধাবনতশিরে স্বহস্তে দান করে তিনি দ্বিজভক্তির এক উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। (প্রসঙ্গত, এর আগে রানি রাসমণিকে 'কৈবর্ত' (মাহিষ্য) ও শূদ্রাণী ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রচলিত সামাজিক প্রথানুযায়ী তথাকথিত 'স্বনামখ্যাত' বহু 'গোঁড়া' বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংস্কৃত পণ্ডিত তথা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও সমাজপতিরা রানির সংকল্পিত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নিত্য অন্নভোগদানের কাজকে 'অ-শাস্ত্রীয়' ও 'অনুমোদনযোগ্য নয়' বলে বিধান দিয়েছিলেন)।[১২] জলামুঠা রাজপরিবারের অনন্য পৃষ্ঠপোষকতায়, বিশেষত সমাজ ও রাজনীতিসচেতন রানি হরিপ্রিয়ার সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফলেই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এগরা থানার গড় বাসুদেবপুরে ও সংলগ্ন বেতা (মহেশপুর) গ্রামে এবং খেজুরি থানার কৃষ্ণনগর জনপদে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন Indian Association বা 'ভারতসভার' তিনটি শাখা বা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঁথি থানার বসন্তিয়া হাইস্কুলের সম্মুখভাগে অবস্থিত সুবৃহৎ, 'রানি পুকর' এবং রামনগর থানার সংস্কৃত ও প্রাচ্য সংস্কৃতিচর্চার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র 'রানিসাহী' গ্রামও রানি হরিপ্রিয়ারই পুণ্যস্মৃতি বহন করে। ভুপতিনগর থানার জুখিয়ায় অবস্থিত রাধাগোবিন্দের বিখ্যাত 'নবরত্নমন্দির' -এর সর্বাঙ্গীণ সুশোভন সংস্কারও পুণ্যশ্লোকা দানশীলা রানি হরিপ্রিয়া কর্তৃকই সুসম্পন্ন হয়, ১৮৯১ - ১৯০১ এই দশবছরে। এই মন্দির সংস্কারের এক লিপি মন্দিরগাত্রে পাওয়া যায়, যেখানে রানী হারিপ্রিয়া, ম্যানেজার নন্দলাল রায় ও মিস্ত্রি লক্ষ্মীনারায়ন গিরির নাম উল্লেখ আছে। উক্ত লিপিটি হল -

"এই নবরত্ন মন্দীর বহু পুরাকালে সর্গীয়
মহারাজা কতৃক প্রস্তুৎ হইয়াছিল বহু
দিনান্তে মন্দিরের অবস্তা অতিশয় খারাপ

হয়ায় তাহা প্রশংসীত শ্রীল শ্রীমতি রানি
হরিপ্রিয়া দেবী জমিদার স্টেট জলা
নূতন গঠন হইয়া মেরামত কার্য্যাদি সমা
ধা করাইয়াছেন উক্ত কার্য্য সন ১২৯৮ সাল
হইতে সন ১৩০৮ সাল প্রজন্তে শেষ হইল
মেনাজার শ্রীযুক্তবাবু নন্দলাল রায়
মিস্ত্রী শ্রী লক্ষ্মীনারান গিরি”।[১৩]

এছাড়াও তিনি কাঁথি মহকুমার নানা স্থানে আরও বহু দেব মন্দির নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেন। আধুনিক শিক্ষার জন্য হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংস্কৃত শিক্ষা এবং সনাতন হিন্দুধর্মের পঠনপাঠনেও তিনি তৎপর হয়েছিলেন। ‘রাজকীয় দর্শন চতুষ্পাঠী’ নামে সংস্কৃত শিক্ষার টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। রাণী হরিপ্রিয়ার অনুরোধে স্বনামধন্য পণ্ডিত রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব প্রধান সভাপণ্ডিত হয়ে এসেছিলেন বাসুদেবপুর গড়বাড়িতে। তিনিই এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর অত্যন্ত খ্যাতির সাথে বিরাজ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। কেবল এই জেলা বা রাজ্যই নয় কয়েক শতাব্দী ধরে অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, কেরল, মাদ্রাজ, (তামিলনাড়ু) প্রভৃতি অঞ্চলের অগনিত বিদ্যার্থী জাতি-বর্ণ ও পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে এই সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশ্রুতনামা অধ্যাপকগণের সান্নিধ্যে থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন (শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ দ্বৈত বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্ত), কপিলের সাংখ্য দর্শন, জৈমিনির মীমাংসা দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, গৌতমের ন্যায় দর্শন, পতঞ্জলির যোগ দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন বা ভক্তিশাস্ত্র, বিভিন্ন স্মৃতি (উৎকলীয় নব্যস্মৃতি, বঙ্গীয় নব্য স্মৃতি ও প্রাচীন স্মৃতি), কাব্য (সাহিত্য, অলঙ্কার ও ছন্দ), বিভিন্ন ব্যাকরণ (পানিনি, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, লঘুকৌমুদী, প্রক্রিয়াকৌমুদী, সিদ্ধান্তকৌমুদী, হরিনামামৃত, সারস্বত ও চন্দ্রিকা ব্যাকরন), আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ, পৌরোহিত্য বা কৃত্যশাস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রাচ্য শাস্ত্র সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করতো। রানী হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর জমিদারির অধিকার পান দত্তক পুত্র যোগেশনারায়ণ রায়। ১৮৭৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত তিনি জমিদারির শাসনভার বহন করেন। রানী হরিপ্রিয়ার পুত্র যোগেশনারায়ণ রায়ের সঙ্গে সুবোধবালার বিবাহ দেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে যোগেশনারায়ণ যখন মারা যান, তখন তাঁর বিধবা পত্নী সুবোধবালার দুটি পুত্র ও এক কন্যা (বর্তমান খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত সুপ্রাচীন বনপাটনা জনপদের ‘কৃষ্ণ যজুর্বেদী’ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের জমিদার রায়বাহাদুর গজেন্দ্রনারায়ণ শতপথী ও শ্রীমতী কুমুদমণি দেবীর একমাত্র কন্যা হলেন রানি সুবোধবালা। এঁর পিতামহ হলেন জমিদার ব্রজমোহন সতপথী, পিতামহী, শ্রীমতী সত্যমণি দেবী। প্রপিতামহ জমিদার রাজীবলোচন শতপথী)। রানী হারিপ্রিয়ার মৃত্যুকালে পুত্র দুর্গাদাস অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ফলে তাঁদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত মহালগুলি সহ অন্যান্য সম্পত্তিও কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হাতে গিয়ে সরকারের খাসমহালের অধীনে যায়। যোগেশনারায়ণের কন্যার

নাম প্রমোদাসুন্দরী দেবী। তাঁর স্বামী ছিলেন বলাগেড়িয়ার স্বনামধন্য স্বদেশপ্রেমী জমিদার সুরেন্দ্রনাথ নন্দ। তাঁদের বলাগেড়িয়ার বাড়িতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের যাতায়াত ছিল বলে জানা যায়। দুর্গাদাসের পত্নীর নাম সাবিত্রী দেবী। তাঁদের চারজন সন্তান কেশবচন্দ্র, শতাব্দী, দেবেশচন্দ্র এবং রীতাদেবী।

গড় বাসুদেবপুরের সমগ্র রাজপরিবারই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য, সমর্থন ও উৎসাহ দান করে এসেছেন। এই রাজ পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন গড় বাসুদেবপুরের স্বনামধন্য চক্রবর্তী পরিবার। এই চক্রবর্তী পরিবারের সদস্য ও রাজ পুরোহিত রাধামোহন চক্রবর্তীর পুত্র, পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় ভগবানপুর থানা দখল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন (১৯১৮-২৮.৯.১৯৪২)। জ্যেষ্ঠতাত (জ্যাঠা) স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রজমোহন চক্রবর্তী, ১৯০৫-১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে অখণ্ড কাঁথি মহকুমায় নেতৃত্ব দান করে এবং পরবর্তী আন্দোলনগুলিতেও, বিশেষত বিদেশি বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলনে, মেদিনিপুরে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী সৌদামিনী পাহাড়ী ও রাজপরিবারের উদ্যোগে ও ব্যাপক উপস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর মহৎ আদর্শ ও কর্মসূচী সামনে রেখে কাঁথি মহকুমার অন্যান্য স্থানের মত গড় বাসুদেবপুরে ও (গড় বাসুদেবপুর রাজ এস্টেট্ পরিচালিত) সাতমাইল বাজার এলাকায় এবং তাজপুর (পাকার ঘাট), টোলাকানা, বালিঘাই, নিয়ারী, দুবদা, তেলামী, ভবানীচক বাজার (উত্তর বাসুদেবপুর), আলংগিরি, পাঁচরোল, জেড়থান, দুলালপুর (বাসুদেবপুর), নস্করপুর (পশ্চিম বাসুদেবপুর), চোরপালিয়া, বিদুরপুর, শীপুর, রুক্মিণীপুর, পানিপারুল, সাতখণ্ডিয়া, সোলপাট্টা, এগরা বাজার প্রভৃতি নানা স্থানে অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একসঙ্গে পংক্তিভোজন ও দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার, মাদক বর্জন, নারীশিক্ষা, খাদি ও কুটির শিল্পের প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি সমাজসংস্কার ও সমাজ-পুনর্গঠনমূলক বিষয়ে বহু বৃহৎ জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গড় বাসুদেবপুরের স্বদেশপ্রেমী রাজ পরিবারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন 'চোরা কুঠরি' গুলিতে (তথা সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কয়েদীদের জন্য নির্মিত ও ব্যবহৃত, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে পরিত্যক্ত জেলখানা বা বন্দিশালার ঘরগুলিতে) স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্রিটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বা নজরদারি এড়িয়ে বহু বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা আত্মগোপন করে থাকতেন এবং এইভাবে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, নিরাপত্তা ও আহারাদি পেতেন। ১৯৪২ -এর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের সময় গড়বাসুদেবপুর হরিপ্রিয়া ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণেই স্থাপিত হয় এগরা থানা সমর পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর অন্যতম প্রধান কার্যালয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে রাজা দুর্গাদাস রায়ের আন্তরিক উদ্যোগে ও আহ্বানে এবং সভাপণ্ডিত নিখিলশাস্ত্রাধ্যাপক রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত, সক্রিয় সহযোগিতায় বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিকল্পে এবং অস্পৃশ্যতা

বর্জন, ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'হরিজন' ও 'নিম্নবর্ণের' হিন্দুদের বাড়িতে যজন যাজনাদি দৈবকর্ম সম্পাদন এবং তাঁদের দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার, পংক্তিভোজন, বিধবা বিবাহ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি নানা সামাজিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট এবং সফল ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গড় বাসুদেবপুর রাজপরিবারের লোকজন যে কত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ও প্রগতিশীল ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরন হল এঁদেরই সক্রিয় উদ্যোগে, বিশেষতঃ গান্ধী-অনুরাগিণী এবং চরকা ও খাদিভক্ত রাণি সুবোধবালা ও তাঁর একমাত্র পুত্র রাজা দুর্গাদাস রায়ের ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড় বাসুদেবপুর রাজ টোল দর্শন চতুষ্পাঠীর সম্মুখে (পশ্চিমে) ও ভদ্রকালী পুষ্করিণীর উত্তরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বহু বছর ধরে কৃষি এবং হস্তশিল্পসহ কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিরাট মেলা পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হতো। এতে স্থানীয় ও বহিরাগত সহস্র পুরুষ ও মহিলা, দর্শক ও শিক্ষার্থী হিসেবে, সোৎসাহে ও সানন্দে যোগ দিতেন। স্বাধীনতার আগে বিশেষ বিশেষ দিনে এবং স্বাধীনতার পরে (১৫ই আগষ্ট তারিখে) প্রতি বছর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন দুর্গামণ্ডপ বা দুর্গা নাটমন্দির প্রাঙ্গণে স্থানীয় স্বদেশপ্রেমী পুরুষগণ চরকায় সুতা কাটতেন। আর রাজবাটির অভ্যন্তরে দেওয়ান খানায় চরকায় সুতা কাটতেন গান্ধীবাদী মহিলাগণ। (স্বাধীনতার আগে) এঁদের সঙ্গে মাতৃসমা সর্বজনশ্রদ্ধেয়া রাণি সুবোধবালাও (৫.২.১৮৯৬-১৫.১.১৯৪৭) নিজে চরকায়সুতা কেটে সকলকে এইভাবে সূত্রযজ্ঞে তথা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতেন।

চারশো বছরের ঐতিহ্যবাহী মানবহিতৈষী গড় বাসুদেবপুর রাজপরিবার জনসাধারণের জন্য নানা ধরনের সৃজনশীল কল্যাণকর্ম সম্পাদন করেছেন। রাজপরিবারের অধিকারে থাকা ১৪ টি পরগণার নানা স্থানে বহু প্রসিদ্ধ মন্দির এবং পথঘাট ও সেতু নির্মাণ, জনসাধারণের জন্য পানীয় জল সরবরাহ ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশাল বিশাল পুষ্করিণী ও দীঘি খনন, পাতকুঁয়া ও নলকূপ খনন, প্রচুর বৃক্ষ রোপণ, ফল ও ফুলের বহু রমণীয় উদ্যান রচনা, রাজবাটীর চারপাশে নৌকা পরিবহনযোগ্য বিশাল পরিখা বা 'গড়খাই' খনন, নিকাশী ব্যবস্থার জন্য অনেক খাল খনন, শিক্ষা বিস্তারকল্পে চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম এই রাজপরিবারের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এই রাজপরিবারের উদ্যোগে বাসুদেবপুর গ্রামে খনন করা হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশাল 'ভদ্রকালী পুষ্করিণী', পদ্মপুষ্প সুশোভিত বিশালায়তন 'ইন্দুমতী পুষ্করিণী' এবং তার চারপাশে প্রস্তুত ৪টি সুবিস্তৃত খেলার মাঠ, গ্রামের শ্মশানসংলগ্ন উত্তর প্রান্তে খনন করা হয় বিরাট 'পণ্ডা পুষ্করিণী', চিরকুমুদ্বতী 'বচ্ছিপুর পুষ্করিণী' এবং এই রাজপরিবার প্রদত্ত সুবৃহৎ ভূমিখণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবপুর থানা, জেলখানা, সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি এবং রাজ টোল (দর্শন চতুষ্পাঠী), প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় (হরিপ্রিয়া ইনষ্টিটিউশন), উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত রাজপরিবারের মহিলা সদস্যদের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ও চুতষ্পার্শ্বে রচিত চিত্তহারী পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত অতি সুন্দর সরোবর প্রভৃতি। এছাড়াও, সাধারণ মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য রামনগর থানার অন্তর্গত সুপ্রাচীন ও বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত মৈতনা গ্রামের সুবিখ্যাত 'সপ্তভগিনী মন্দির' ও 'শিব মন্দির' সংলগ্ন সুবিশাল 'রাম সরোবর' খননও গড় বাসুদেবপুর রাজবংশের অক্ষয় কীর্তি। গড় বাসুদেবপুরের

রাজাদের এক অবিনশ্বর ঐতিহাসিক কীর্তি হল এখানকার জগন্নাথ মন্দির, রামচন্দ্রমন্দির, শিবমন্দির, দুর্গামন্দির ও ভদ্রকালীমন্দির। খুব সম্ভবত গড় বাসুদেবপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কৃষ্ণ পণ্ডার প্রথম প্রপৌত্র রাজা রামচন্দ্র চৌধুরী (রাজত্বকাল: ১৬৯৪-১৭৩৪) সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ওড়িশার শ্রীক্ষেএ পুরীধামের জগন্নাথমন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর অনুকরণে গড় বাসুদেবপুরেই সুবিখ্যাত ও বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী জগন্নাথমন্দির ও তৎসংলগ্ন শ্রী শ্রী রামচন্দ্র মন্দির এবং তার সম্মুখে তথা পূর্বদিকে অবস্থিত শিবমন্দির নির্মাণ করেন ও মহাসমারোহে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন। গড় বাসুদেবপুরের এই জগন্নাথদেবের মন্দিরটি পূর্বমুখী পীড়া জগমোহনসহ নবরথ শিখর দেউল। মন্দিরটিতে পঞ্চ পলেস্তারার অলঙ্করণ রয়েছে। মন্দিরের সংলগ্ন জগমোহনবেশ প্রশস্ত, তারপরে নাটমন্দির। শীর্ষে খাঁজকাটা আমলকের উপর তিনটি কলস ও বিষ্ণুচক্র। গর্ভমন্দিরে বৃহদাকৃতি বলরাম সুভদ্রা জগন্নাথদেব। মন্দির সম্মুখে তুলসীমঞ্চ ও উত্তর ভাগে স্নানমঞ্চ। বেদিটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৭০ ফুট ও ৩০ ফুট এবং উচ্চতায় ২.৫ ফুট। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট। জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০ ফুট ও ১৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৩ ফুট।[১৪] পূর্বমুখী পীড়া জগমোহনসহ নবরথ শিখর দেউল। মন্দিরটিতে পঞ্চ পলেস্তারের অলঙ্করণ রয়েছে। মন্দিরের সংলগ্ন জগমোহনবেশ প্রশস্ত, তারপরে নাটমন্দির। শীর্ষে খাঁজকাটা আমলকের উপর তিনটি কলস ও বিষ্ণুচক্র। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণে বেদীর উপরে রয়েছে রামচন্দ্র মন্দির। আনুমানিক অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বাংলা আটচালা রীতির চতুষ্কোণ মন্দিরটির জগমোহনটি নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরে রয়েছে কাঠের রামচন্দ্র মূর্তি, তাঁর বামে সীতাদেবী, ডানে লক্ষ্মণ ও সম্মুখে দন্ডায়মান হনুমান। বেদিটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৫.৫ ফুট ও ৩০.৫ ফুট এবং উচ্চতায় ২.৫ ফুট। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৮ ফুট ও ২৫ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ৭০ ফুট। রামচন্দ্র মন্দিরের কাছেই রয়েছে পূর্বমুখি শিবের সপ্তরথ একদুয়ারী শিখর মন্দির। আনুমানিক অষ্টাদশ শতকে শেষ ভাগে রানী হারিপ্রিয়ার নির্মিত এই মন্দিরের দৈব্য নাম কুমারেশ্বর মহাদেব। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০.৫ ফুট ও ১৪.৫ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষভাগে এবং দ্বিতীয়ার্ধে শ্রী শ্রী জগন্নাথমন্দির, শ্রী শ্রী রামচন্দ্রমন্দির এবং শিব মন্দিরের প্রধান পূজক ছিলেন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত জীবনকৃষ্ণ পণ্ডা কাব্যপুরাণস্মৃতিতীর্থ (যিনি হলেন গড়বাসুদেবপুর রাজসভার প্রধান সভাপণ্ডিত নিখিলশাস্ত্রাধ্যাপক রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব মহাশয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র)। ভদ্রকালী পুষ্করিণীর দক্ষিণপাড়ে বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগ্রত দেবী ভদ্রকালীর মন্দির। ১৯৪২র আন্দোলনের সময় এই ভদ্রকালীমন্দিরে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে আছেন এই সন্দেহে একজন অস্ট্রেলিয়ান 'গোরা সৈন্য অফিসার এই মন্দিরের দরজা পায়ের বুট জুতো দিয়ে সজোরে আঘাত করে ভাঙতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের বুলেটের আঘাতে নিহত হয়। এছাড়া, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল 'সোনার দুর্গামন্দির'। এখানে এখনও এই সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দুর্গা দেবীর প্রত্যহ পূজারতি হয়, অন্নভোগসহ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অতি সুন্দর দুর্গামন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা নরনারায়ণ রায় (১৭৯৭-১৮৩৯)। এই দুর্গামন্দিরের পেছনে আছে এক বিরাট পুষ্করিণী ও মনোরম পুষ্পোদ্যান। উল্লেখ্য, রাজা নরনারায়ণ রায়ই রাজপ্রাসাদের

বাইরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ইতিহাসখ্যাত উল্লিখিত ভদ্রকালীমন্দির নির্মাণ করেন এবং সংলগ্ন ভদ্রকালী পুষ্করিণীও খনন করেন। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বিরাট দুর্গামণ্ডপ বা নাটমন্দির রয়েছে। এই নাটমন্দির প্রাঙ্গণে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিবছর শরৎকালে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাদেবীর পূজা, যেখানে আখ, কুমড়ো প্রভৃতি সবজি ও ফলমূল বলির সঙ্গে ১টি মহিষবলি ও ২২টি ছাগবলি (পরে ১১টি ছাগবলি) হত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপণ্ডিত রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব মহাশয়ের ক্রমাগত প্রভাব ও পরামর্শের ফলেই পশুবলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বাসুদেবপুর রাজবাটীতে রাখী পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতি বৎসর সপ্তাহকালব্যাপী রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতো। বাসুদেবপুরের সুবিখ্যাত এই ঝুলনোৎসব অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এবং সংলগ্ন বালেশ্বর জেলাতেও খুবই জনপ্রিয় ছিল। মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র বহুল প্রচারিত এই প্রবাদ বাক্যটি সেই সময় মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো-

"বাসুদেবপুরের ঝুলন, আর পঞ্চতীর্থের ভাষ।
মহিষাদলের রথ, আর পঁচেটের রাস"।[১৫]

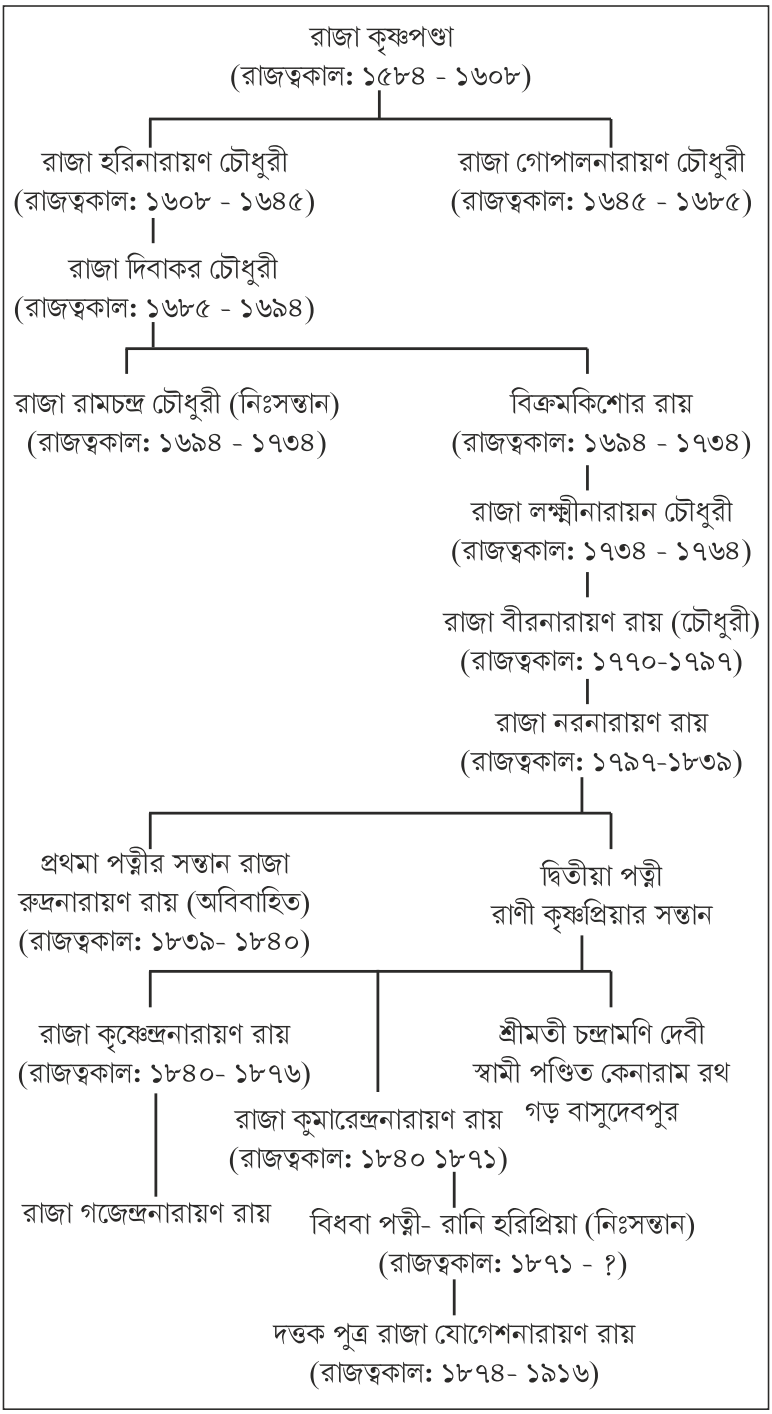
রাজা কৃষ্ণপণ্ডা
(রাজত্বকাল: ১৫৮৪ - ১৬০৮)
রাজা হরিনারায়ণ চৌধুরী
(রাজত্বকাল: ১৬০৮ - ১৬৪৫)
রাজা গোপালনারায়ণ চৌধুরী
(রাজত্বকাল: ১৬৪৫ - ১৬৮৫)
রাজা দিবাকর চৌধুরী
(রাজত্বকাল: ১৬৮৫ - ১৬৯৪)
রাজা রামচন্দ্র চৌধুরী (নিঃসন্তান)
(রাজত্বকাল: ১৬৯৪ - ১৭৩৪)
বিক্রমকিশোর রায়
(রাজত্বকাল: ১৬৯৪ - ১৭৩৪)
রাজা লক্ষ্মীনারায়ন চৌধুরী
(রাজত্বকাল: ১৭৩৪ - ১৭৬৪)
রাজা বীরনারায়ণ রায় (চৌধুরী)
(রাজত্বকাল: ১৭৭০-১৭৯৭)
রাজা নরনারায়ণ রায়
(রাজত্বকাল: ১৭৯৭-১৮৩৯)
প্রথমা পত্নীর সন্তান রাজা
রুদ্রনারায়ণ রায় (অবিবাহিত)
(রাজত্বকাল: ১৮৩৯- ১৮৪০)
দ্বিতীয়া পত্নী
রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার সন্তান
রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়
(রাজত্বকাল: ১৮৪০- ১৮৭৬)
শ্রীমতী চন্দ্রামণি দেবী
স্বামী পণ্ডিত কেনারাম রথ
গড় বাসুদেবপুর
রাজা কুমারেন্দ্রনারায়ণ রায়
(রাজত্বকাল: ১৮৪০ ১৮৭১)
রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ রায়
বিধবা পত্নী- রানি হরিপ্রিয়া (নিঃসন্তান)
(রাজত্বকাল: ১৮৭১ - ?)
দত্তক পুত্র রাজা যোগেশনারায়ণ রায়
(রাজত্বকাল: ১৮৭৪- ১৯১৬)

তথ্যসুত্র :

১ চৌধুরী, কিরণচন্দ্র, "দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কথা", কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪।
২ দাস, মন্মথনাথ, "ভগবানপুর ও ভূপতিনগর থানার ইতিহাস", কলকাতা, দে পাবলিকেশন, ২০২০, পৃঃ ৩৯।
৩ করণ, মহেন্দ্রনাথ, "রচনা সংকলন", ২০০২, পৃঃ ১৮৭
৪ মণ্ডল, বৃহস্পতি, "খেজুরির ইতিহাস", পূর্ব মেদিনীপুর, দিঘলপত্র, ২০১৪, পৃঃ ১১৬-১১৭। পরগণাগুলোর নামের বানানে গোলমাল ছিল। ঊনিশ শতকের বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে নামের সঙ্গে মিল ছিল না (Firminger's Fifth Report, page-365) 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' লেখক শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বসুর অখণ্ড জেলায় সেটেলমেন্টের কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর ব্যবহৃত বানান গ্রহণ করা হয়েছে।
৫ ভৌমিক, অরিন্দম, "মেদিনীকথা - পূর্ব মেদিনীপুর পর্যটন ও পুরাকীর্তি", Karnataka, Medinipur.in Legacy of Medinipur, ২৯শে আষাঢ় ১৮২৩, পৃঃ ১৭৩।
৬ দাশ, চিন্ময়, "বাসুদেবপুর রাজবাড়ি", তাপস মাইতি সম্পাদিত মেদিনীপুরের জমিদারবাড়ি, মেদিনীপুর, উপত্যকা, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৭৫।
৭ তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৭৫।
৮ তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৭৬।
৯ নন্দ, নরেশচন্দ্র, "গড় বাসুদেবপুর রাজবংশের ইতিহাস", রাজর্ষি মহাপাত্র, ও কৃতিসুন্দর পাল সম্পাদিত মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনী, ২০১৩, পৃঃ ২১৮-২১৯।
১০ তদেব, পৃষ্ঠাঃ ২৩০-২৩২।
১১ ঘোষ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ, "রাজেশ্বরী রাসমনি", কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃঃ ২৬২-২৮০।
১২ মাতৃশক্তি পত্রিকা, দক্ষিণেশ্বর, এপ্রিল-মে সংখ্যা ,২০০৪।
১৩ পাত্র, সঞ্জীব, "ভুপতিনগরের ধর্মীয় ভাবনাঃ স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের আন্তঃসম্পর্ক", Trisangam International Refereed Journal, vol.3,14 October 2023, pp. 469.
১৪ ক্ষেত্র সমিক্ষা: গড় বাসুদেবপুর জগন্নাথ মন্দির, ১৫.০৯.২০২৩; সকাল ১০টা থেকে ১১.১০টা পর্যন্ত, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৪৫৪।
১৫ পূর্বোক্ত, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ২৩৪-২৩৫।

সুন্দরবনের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী উপেক্ষিত এক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জীবনচর্যা

সায়ন দেবনাথ,
পি এইচ ডি গবেষক,
সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিজ অ্যান্ড মিউজিয়াম,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙ্গেয় উপত্যকার সর্বশেষ সীমানায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম বাদাবনের মর্যাদার অধিকারী। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার প্রকৃতি বাংলার অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় অনেকখানি আলাদা। নোনা খাঁড়ি ও গহন অরণ্য বেষ্টিত এই বাদাবনে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষকে প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনের নিত্যসঙ্গী। তারপরও সুন্দরবনবাসীর জীবন থমকে যায়নি। তাঁরা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক জগত। প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের গণ্ডী অতিক্রমের মাধ্যমে সুন্দরবন হয়ে উঠেছে সমন্বয়মূলক সংস্কৃতির অন্যতম এক পীঠস্থান। সুন্দরবনের হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের আঙিনায় সম্প্রীতির এক মহান বার্তা উচ্চারিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাদাবনের আঞ্চলিক সংস্কৃতির চিত্রায়নে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হলেও এই অঞ্চলের বহু প্রজন্মের বাসিন্দা খ্রিস্টানরা সেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি। যদিও সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠার উপযোগী। বস্তুতপক্ষে তাঁদের বাদ দিয়ে সুন্দরবনের আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসের চর্চা আদৌ সম্ভবপর নয়। ঔপনিবেশিক আমলে মিশনারীদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের প্রচার সুন্দরবনের জনজীবনে এক নয়ামাত্রা সংযোজিত করেছিল। তাঁরা শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না বরং আধুনিকতার আলোকবর্তিকা হয়ে সুন্দরবনে পদার্পণ করেছিলেন। মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের জনসমষ্টির একটি অংশ নতুন ধর্মমতের অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন। খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শ ও স্থানীয় সমাজ জীবনের উপাদনের সংমিশ্রণে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে উদার, প্রগতিশীল ও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তা সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক জগতকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

শব্দ সূচক: সুন্দরবন, খ্রিস্টান, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, মিশনারী সংস্থা, গির্জা।

সতীশচন্দ্র মিত্রের বর্ণনায়- "নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া, সাগরে

আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম-সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।"[১] ম্যানগ্রোভ অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত সুন্দরবন বদ্বীপের নামকরণের ইতিহাস প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। সুন্দরী গাছের আধিক্য থাকায় সুন্দরবন নামকরণ হয়েছে এই অভিমতই আপাতভাবে সর্বাধিক জনপ্রিয়। যদিও সুন্দরী ব্যতীত গড়ান, গেওয়া, হেঁতাল, পশুর, কেওড়া, গোলপাতা সহ কয়েক হাজার প্রজাতির গাছ সুন্দরবনে দেখা যায়। আরেকটি মত হল- সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ চন্দ্র বংশীয় রাজাদের অধীনস্থ হওয়ায় সমুদ্র উপকূলের সুবিশাল বনভূমির প্রথমে নাম ছিল 'চন্দ্রবন', ফরাসীরা উচ্চারণ করত 'স্যান্ডারবন'; পরবর্তীকালে এই বনভূমি 'চন্দরবন' বা 'সুন্দরবন' রূপে পরিচিতি অর্জন করে।[২] ব্রিটিশ আমলেই প্রথম সুন্দরবন বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এরূপ আরেকটি ধারণা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনের একাধিক কেন্দ্র থেকে নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে যা খ্রিস্টপূর্বকালীন সময়ে এই অঞ্চলে মনুষ্যবসতির নিদর্শন বহন করে। সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হল প্রাকৃতিক পরিবেশের খামখেয়ালিপনা। অরণ্যসংকুল ও নদী-খাঁড়ি অধ্যুষিত এই অঞ্চল একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার প্রাচীনত্বের বহু নিদর্শন বিনষ্ট হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রাচীন সাহিত্যসূত্রে সরাসরি সুন্দরবনের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই সুন্দরবনের ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের নথিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ব্রিটিশ প্রশাসনের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিতে সুন্দরবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীতে লর্ড ক্লাইভ নবাব মীরজাফরের থেকে চব্বিশ পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনের তরফে ১৭৮০-র দশকে যশোরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেনককেলের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনে আবাদি জমির অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল।[৩] তিনিই প্রথম বাঁশের সাহায্যে সুন্দরবনের উত্তরসীমানা পরিমাপ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮১১-১৮১৪-র প্রাক্কালে ই মরিসন ও তাঁর ভ্রাতা ক্যাপ্টেন মরিসন সরজমিনে সুন্দরবনের জরিপ সম্পন্ন করেছিলেন।[৪] শুধুমাত্র কৃষিকার্যই নয়, ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবনের বানিজ্য সম্ভাবনার দিকটিও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে খতিয়ে দেখা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ডায়মন্ডহারবারে বন্দর গড়ে উঠেছিল। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের মাতলা নদীতে একটি বন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও শেষপর্যন্ত তা রূপায়িত হয়নি। মূলত বানিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের উদ্যোগে সুন্দরবনে রেলব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছিল। রেলপথের আগমনে সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন অপেক্ষাকৃত সহজতর করেছিল তেমনই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। কোম্পানির শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে মিশনারীদের পদার্পণ হয়েছিল। তাঁদেরই ঐকান্তিক উদ্যোগে দ্বীপাঞ্চলগুলিতে খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শের প্রচারকার্যের সূচনা হয়েছিল।

সুন্দরবনের জনসংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত দুটি অভিমুখ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, এই অঞ্চলের জনপ্রিয় তিন লৌকিক দেবদেবী —বনবিবি, দক্ষিণ রায় ও কালু রায়ের উৎপত্তির বিষয়ে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই

তিন দেব-দেবী এবং একাধিক পীর বা গাজি, যেমন- মোবারকগাজী, দেওয়ানগাজী, বড়খাঁগাজী ও রক্তানগাজী প্রমুখকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের জনজীবনে হিন্দু-মুসলমান ভাবধারার মিশ্রণে যে সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই বিষয়ে বিস্তর লেখালেখির কাজ হয়েছে। সুন্দরবনের আঞ্চলিক সংস্কৃতির চর্চা এখনও মূলত এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইতিপূর্বে এমনকি বর্তমানেও সুন্দরবন বিষয়ক যাবতীয় আলোচনায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের খ্রিস্টান সমাজের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। দেবব্রত নস্করের 'চব্বিশ পরগণার পালাগান ও লৌকিক দেবদেবী' ও 'সুন্দরবনের সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ', শচীন দাসের 'জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন', মনিন্দ্রনাথ জানার 'সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি', কৃষ্ণকালী মণ্ডলের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাকথা', এ এফ এম আব্দুল জলিলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে সুন্দরবনের স্থানীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনার সন্নিবেশ ঘটলেও এই অঞ্চলের খ্রিস্টান সমাজ ও তাঁদের জীবনচর্যার বিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্দরবনে ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন মিশনারী সংস্থাগুলির কার্যকলাপ ও তাঁদের উদ্যোগে খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার, স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজের গোড়াপত্তন ও খ্রিস্টানদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিকগুলির উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

মূল আলোচনা

অবিভক্ত বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের প্রারম্ভিক পর্বের সাথে সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে। ১৫৯৯ সালে পর্তুগিজ জেসুইট মিশনারী ফনসেকা ও ডমিনিক ডি সোসা প্রতাপাদিত্যর শাসনাধীন যশোরে পদার্পণ করেছিলেন।[৫] তাঁদের উদ্যোগে অধুনা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ বা ধূমঘাটে ১৬০০ সালের ১ লা জানুয়ারি বাংলায় প্রথম গির্জা স্থাপিত হয়েছিল।[৬] ঔপনিবেশিক আমলের রাজস্ব বিভাগের নথি থেকে সুস্পষ্ট হয় যে বাখরগঞ্জ সুন্দরবনের সীমানাভুক্ত ছিল।[৭] তবে বাখরগঞ্জে আদৌ বাংলার প্রথম গির্জা স্থাপিত হয়েছিল কিনা তা যথেষ্ট বিতর্কিত একটি বিষয়। সাধারণত হুগলীর ব্যান্ডেল গির্জাকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম গির্জা হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও হেনরি বেভারিজ সাহেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বাংলার প্রথম গির্জা বাখরগঞ্জে, দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামে ও তৃতীয়টি ব্যান্ডেলে গড়ে উঠেছিল।[৮] বর্তমানে সুন্দরবনের জনসমষ্টির ক্ষুদ্র এক অংশ খ্রিস্টধর্ম পালন করেন। তবে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে। ভারতীয় সুন্দরবনের সমগ্র অঞ্চল প্রশাসনিক প্রেক্ষিতে মূলত দুটি জেলায় বিভক্ত- দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও উত্তর চব্বিশ পরগণা। দুটি সারণির মাধ্যমে ২০১১ সালের জনগণনায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন লাগোয়া ব্লকগুলিতে খ্রিস্টান জনবিন্যাসের সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হল। এক্ষেত্রে যে ব্লক এলাকাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের তালিকাভুক্ত। যদিও মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে ঔপনিবেশিক আমল থেকে মনুষ্য কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণে সুন্দরবনের

বিনাশসাধন আজও অব্যহত। তাই সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনের সীমানা বহুলাংশে সঙ্কুচিত হয়েছে। কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত গড়িয়া, বারুইপুর টালিগঞ্জ ও যাদবপুর পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। তাই সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে সুন্দরবনে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস আলোচনায় সুবিশাল এই বনভূমির বর্তমান ও পূর্বেকার উভয় পরিসীমায় অবস্থিত অঞ্চলগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন ব্লকগুলিতে খ্রিস্টান জনবিন্যাস[৯] (২০১১)

ব্লকের নাম	মোট জনসংখ্যা	খ্রিস্টান	পুরুষ	নারী	শতকরা হার
বাসন্তী	৩,৩৬,৬১৭	৭৬৯৩	৩৯৬০	৩৭৩৩	২.২৮%
গোসাবা	২,৪৬,৫৯৮	৩২০০	১৫৯৬	১৬০৪	১.৩%
ক্যানিং-১	৩,০৪,৭২৪	৯৭৮	৫৬৭	৪১১	০.৩২%
ক্যানিং-২	২,৫২,৫২৩	৯৫৩	৪৯১	৪৬২	০.৩৮%
কাকদ্বীপ	২,৮১,৯৬৩	২০৭	১০৫	১০২	০.০৭%
সাগর	২,১২,০৩৭	১১৭	৬৪	৫৩	০.০৬%
কুলতলি	২,২৯,০৫৩	২৫৪	১২৪	১৩০	০.১১%
নামখানা	১,৮২,৮৩০	৪২	১৮	২৪	০.০২%
পাথরপ্রতিমা	৩,৩১,৮২৩	৭২৫	৩৮৫	৩৪০	০.২২%
জয়নগর-১	২,৬৩,১৫১	৫৫৫	২৬৮	২৮৭	০.২১%
জয়নগর-২	২,৫২,১৬৪	১৩৮১	৭৩৬	৬৪৫	০.৫৫%
মথুরাপুর-১	১,৯৫,১০৪	৬৮	৩৯	২৯	০.০৩%
মথুরাপুর-২	২,২০,৮৩৯	৫৩০৮	২৭১৪	২৫৯৪	২.৪%

উত্তর চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন ব্লকগুলিতে খ্রিস্টান জনবিন্যাস [১০]

ব্লকের নাম	মোট জনসংখ্যা	খ্রিস্টান	পুরুষ	নারী	শতকরা হার
মিনাখা	১,৯৯,০৮৪	১০৩১	৫২১	৫১০	০.৫২%
সন্দেশখালি ১	১,৬৪,৪৬৫	৩৫৩	১৮৮	১৬৫	০.২১%
সন্দেশখালি ২	১,৬০,৯৭৬	৬৯৪	৩৪৮	৩৪৬	০.৪৩%
হিঙ্গলগঞ্জ	১,৭৪,৫৪৫	৭৫	৪০	৩৫	০.০৪%
হাড়োয়া	২,১৪,৪০১	৮৫	৪৯	৩৬	০.০৪%
হাসনাবাদ	২,০৩,২৬২	১২১	৫৮	৬৩	০.০৬%

সুন্দরবনের খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় খ্রিস্ট ধর্মের আগমন ও প্রাথমিক পর্যায়ের প্রচারকার্যের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সবিশেষ

প্রয়োজন রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার আগমন হয়েছিল। যদিও কোম্পানির প্রশাসন বাংলায় খ্রিস্ট ধর্মের সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য থেকে মুনাফা অর্জন ও শোষণযন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য একটি সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা। তাই বাংলার চিরায়ত ধর্মজীবনের বিষয়ে কোম্পানির আধিকারিকরা প্রথমদিকে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যদিও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মূলত পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের সুসংহত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানি কর্তৃক বাংলার শাসনক্ষমতা দখলের আগে থেকেই ইউরোপিয়ান মিশনারীরা এখানে পদার্পণ করেছিলেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত একাধিক মিশনারী সংস্থা বাংলায় খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিল। সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাংলার সমাজীবনে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল।[১১] মুঘল বাদশাহ আকবরের আমলে জেসুইট মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে পর্তুগালের জেসুইট মিশনারীরা শুধুমাত্র বাংলা নয় বরং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও জেসুইটদের আগে সানফ্রান্সিস্কান ও ডমিনিকান মিশনারীরা ভারতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার শুরু করেছিলেন। তবে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সমর্থ হননি। ১৫৭৬ সালে দুই জেসুইট ফাদার অ্যান্টোনিও ভ্যাজ ও পেদ্রো ডিয়াজের বাংলায় আগমন ঘটেছিল।[১২] দুইবছর পর অর্থাৎ ১৫৭৮ সালে জুলিয়ান পেরেইরা যিনি একজন স্বাধীন সন্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনরূপ মিশনারী সংস্থার অধীনস্থ ছিলেন না, তিনি সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের ভিকার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩] জেসুইটদের পরবর্তীকালে বাংলায় বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার কার্যকলাপের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে বেঙ্গল অক্সিলিয়ারি মিশন সোসাইটি, ব্রিটিশ ফরেন বাইবেল সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, দ্য রয়্যাল ড্যানিশ মিশন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির উইলিয়াম কেরি বাংলায় খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শের সম্প্রসারণে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় খ্রিস্টধর্মের চর্চা ও প্রচারের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[১৪]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে সুন্দরবনে সুসংগঠিত মিশনারী কার্যক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রথম কৃতিত্ব রয়েছে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের। ১৮০৫ সাল সুন্দরবনের খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সময়কাল। এই বছরে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মিনাখাঁর অন্তর্গত বামনপুকুরে একদল প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীর আগমন ঘটেছিল।[১৫] ১৮২০ সালে সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ (SPCK) নামক একটি প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের মোট ৫৪ টি দ্বীপে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের কাজ শুরু হয়েছিল।[১৬] ১৮২৩ সালে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের অধীনস্থ সংস্থা সোসাইটি ফর দ্য প্রপাগেশন অফ গসপেল (SPG) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় ধর্মপ্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।[১৭] তদানীন্তন সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের প্রধান দুই কেন্দ্র

ছিল- বারুইপুর ও মগরাহাট। ১৮৩৩ সালে বারুইপুরে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনের মুখ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮] ১৮৩৭ সালে বারুইপুরের সজিনাবেড়িয়ার দুটি হিন্দু পরিবার ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ও তাঁদের উদ্যোগে স্থানীয় একটি শিব মন্দির খ্রিস্টীয় চ্যাপেলে রূপান্তরিত হয়।[১৯] ১৮৪৪ সালে বারুইপুরের বিখ্যাত প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ সেন্ট পিটার'স গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬ সালের ৩০শে নভেম্বর মগরাহাটে সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ গড়ে ওঠে।[২০] মগরাহাটের প্রথম তিন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যরা ছিলেন- নন্দচরণ নাথ ও বিনোদিনী নাথ, নিধিরাম বর ও রাণী বর এবং যাদব মাখাল ও কমলিনি মাখাল।[২১] ব্রিটিশ আমলে বারুইপুরের প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনের অধীনে সর্বমোট সতেরোটি চ্যাপেল পরিচালিত হত।[২২] এই মিশনের আওতায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কয়েকটি এলাকা, যেমন- বাসন্তী, কলাহাজরা, ক্যানিং, ট্যাংরাখালি ও লক্ষ্মীকান্তপুরে চ্যাপেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৩] ঔপনিবেশিক আমলে দ্য ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি, দ্য লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ও সিস্টার্স অফ মার্সি বা কমিউনিটি অফ সেন্ট জন ব্যাপটিস্ট বা ক্লিউয়ার সিস্টার্স ইত্যাদি প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে ধর্মপ্রচারের কার্যক্রম পরিচালিত হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৪৪ সালে দ্য লন্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টায় অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে মিশনের একাধিক শাখা খোলা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাদুড়িয়া। এখানে ১৮৭৫ সালে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে একটি গির্জা গড়ে উঠেছিল।[২৪] বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যারাকপুর ডায়োসিসের অধীনে সর্বমোট ছয়টি কেন্দ্র 'পাসটোরেট' রয়েছে। এগুলি হল- গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, মগরাহাট, কুমড়োখালি ও খাড়ি।[২৫] প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলির সমন্বয়ে গঠিত একেকটি বিভাগকে 'প্যাসটোরেট' রূপে পরিচিত। সুন্দরবনের সমস্ত প্রোটেস্ট্যান্ট 'প্যাসটোরেট' ব্যারাকপুর ডায়োসিসের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

রোমান ক্যাথলিক মিশনের তরফে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ কার্মেলাইট মিশনারী ফাদার জুবিবুরু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলি ব্লকের অন্তর্গত কৈখালিতে খ্রিস্টীয় মতাদর্শের প্রচারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগে সেখানে ২৭৮ সদস্যের একটি ক্যাথলিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৬] সুন্দরবন অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপনের কৃতিত্ব রয়েছে কলকাতার নিউ মার্কেটের সন্নিকটে অবস্থিত সেন্ট অ্যান্টনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাদার এডমণ্ড ডেলপ্লাসের। ১৮৭৩-১৮৭৭ খ্রিস্তাব্দে তাঁর উদ্যোগে মোট সুন্দরবনে পাঁচটি কেন্দ্রে মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি হল- বাসন্তী (১৮৭৩), খাড়ি (১৮৭৪), বৈদ্যপুর (১৮৭৫), রাঘবপুর (১৮৭৬) ও মোড়াপাই (১৮৭৭)।[২৭] পরবর্তীকালে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রাঁচির আর্চবিশপ ফাদার পেরিয়ারের প্রচেষ্টায় নতুন উদ্যমে সুন্দরবন অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকার্য শুরু হয়েছিল। তাঁর আহ্বানে যুগোস্লাভিয়া থেকে ১৮ জন প্রচারক বাংলায় আসেন ও তাঁদের অধিকাংশকেই সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২৮] ১৯৭৮ সালে সুন্দরবনে খ্রিস্টধর্মের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কলকাতার আর্চবিশপের অধীন থেকে বারুইপুর ডায়োসিসকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং একজন পৃথক বিশপকে নিযুক্ত করা করা হয়।[২৯] সুন্দরবনে

খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ও খ্রিস্টান সমাজের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বাসন্তী দ্বীপের নাম উল্লেখ করতেই হয়। কারণ বর্তমানে সমগ্র সুন্দরবনের মধ্যে সর্বাধিক খ্রিস্টান জনবসতি বাসন্তী দ্বীপেই রয়েছে। ক্যাথলিক মিশনের আগমনের প্রাক্কালে বাসন্তী ছিল সুন্দরবনের অন্যতম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। সেযুগে নৌকার মাধ্যমে ক্যানিংয়ের ভয়ঙ্কর মাতলা নদী অতিক্রম করে বাসন্তী পৌঁছাতে হত। যদিও আজ মাতলা তাঁর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বাসন্তীর মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের পূর্বে 'হোগল' নামক একটি খাঁড়ি পেরোতে হয়। বর্তমানে এই দুটি নদীতেই সেতু থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই সহজতর হয়েছে। ফাদার এডমণ্ড ডেলপ্লাসের সুদক্ষ নেতৃত্বে বাসন্তীতে মিশনারী কার্যকলাপের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে অক্টোবর বাসন্তীর কয়েকজন অধিবাসী কলকাতায় ফাদার ডেলপ্লাসের সাথে সাক্ষাৎ করে একজন ধর্ম শিক্ষককে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৩০] পরেরদিন অর্থাৎ ২৩ শে অক্টোবর ফাদার ডেলপ্লাস স্বয়ং বাসন্তীতে উপস্থিত হন ও তাঁর ধর্মীয় উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকটি পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।[৩১] বর্তমানে বাসন্তীতে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৬১৯৭ জন।[৩২] বাসন্তীর ক্যাথলিক গির্জাটি 'ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার গির্জা' নামে সুপরিচিত। বাসন্তীর জেসুইট প্যারিসের অধীনে আবার সাতটি উপকেন্দ্র রয়েছে। 'প্যারিস' হল- রোমান ক্যাথলিক গির্জার সমন্বয়ে গঠিত বিভাগ। প্রতিটি 'প্যারিস'-এর অধীনে অসংখ্য উপকেন্দ্র থাকে। সর্বোপরি প্যারিস ও তার সাথে সম্পৃক্ত উপকেন্দ্রগুলি একটি ডায়োসিসের অধীনে পরিচালিত হয়। সুন্দরবন সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যাবতীয় রোমান ক্যাথলিক প্যারিসগুলি বর্তমানে বারুইপুর ডায়োসিসের অধীনে পরিচালিত হয়। বর্তমানে সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিসীমায় বারুইপুর ক্যাথলিক ডায়োসিসের অধীনস্থ প্যারিসগুলি হল- মোরাপাই (১৮৭৫), গোসাবা (১৯৯৩), ক্যানিং (২০০৪), খাড়ি (১৯২৭), কুমড়োখালি (১৯৭৫) ও রাণীগড় (১৯৯৮)।[৩৩]

প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মিশনারী সংগঠনগুলি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে সুন্দরবনে তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেনি। এই সংস্থাগুলির ঐকান্তিক উদ্যোগে প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। মগরাহাটের প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীরা নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। চার্চ ফর ইংল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত জেনানা মিশনারী সোসাইটির মিস এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোরের উদ্যোগে ১৮৭৮ সালে মগরাহাট প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার তরফে বাড়ি গিয়ে মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩৪] সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে সিস্টার্স অফ মার্সি বা ক্লিউয়ার সিস্টার্স মিশনের উদ্যোগে ছেলে ও মেয়েদের জন্য একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তবে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্লিউয়ার সিস্টার্সদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ছেলেদের বালিগঞ্জের অক্সফোর্ড মিশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল ও মেয়েদেরকে ভবানীপুরের ডায়োসিয়ান হাই স্কুলে পাঠানো হত।[৩৫] ক্লিউয়ার মিশনের উদ্যোগে ১৯২৮ সালে বারুইপুরে ৫-১২ বছর বয়সী ২৬ জন মেয়েকে নিয়ে একটি বোর্ডিং স্কুল চালু হয়েছিল।[৩৬] জেসুইট মিশনের উদ্যোগে ১৯৩৪ সালে বাসন্তীতে ছেলেদের জন্য যথাক্রমে একটি প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

যা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল নামে পরিচিত।[৩৭] ঐ একই বছরে ডটার্স অফ ক্রুশের উদ্যোগে বাসন্তীতে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিভাগ সম্বলিত সেন্ট তেরেসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৮] সর্বপ্রথম খ্রিস্টান মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে আধুনিক শিক্ষার আলো পৌঁছে গিয়েছিল। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রসারেও মিশনারী স্কুলগুলি সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল। জেনানা মিশনের উদ্যোগে উত্তর চব্বিশ পরগণার বরানগরে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল গড়ে উঠেছিল।[৩৯] সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত মেয়েদের এখানে সূচিকর্ম, জ্যাম-জেলি ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।[৪০] ১৯৫১ সালে বাসন্তীতে ছেলেদের জন্য একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪১] সুন্দরবনে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মিশনারীরা কখনই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হননি। শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা হয়নি। এমনকি মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য কখনই সরাসরি উৎসাহিত করা হত না বরং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করার মহান ব্রত সামনে রেখে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয়েছিল। সেজন্য এই মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল পরিমাণে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিল। বর্তমানেও সেই ধারা অব্যহত আছে। হুগলির চুঁচড়ার নিকটস্থ পিপুলপাতিতে ক্লিউয়ার সিস্টার্স মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রীই ছিল সুন্দরবনের।[৪২] প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে এখানে তাঁদেরকে নিয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাঠ গ্রহণের সমাপ্তিতে তাঁরা যেন নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।[৪৩] পিপুলপাতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলায় পাঠ দান করা হত, ইংরেজি ছিল দ্বিতীয় ভাষা এবং এখানকার ছাত্রীদের নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তনে কোনরকম চাপ দেওয়া হত না।[৪৪]

সুন্দরবনের খ্রিস্টান সমাজ মূলত নিম্ন বর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। উইলিয়াম হান্টার প্রদত্ত সুন্দরবনের হিন্দু জনবিন্যাসের বিবরণে শূদ্র বর্ণভুক্ত জাতিগুলির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। হান্টার মন্তব্য করেছেন যে সুন্দরবনে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাক্ষাৎ পাওয়া কার্যত দুর্লভ।[৪৫] হান্টারের এরূপ বক্তব্যের যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে। বর্তমানেও সুন্দরবনের হিন্দু জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উচ্চবর্ণের যৎসামান্য উপস্থিতি দেখা যায়। হান্টার সুন্দরবনের হিন্দুদের যে জাতিগত তালিকা প্রদান করেছেন সেখানে বারোটি নিম্নজাতি- নাপিত, কৈবর্ত, কাপালিক, পোদ, চণ্ডাল, জেলিয়া, বাগদী, তিয়র, ধোবা, যোগী, শুঁড়ি ও কাওড়াদের উল্লেখ রয়েছে।[৪৬] বাসন্তী ব্লকে তিয়র পাড়া নামক একটি গ্রাম রয়েছে ও সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসীদের একটা অংশ বর্তমানে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। শুধুমাত্র সুন্দরবন নয় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের তিয়রদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার অন্তর্গত কোচপুকুর গ্রামের তিয়রদের অনেকেই খ্রিস্টধর্ম পালন করে।[৪৭] ঔপনিবেশিক আমলে বাখরগঞ্জে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলত চণ্ডাল।[৪৮] সুন্দরবনে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের নজির যে একেবারেই নেই তা নয়। অধুনা বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত

আন্ধারমানিক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়।[৪৯] তবে ঔপনিবেশিক আমলে মিশনারীদের প্রভাবে মূলত নিম্নজাতির হিন্দুদের কিয়দংশই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এভাবেই সুন্দরবনের খ্রিস্টান সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে সুন্দরবনে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না। সুতরাং হিন্দু উচ্চবর্ণ কর্তৃক অত্যাচার, নিপীড়ন ও জাতিগত হিংসার প্রতিক্রিয়ায় সুন্দরবনে খ্রিস্টধর্মের প্রসার হয়েছিল তা বলা যায় না। নিম্ন জাতিগুলির খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাব্য অন্যতম কারণ ছিল এক উন্নততর জীবনযাত্রার হাতছানি। ইউরোপিয়ান মিশনারীরাই সর্বপ্রথম প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জনজীবনে আলোকবর্তিকা নিয়ে এসেছিলেন। এই অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণে মিশনারীদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। মিশনারী সংস্থাগুলির উদ্যোগে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসহায় অসুস্থদের বিনা খরচে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভিন্ন মিশনারী সংস্থার পক্ষ থেকে সেবাকার্যের উদ্যোগ গ্রহণ করা হত। সর্বোপরি খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শ প্রচারের অদম্য বাসনায় মিশনারীদের নিরলস পরিশ্রম সুন্দরবনের প্রান্তিক জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল। আজকের তুলনায় ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবন আরও বেশি প্রত্যন্ত ও বিপদসঙ্কুল ছিল। ক্লিউয়ার মিশনের তরফে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রায় ৩৬ ঘণ্টার প্রবল ঝড়ের দাপটে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছিল ও মাঠের ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল।[৫০] ১৯৩৭-এ প্রকাশিত রিপোর্টে থেকে জানা যায় যে বারুইপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও এখানে ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রাদুর্ভাব রয়েছে।[৫১] মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলায় ভাষায় প্রচারিত খৃস্টের বাণী সুন্দরবনবাসীর কাছে সহজেই বোধগম্য হয়েছিল। তাছাড়া গির্জাগুলিতে সমবেত ধর্মাচরণের রীতি এক বিকল্প সুসংহত ধর্মজীবনের সন্ধান দিয়েছিল। এই সবের প্রভাবে কালক্রমে সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলগুলিতে খ্রিস্টধর্মের প্রসার সম্ভবপর হয়েছিল বলা যায়। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের তরফে মিশনারীরা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালের কিছুকাল পরে মগরাহাটের বিরেল গ্রামের সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় এই নব্য খ্রিস্টানদের ওপর স্থানীয় এক মুসলমান জমিদার প্রবল অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত সোসাইটি ফর দ্য প্রপাগেশন অফ গসপেলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন গ্রামে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয়।[৫২] ইতিপূর্বে উল্লেখিত আন্ধারমানিক গ্রামের হিন্দু জমিদারের প্ররোচনায় একদল উত্তেজিত জনতা খ্রিস্টীয় চ্যাপেল আক্রমণ করেছিল ও সংশ্লিষ্ট গ্রামের একাধিক খ্রিস্টান বাড়ি অগ্নিসংযোগের কারণে ভস্মীভূত হয়েছিল।[৫৩]

মিশনারীদের উদ্যোগে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত গির্জাগুলি একদা ইউরোপীয় ধর্ম প্রচারকদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্তমানে প্রায় সমস্ত গির্জাই বাঙালী খ্রিস্টানরা পরিচালনা করেন। এমনকি বেশ কয়েকটি গির্জার মুখ্য দায়িত্বভার সুন্দরবনের বহু প্রজন্মের অধিবাসী স্থানীয় খ্রিস্টানদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। এই অঞ্চলের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলির মধ্যে গঠনগত দিক থেকে তেমন ফারাক নেই। যদিও গির্জার অভ্যন্তরে সাজসজ্জাগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিতে

ক্রুশের ওপরে সাধারণত প্রভু যীশুর কোনরূপ মূর্তি থাকে না। অন্যদিকে ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে ক্রুশের ওপরে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুর মূর্তি দেখা যায়। এছাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জায় মাতা মেরীর মূর্তি থাকে না কিন্তু ক্যাথলিক গির্জায় প্রভু যীশুর সাথে মাতা মেরী বিরজমান থাকেন। দুই সম্প্রদায়ের জন্য যেমন পৃথক গির্জা রয়েছে তেমনই আবার আলাদা সমাধিস্থলও রয়েছে। তবে সুন্দরবনের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সামাজিকভাবে কার্যত কোনরূপ পার্থক্যই নেই। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না। বর্তমানে সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলগুলিতে প্রোটেস্ট্যান্ট অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিক মিশনগুলির অধিকতর প্রভাব দেখা যায়। সর্বোপরি সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মূলত ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ করেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ প্রকৃতির। তাঁরা নিয়মিত প্রতি রবিবার গির্জার প্রার্থনায় বা 'মিশা'য় যোগদান করেন।

সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের দ্বারা পালিত ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে ভস্ম বুধবার, পাম সান ডে বা তালপত্র রবিবার, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সানডে, কবর প্রতিষ্ঠা দিবস, বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের উদযাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভস্ম বুধবার থেকে ইস্টার সানডে অব্দি প্রায় চল্লিশ দিন ধরে যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয় তা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের খ্রিস্টানরা ভস্ম বুধবারের পবিত্র দিনে তাঁদের নিকটবর্তী গির্জায় সমবেত হন ও ফাদার তাঁদের কপালে ছাই লেপনের মাধ্যমে ক্রুশ প্রতীক এঁকে দেন। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে প্রভু যীশু মানবজাতির পাপের কারণে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই এইদিন থেকে আগামী একমাসের দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত পর্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এসময় সাধারণত নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ ও উপবাসের বিধান রয়েছে। জেরুজালেম নগরীতে যীশু খৃস্টের প্রবেশের ঘটনাকে স্মরণ করে ইস্টারের আগের সপ্তাহের রবিবার দিন তালপত্র রবিবার বা পাম সানডে পালন করা হয়। তালপত্র রবিবারের আগের দিন খেজুর গাছের সদ্য বিকশিত পাতা সংগ্রহ করা হয়। পরের দিন সকলে গির্জায় একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করেন ও এরপর খেজুর পাতা সহযোগে শোভাযাত্রা বেরোয়। এই খেজুর পাতাটি আগামী একবছরের জন্য বাড়িতে অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে রাখেন। তালপত্র রবিবারের পরের সপ্তাহটি 'পুণ্য সপ্তাহ' নামে পরিচিত। এই সপ্তাহে যথাক্রমে শুক্রবার গুড ফ্রাইডে ও রবিবার ইস্টার সানডে উদযাপন করা হয়। গুড ফ্রাইডের দিন যীশু খৃস্টের আত্মবলিদানকে সম্মান জানিয়ে গির্জাতে প্রার্থনার জন্য সকলে সমবেত হন ও ঐদিন তাঁরা উপবাস করেন। গুড ফ্রাইডের পরের রবিবার ইস্টার সান ডে বা যীশুর পুনরুত্থান পর্ব পালিত হয়। এভাবে ভস্ম বুধবার থেকে ইস্টার পর্যন্ত পালিত আচারগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে।

যীশুর আবির্ভাব দিবস বা বড়দিনের উদযাপন সুন্দরবনের খ্রিস্টান সমাজের প্রধানতম উৎসব। বড়দিন উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকদিন আগে থেকে গির্জাগুলিকে সুসজ্জিত করে তোলা হয়। গির্জার অভ্যন্তরে ও বাইরে সুদৃশ্য আলপনা দেওয়া হয়। বড়দিনের আগের রাতে খ্রিস্টানরা চার্চে বিশেষ প্রার্থনায় সামিল হন। প্রার্থনার শেষে গির্জা থেকে কীর্তন দল বাদ্যযন্ত্র সহকারে পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন পরিবেশনের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে।

'একবার যীশু বলে বাহু তুলে, এসো না ভাই দলে দলে' সহ আরও একাধিক নামগানে সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। শুধুমাত্র খ্রিস্টান নয় হিন্দু বাড়ির উঠোনেও কীর্তন দল উপস্থিত হয়ে প্রভু যীশুর নামগানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ইংরেজি নতুন বছরের বনভোজন আয়োজনের উদ্দেশ্যে কীর্তনীয়ারা প্রতিটি বাড়ি থেকে চাল, ডাল, আলু ও অর্থ সংগ্রহ করেন। খ্রিস্টান বাড়িগুলির আঙিনা রঙ্গিন কাগজ ও বেলুনের সমাহারে সেজে ওঠে। খ্রিস্টান বাড়িতে যীশুর গোশালা তৈরি করা হয়। খড় ও চটের বস্তা সহযোগে অস্থায়ী একটি ছাউনি নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রভু যীশু, মাতা মেরী, যোসেফ ও বিভিন্ন প্রাণীর মাটির মূর্তি রাখা হয়। গির্জায় বড়দিনের প্রার্থনায় অসংখ্য হিন্দুরাও সামিল হন। খ্রিস্টান প্রতিবেশীর তরফে হিন্দু ও মুসলিম বাড়িতে কেক, মিষ্টি ও কমলালেবু উপহার দেওয়া হয় এবং মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাসন্তীর গির্জার তরফে প্রতিবছর বড়দিন উপলক্ষ্যে সুন্দরবনের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেলার আয়োজন করা হয়। একদিনের এই মেলাটিতে দূরদূরান্ত থেকে সব ধর্মের হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটে। এই মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল আতশবাজির মনোরম প্রদর্শনী। সুরঞ্জন মিদ্দের ভাষায়-"সুন্দরবনের বাসন্তী দ্বীপের সজিনাতলা গ্রামে বড়দিনে বসে সম্প্রীতি মেলা, শতর্বষ ধরে যা গ্রামীণ শান্তি ও সমন্বয় বজায় রেখেছে। এখানে মধুসূদন মোতালেব সিমসনদের সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মৃদঙ্গ বাজান মহাদেব নস্কর, বাঁশিতে উজির আলি আর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেন জোহন মণ্ডল।"[৫৪] এভাবে সুন্দরবনের বড়দিন কার্যত 'লোকায়ত বড়দিন'-এ পরিণত হয়েছে। বড়দিনের পর ইংরেজি নববর্ষ পালনের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের বাৎসরিক ধর্মীয় আচারের পরিসমাপ্তি হয়। বছরের শেষদিনে অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যরাতে গির্জায় সমেবত প্রার্থনা ও ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে জল-জঙ্গল-খাঁড়ি বেষ্টিত সুন্দরবনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়।

হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ায় সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের জীবনযাত্রায় আজও হিন্দু ঐতিহ্যের উপাদানগুলি প্রকট রূপে প্রতীয়মান হয়। বিভারেজ সাহেবও সুন্দরবনের স্থানীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রথাগুলির প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন।[৫৫] বিশেষত খ্রিস্টান সমাজের বিবাহ সংক্রান্ত রীতিতে বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। বিবাহের পূর্বে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গায়ে হলুদের প্রাক্কালে স্থানীয় চার্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার উপস্থিত থাকেন ও তিনি ঈশ্বরের কাছে নব দম্পতির জন্য প্রার্থনা করেন। একদা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন গান গাওয়া হত কিন্তু এখন আর তেমন চল নেই। গায়ে হলুদের সন্ধ্যায় আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের পায়েস খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। স্বল্প পরিমাণে দুধের মধ্যে মোটা চাল ও চিনি মিশিয়ে এই পায়েস প্রস্তুত করা হত, যা 'পোষ্টি ভাত' নামে পরিচিত। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বিবাহ চার্চে অনুষ্ঠিত হলেও প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে তাঁদের চার্চের পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে বাড়িতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। সুন্দরবনে খ্রিস্টানদের বিবাহ সাধারণত দিনের বেলা আয়োজিত হয়। বিয়ের দিনই বিকেলবেলা নববধূ তাঁর পিত্রালয় পরিত্যাগ করেন। বিবাহের দিন প্রীতিভোজের সূচনার প্রাক্কালে ফাদার অথবা পাদ্রী পিতা, পুত্র ও

পবিত্র আত্মার নামে প্রার্থনা জানান। এরপর এক টাকার একটি কয়েনের মাধ্যমে নববধূর সিঁথিতে সিঁদুর রাঙিয়ে দেওয়া হয়। বাঙালী হিন্দু নারীদের ন্যায় সুন্দরবনের খ্রিস্টান মহিলারা নিয়মিত শাঁখা ও সিঁদুর ব্যবহার করেন। বিবাহের সময় মেয়েরা সাধারণত বেনারসি শাড়ি পরিধান করেন। গাউনের ব্যবহার আজও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তবে বর্তমানে খ্রিস্টান ছেলেরা বিবাহের পোশাক হিসেবে কোট-প্যান্ট অধিক পছন্দ করেন। যদিও একদা বিয়ের পোশাক হিসেবে ছেলেরা সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি ব্যবহার করতেন।

খ্রিস্টান বাড়িতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে প্রথমেই গির্জায় খবর যায়। শোক সংবাদ পাওয়ার পর গির্জার তরফে তিনবার ঘণ্টা বাজানো হয়। আসলে এই ঘণ্টাধ্বনির উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট এলাকার খ্রিস্টানদের মধ্যে মৃত্যুর বার্তা পৌঁছে দেওয়া। গির্জার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আসেন ও তাঁর মুক্তি কামনায় প্রার্থনা করেন। এরপর কফিনের মাধ্যমে বহন করে মরদেহ চার্চে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি কেউ অপঘাতে মারা যান তাহলে গির্জার অভ্যন্তরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় না। সেক্ষেত্রে গির্জার বাইরে মরদেহের ওপর পবিত্র জল সিঞ্চনের মাধ্যমে ফাদার শান্তি কামনা করেন। স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মরদেহ গির্জার অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার রীতি রয়েছে। গির্জায় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর মরদেহ সমাধিস্থল বা কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধি দানের আগে মাটি স্পর্শ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। সবশেষে কফিন সমেত মরদেহ মাটির নীচে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীতে মৃত্যুর এগারো দিন অথবা একচল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হলে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিবার ও নিকট আত্মীয়-স্বজন নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন সারারাত ধরে খ্রিস্টীয় কীর্তন পরিবেশিত হয়। প্রতিবছর ২রা নভেম্বর পরলোকগত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনের রীতি রয়েছে। এই দিনটি ইংরেজিতে 'All Souls Day' হিসেবে পরিচিত হলেও সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের মধ্যে তা 'কবর প্রতিষ্ঠা দিবস' হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। পবিত্র এই দিনে সমাধিস্থলে প্রিয়জনের সমাধি বা কবরে ফুল, মোমবাতি ও সুগন্ধি ধূপ প্রদানের মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

সুন্দরবনের অধিকাংশ বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক জীবনচর্যা সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ- কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার ও জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহকরণ। দ্বীপাঞ্চলগুলিতে জঙ্গল পরিস্কারের মাধ্যমে যে চাষযোগ্য জমি উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে বছরে মূলত দুইবার কৃষিকার্য হয়। সুন্দরবনে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের শীর্ষস্থানে রয়েছে ধান। এই অঞ্চলের খাঁড়িগুলি থেকে প্রায় সারাবছরই বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া নদী সংলগ্ন ফিসারিতে বিপুল পরিমাণে মাছ উৎপাদিত হয়। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু, কেওড়া ফল, গোলপাতার ফল এবং গরান ও ধুন্দল কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় খ্রিস্টান কৃষিকার্য ও মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। বিভারেজ সাহেব তাঁর লেখনীতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের এই দুই পেশায় নিযুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৬] হান্টার মন্তব্য করেছেন যে সুন্দরবনের খ্রিস্টান কৃষকদের অবস্থা

এই অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের ন্যায় অভাবগ্রস্ত ছিল।[৫৭] ১৮২৮ সালের রেগুলেশন আইন অনুসারে জরিপের মাধ্যমে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কোম্পানির প্রশাসনের তরফে একটি সুবিন্যস্ত ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল।[৫৮] নতুন ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থার পরিণামে সুন্দরবনে চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটাই 'লটদার' নামক ভূমধ্যকারী শ্রেণীর হস্তগত হয়েছিল। লটদারদের অত্যাচার ও নিপীড়নে সুন্দরবনের কৃষকদের জীবনে নেমে এসেছিল দারিদ্র্যের চূড়ান্ত কশাঘাত। আজও সুন্দরবনের বেশিরভাগ খ্রিস্টান কৃষিকার্যে নিযুক্ত। তবে অধিকাংশই মূলত ভূমিহীন কৃষি মজুর হিসেবে কাজ করেন। অন্যদিকে গোসাবা দ্বীপের খ্রিস্টান অধিবাসীদের একটি অংশ নদী থেকে মাছ ও কাঁকড়া এবং জঙ্গল থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহের মাধ্যমে দিন গুজরান করেন। বাসন্তীর খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকেই আবার নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট অভাব থাকায় দরিদ্র খ্রিস্টানদের একটা বড় অংশ বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্য ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছেন। বিভারেজের বর্ণনাতেও পাওয়া যায় যে বাখরগঞ্জের খ্রিস্টানরা শীতকালে বিভিন্ন জেলায় রাস্তা নির্মাণ ও পুকুর খননের কাজে করতেন।[৫৯] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতাত্তোর কালে ভারতীয় সুন্দরবনে খ্রিস্টানদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার তেমন আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন সাধন হয়নি।

গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত উপকূলীয় বনভূমি সুন্দরবনের জীবনযাত্রা একদমই মসৃণ নয় বরং নোনা জলের খাঁড়ি, গহন অরণ্য ও হিংস্র বাঘ-কুমিরে ভরপুর এই অঞ্চলে প্রতি পদেই রয়েছে বিপদের হাতছানি। প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাত্রা সচল থাকে। তাই বিপদসঙ্কুল সুন্দরবনের ধর্মজীবনে অরণ্য ও নদী কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই লোকবিশ্বাসের ধারায় কালক্রমে বনবিবি, দক্ষিণ রায়, কালু রায় ও মাকাল ঠাকুর ইত্যাদি আঞ্চলিক দেব-দেবীর পূজার্চনার প্রচলন ঘটেছে। এসকল দেব-দেবী সুন্দরবনের অধিবাসীদের কাছে রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছেন। বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ রায়ের উপাসনা করা হয়।[৬০] কালু রায় কুমিরের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী লৌকিক দেবতা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।[৬১] অন্যদিকে মৎস্যজীবীরা মূলত পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ লাভের আশায় মাকাল ঠাকুরের পূজার্চনা করেন।[৬২] তবে সুন্দরবনবাসীর কাছে বনবিবি তথা বনদেবীর গুরুত্ব সর্বাধিক। তিনি জঙ্গল ও নদীর যাবতীয় আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিনি যথাক্রমে বনদেবী ও বনবিবি হিসেবে পরিচিত। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বনবিবির মূর্তি অনেকটা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী মহিলা সদৃশ কিন্তু হিন্দু ভাবনায় দেবী আবার বাঘবাহিনী চণ্ডীর ন্যায় বিরাজ করেন।[৬৩] দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বনদেবী ও বনবিবির পৃথক থান যেমন আছে তেমনই আবার একই থানও পরিলক্ষিত হয়। সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান এই দেবী সত্তা মূলত বনবিবি নামেই সর্বাধিক পরিচিত। সুন্দরবনের আঞ্চলিক ধর্মীয় সংস্কৃতির পটভূমিতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা গুরুত্ব পেলেও খ্রিস্টানদের উল্লেখ কার্যত পাওয়াই যায় না। অথচ গোসাবা ও কৈখালীর খ্রিস্টান মৎস্যজীবী ও মৌলেদের (বন থেকে যারা মধু সংগ্রহ করেন) মধ্যে বনবিবি ও

দক্ষিণ রায়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। জঙ্গলের কাঠ ও মধু এবং নদীর মাছ সংগ্রহে যাওয়ার প্রাক্কালে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের থানে তাঁরা প্রার্থনা জানায় ও মানত করে। জীবনধারণের জন্য জঙ্গল ও নদীর ওপর নির্ভরশীল সুন্দরবনের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এই অঞ্চলের স্থানীয় দেব-দেবীগণের সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রভু যীশুর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের পাশপাশি বনবিবিও তাঁদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দু ও মুসলিমদের ন্যায় সুন্দরবনের আঞ্চলিক ধর্মবিশ্বাস এখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সুন্দরবনের খ্রিস্টান সমাজ এই অঞ্চলের সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক কাঠামোর এক অন্যতম অংশীদার।

তথ্যসূত্র :

১ মিত্র, সতীশচন্দ্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সং., কলকাতা: চক্রবর্তী চাটার্জি এন্ড কোং, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২।
২ জানা, মনীন্দ্রনাথ, সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথম সং., কলিকাতা: দীপালী বুক হাউস, ১৯৪৪, পৃ. ২-৩।
৩ দাস, শচীন, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, প্রথম সং., কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৯।
৪ তদেব, পৃ. ২৩।
৫ বেভারিজ, এইচ, দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ বাকরগঞ্জ: ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, প্রথম সং., লন্ডন: ট্রুবনার ও কো লুডগেট হিল, ১৮৭৬, পৃ. ১৭৬।
৬ তদেব, পৃ. ১৭৬।
৭ অ্যাসকলি, এফ. ডি, এ রেভিনিউ হিস্ট্রি অফ দ্য সুন্দরবন: ১৮৭০-১৯২০, কলকাতা: সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপোট, ১৯২১, পৃ. ৯১।
৮ প্রাগুক্ত, বেভারিজ, পৃ. ১৭৬।
৯ ২০১১ সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত, (https://www.censusindia.co.in/), ১২ই জুন, ২০২৪, সময়- ৫:৫৬ মি:।
১০ তদেব।
১১ সেনগুপ্ত, কান্তিপ্রসন্ন, দ্য ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীজ ইন বেঙ্গল ১৭৯৩-১৮৩৩, প্রথম সং., কলকাতা: ফার্মা কে এল এম, ১৯৭১, পৃ. ১৭।
১২ ক্যাম্পোস, জে. জে. এ, হিস্ট্রি অফ দ্য পর্তুগিজস ইন বেঙ্গল, কলকাতা: মেডিক্যাল পাবলিশার্স, ১৯১৯, পৃ. ১০০।
১৩ তদেব, পৃ. ১০০।
১৪ লায়ার্ড, এম. এ, মিশনারীজ অ্যান্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৭৯৩-১৮৩৭, অক্সফোর্ড: ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, ১৯৭২, পৃ. ৩।
১৫ ক্যাথলিক ডায়োসিস অফ বারুইপুর, ডায়রেক্টরি ২০২১, বারুইপুর: বিশপ হাউজ, ২০২১, পৃ. ২৪।
১৬ ডায়োসিস অফ ব্যারাকপুর, টেল ইট আউট: দ্য মান্থলি নিউজলেটার অফ দ্য ডায়োসিস অফ ব্যারাকপুর, সি এন আই, ব্যারাকপুর: আগস্ট, ২০২৩, পৃ. ৬।
১৭ ম্যালি, এল. এস. এস. ও, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার: ২৪ পরগণা, কলকাতা: সেক্রেটারিয়েট

বুক ডিপোট, ১৯১৪, পৃ. ৭৯।
১৮ তদেব, পৃ. ৭৯।
১৯ তদেব, পৃ. ৭৯।
২০ প্রাগুক্ত, টেল ইট আউট, পৃ. ৬।
২১ তদেব, পৃ. ৭।
২২ প্রাগুক্ত, ও ম্যালি, পৃ. ৮০।
২৩ তদেব, পৃ. ৮০।
২৪ তদেব, পৃ. ৮২।
২৫ https://dioceseofbarrackporecni.org.in/pastorates.php, ১৯শে জুন, ২০২৪, সময়- ৯:৪৫ মি:
২৬ প্রাগুক্ত, ডায়রেক্টরি, পৃ. ১১।
২৭ বাসন্তী জেসুইট মিশনের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকা, ২০২৩।
২৮ প্রাগুক্ত, ডায়রেক্টরি, পৃ. ১১।
২৯ তদেব, পৃ. ১২।
৩০ প্রাগুক্ত, পত্রিকা, বাসন্তী জেসুইট মিশন।
৩১ তদেব।
৩২ তদেব।
৩৩ প্রাগুক্ত, ডায়রেক্টরি, পৃ. ২৭-৪৪।
৩৪ প্রাগুক্ত, টেল ইট আউট, পৃ. ৭।
৩৫ প্রাগুক্ত, ও ম্যালি, পৃ. ৮০।
৩৬ বনহ্যাম, ভ্যালেরি, সিস্টার্স অফ দ্য রাজ: দ্য ক্লিউয়ার সিস্টার্স ইন ইন্ডিয়া, প্রথম সং., উইন্ডসর: কমিউনিটি অফ সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ২৩১।
৩৭ প্রাগুক্ত, ডায়রেক্টরি, পৃ. ৮০।
৩৮ তদেব, পৃ. ৮০।
৩৯ প্রাগুক্ত, ও ম্যালি, পৃ. ৮১।
৪০ তদেব, পৃ. ৮১।
৪১ প্রাগুক্ত, ডায়রেক্টরি, পৃ. ২৭।
৪২ প্রাগুক্ত, বনহ্যাম, পৃ. ১৫১।
৪৩ তদেব, পৃ. ১৫১।
৪৪ তদেব, পৃ. ১৫১।
৪৫ হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ, এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল: ডিস্ট্রিক্টস অফ দ্য ২৪ পরগণাস অ্যান্ড সুন্দরবনস, প্রথম খণ্ড, লন্ডন: ট্রুবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৭৫, পৃ. ৩১৮।
৪৬ তদেব, পৃ. ৩১৮।
৪৭ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৭১, দ্য তিয়র: এ শিডিউলড কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এথনোগ্রাফিক স্টাডি, নং. ২, নিউ দিল্লী: অফিস অফ দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, ১৯৭১, পৃ. ৬৪।
৪৮ প্রাগুক্ত, বেভারিজ, পৃ. ২৬০।
৪৯ প্রাগুক্ত, ও ম্যালি, পৃ. ৮০।
৫০ প্রাগুক্ত, বনহ্যাম, পৃ. ১৮০।
৫১ তদেব, পৃ. ২৪২-২৪৩।
৫২ প্রাগুক্ত, ও ম্যালি, পৃ. ৭৯।
৫৩ তদেব, পৃ. ৭৯।

৫৪ মিদ্দে, সুরঞ্জন, 'লোকায়ত বড়দিন', সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৩, (https://www.anandabazar.com/editorial/essays/essay-celebration-of-christmas-in-a-part-of-bengal-in-a-different-way/cid/1483272), ২২শে জুন, ২০২৪, সময়- ১:৩০ মি:
৫৫ প্রাগুক্ত, বেভারিজ, পৃ. ২৬৩।
৫৬ তদেব, পৃ. ২৬৩।
৫৭ প্রাগুক্ত, হান্টার, পৃ. ৩১৮।
৫৮ প্রাগুক্ত, অ্যাসকলি, পৃ. ৩।
৫৯ প্রাগুক্ত, বেভারিজ, পৃ. ২৬৩।
৬০ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য সুন্দরবন, কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, প্রথম সং., ১৯৯৯, পৃ. ১৪৫।
৬১ প্রাগুক্ত, শচীন দাস, পৃ. ৮১।
৬২ প্রাগুক্ত, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৮।
৬৩ প্রাগুক্ত, মনীন্দ্রনাথ জানা, পৃ. ৭৭।

বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: প্রসঙ্গে বাগদি সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের রূপরেখা

বিদ্যাভারতী হালদার
এম.ফিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
অতিথি অধ্যাপক, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব নামক গ্রন্থের 'বর্ণবিন্যাস' অধ্যায়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি জাতির উত্থানের ঘটনাবিবরণ করার পাশাপাশি বাংলায় চতু:র্বর্ণের প্রথমবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি আরও ৩৬ প্রকার (পক্ষান্তরে ৪১) জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। বৃহৎধর্মপুরাণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দেখান ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের বাকি সকল বর্ণই হল সংকরবর্ণ। যা চতু:র্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌন মিলনের ফলে উৎপন্ন এক মিশ্রবর্ণ। আলোচ্য গবেষণা কর্মটি এমনই এক মিশ্রবর্ণের কাহিনী সমন্বিত। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নিম্নবর্ণীয় প্রান্তিক সমাজের নানান আঙ্গিক উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যিকদের হাত ধরে। বিভিন্ন কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস এর মাধ্যমে বাংলার প্রান্তিক সমাজের রূপরেখা তুলে ধরে সাহিত্যিকরা যে সামাজিক অবদান রেখে গেছেন তা অনস্বীকার্য। সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম সমাজদর্পন হিসেবে আপামর জনগণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তৎকালীন প্রান্তিক সমাজের হাল-হকিকতের সাথে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন উচ্চ ওর নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ সম্বন্ধে। উক্ত আলোচনায় সেই সমস্ত সাহিত্য কর্মের উপর নির্ভর করেই তুলে ধরা হয়েছে বাংলার এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা বাগদি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সংগ্রামের ইতিকথা।

সূচক শব্দ: বাগদি, নিম্নবর্গ, দলিত, নারি, বাংলা সাহিত্য

বাংলার তথা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাবো সেই হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে শ্রেণি বিভাজিত সমাজের অস্তিত্বের। যদিও সেই বিভাজনের ধরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দশকের পর শতক অতিবাহিত হয়েছে, সাথে সাথেই এই শ্রেণি ব্যবস্থায় এসেছে আরো জটিলতা। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় আরো কত না নামে। মানবসভ্যতার বহমান ধারা প্রাচীন থেকে আধুনিকোত্তোর যুগে পদার্পণ করলেও এই বিভাজনের জটিলতা কিন্তু কমেনি। বরং তা ভিন্নভিন্ন নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজমান। এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের কখনো না কখনো পথে ঘাটে সাক্ষাৎ হয়েছে। সৌভাগ্যবশত বেশ কিছু সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য কর্মের অবদানে আমরা এই সমাজের মানুষের সাথে আরো ভালো ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তার বাঙ্গালীর ইতিহাস নামক গ্রন্থে

যাদের উল্লেখ করেছেন চতু:বর্ণ এর পারস্পরিক যৌন মিলনের ফলে উৎপন্ন এক মিশ্রবর্ণ হিসেবে। মূলত ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং বৈশ্য নারীর মিলনের ফলে উৎপন্ন এমনই এক সংকর বর্ণ হলো 'বাগদি'। বাগদিদের আদিবাসস্থান ছিল যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়ার (বর্তমান ভারত) বিভিন্ন এলাকায়। যে গ্রাম্য বাংলার সহজসরল জীবনযাপনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে নানা উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায়, গল্পে আর ছোটগল্পে; যেখানে মিলন হতে গিয়েও যেন বিচ্ছেদের ট্রাজিকের মাহাত্ম্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই প্রান্তিক জাতির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তুলে ধরা আমার বর্তমান আলোচনার উদ্দ্যেশ্য। সামাজিক জীব হবার দরুন বিভিন্ন ঘটনাচক্রের আবহে আমরা কমবেশি সকলেই ওয়াকিব যে, কিরূপে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়ে সাহিত্যের অঙ্গনে। তাই সাহিত্যকে বলা হয় সমাজদর্পণ। স্বল্প প্রেক্ষাপটের মধ্যেও তৎকালীন সমাজের ভালোমন্দ তথা সমাজচিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সাহিত্যিকরা। ভারতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ছাড়াও তাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয় এইসমস্ত সাহিত্যচর্চা। তবে এই সাহিত্যের পরিসরে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক সমাজের আলোচনা যে বহুকাল ধরে অনালোচিত থেকে গেছে। তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লাইনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়-

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রান্তিক সমাজের কম বেশি আলোচনা শুরু হলেও সেখানে আমরা বাগদি চরিত্রকে কোথাও পেয়েছি সহানুভূতি তো কোথাও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের পাত্র/পাত্রী হিসেবে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় বাগদি নারীদের বিপন্নতার ছবি কিছুটা এইভাবে তুলে ধরেছেন-

"....ওখানে চাঁদের প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগদির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে,
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে
সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে সব সন্তান আজ এ যুগের কু রাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে মৃতপ্রায়;
আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালবেসে
অন্ধকারে জমিদারদের চিরস্থায়ী
ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে
ঘুমায়ে গিয়েছে।"

বাংলা সাহিত্যের নিরিখে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী বাংলার প্রেক্ষাপটে বাগদি সম্প্রদায়ের বিশেষ করে সেই সমাজের নারীদের অবস্থানের সাথে তাদের বর্তমান আর্থ-

সামাজিক অবস্থান ও তাদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভবপর হবে। যা আঞ্চলিক তথা দলিত ইতিহাসচর্চায় নতুন তথ্য সংযোজন করবে। এই গবেষণা পত্রের দ্বারা দলিত বাগদি সমাজের করুনচিত্র সহ নারীদের দ্বৈত প্রান্তিকিকরণের হালহকিকত কিছুটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হলে এবং ভবিষ্যতের গবেষকদের বাগদি সহ অন্যান্য দলিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করলে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক রূপ লাভ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের ৫৯ টি তপশিলি জাতির অন্যতম একটি হল 'বাগদি'। বাংলা সাহিত্যে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা প্রদান আলোচ্য গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য। একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে উঠে আসা বাগদিদের মধ্যে শিক্ষা, শ্রম, স্বাস্থ্য, জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে এই জনজাতির সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল এবং বর্তমানে তার কতটা উন্নতি ঘটেছে তা পুঙ্খানপুঙ্খ আলোচনা করার তাগিদ অনুভব করেছি। কারণ বাগদি সমাজ নিয়ে পূর্বে কমবেশি আলোচনা হলেও এই সমাজের মহিলাদের প্রতি প্রতিনিয়ত ঘটা মৌখিক অবমাননার করুন দিক নিয়ে যথাযথ আলোচনা হয়নি, যা বাংলা সাহিত্যের নিরিখে সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

"বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় উন্নতি করে -আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও একইস্থানে স্থানুব্য নিশ্চল ইইয়া থাকে।.... আমাদের দেশের ওই মুন্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেনো রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?"

(আরণ্যক- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আত্মোপলব্ধির বিবিধ প্রকাশ: বাংলায় নিম্নবর্নীয়দের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি নামক অধ্যায়ে অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায় বলতে বুঝিয়েছেন, জনজাতি, নিম্নজাতি, বঞ্চিত নারী, কৃষি, শিল্প, অসংগঠিত শ্রমিক এর মিলিত জনগোষ্ঠীকে।[১] এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাগদি সম্প্রদায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলায় ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে বাগদি সমাজের রূপরেখাটি ঠিক কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করব। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সাহিত্যচর্চার বিষয়টি শুরু হয়েছিল উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের হাত ধরে। অধ্যাপক বর্মণের মতে, সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়গুলির জীবনযাপন বর্ণনা হয়েছে দুটি দিক থেকে, প্রথমটি হল, উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকদের রচনায় নিম্নবর্ণীয়দের অসম্মানজনক পরিচিতি এবং দ্বিতীয়টি হল উচ্চবর্ণীয়দের রচিত সাহিত্যে নিম্নবর্নীয়দের সহানুভূতিশীল অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করব এই দুইধারার অন্তর্গত সাহিত্যকর্মে বাগদিদের অবস্থানকে তৎকালীন সাহিত্যিকরা কিভাবে বর্ণনা করেছেন। এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকদের বেশকিছু উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক।

বাংলা সাহিত্যের লেখাপত্র ঘাঁটলে দেখা যায় মোটামুটি চতুর্দশ শতক থেকে নিম্নবর্গীয় সাহিত্যচর্চায় বাগদি জনগোষ্ঠীর জীবনধারার যে চর্চা বাংলায় শুরু হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (বিশ্বনাথ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), গুণময় মান্না-র (অহোরাত্র, ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ) মত সাহিত্যকদের হাত ধরে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেই ধারায় জোয়ার এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের বামুনের মেয়ে (১৯২০), অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬), বিপ্রদাস (১৯৩৫), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাষাণপুরী (১৯৩৩), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), আখড়াইয়ের দীঘি (১৩৪০), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী (১৯২৮), ইছামতী (১৯৫০) আরণ্যক (১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), বাগদিপাড়া দিয়ে (১৩৫৫) সমরেশ বসুর বাঘিনী (১৯৬০), দুলে বাড়ির ভাত, মহাশ্বেতা দেবীর আঁধারমানিক (১৯৩৩), বান (১৯৬৮) - এর মত সাহিত্য কর্ম।

এইসমস্ত লেখক, লেখিকার রচনা বিস্তারে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাবো বেশিরভাগ উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকদের রচনায় নিম্নবর্ণীয়দের অসম্মানজনক পরিচিতি ও নিম্নবর্নীয়দের সহানুভূতিশীল অবস্থান। পাশাপাশি এও দেখা যায় বেশকিছু লেখক বাগদি চরিত্রকে শৌর্য, বীর্যের প্রতীক হিসেবে গৌরবান্বিত করেছেন তো কখনো তাদের কালিমালিপ্ত করেছেন। যেমনটা আমরা লক্ষ্য করি তাঁরাশঙ্করের কালিন্দী ও আখড়াইয়ের দীঘি- তে। আবার কেউ বাগদিদের সামাজিক মানদন্ড তুলে ধরেছেন একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। যার প্রমাণ মেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে উপন্যাসে। তিনি যেমন অহেতুক অন্ত্যজ শ্রেণির অতীতকে গৌরবালোকে আচ্ছন্ন করেননি, তেমনই ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শকেও মলিন করেননি। তিনি রূপা বাগদি নামক চরিত্রর মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির কথা তুলে ধরেছেন। রূপা বাগদির রাজত্ব ছিল সপ্তডিঙ্গায়। এই উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে- "বাগদীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায় কেবল বাগদী; বাগদীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগদী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, 'সব বাগদী সাজ।' বাগদিরা কেবল লড়ে।....দশ হাজার বাগদী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল।" গান বেজে ওঠে:

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া,
সাড়া গেল বামনপাড়া।"[২]

প্রথমেই আসা যাক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের আলোচনায়। 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪), তে এক জমিদার বাড়ির জাঁকজমক ও অর্থসম্পত্তির প্রতিপত্তির পাশাপাশি উঠে আসে গল্পের অন্যতম নারীচরিত্র প্রফুল্ল। যার জাতি পরিচয়ের সাথে লেখক পাঠকদের অবগত করান বৌমার প্রতি শ্বশুরের এই বাক্যবাণের মধ্য দিয়ে - "এত বড় স্পর্ধা সেই বাগদি বেটি আমার বাড়িতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"[৩] অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি একটি জমিদার বাড়ির বউয়ের সব ঐশ্বর্য্য মিলিয়ে যায় তার নীচু জাতে জন্মগ্রহণের জন্য। একই উপন্যাসে বাগদি মহিলাদের সামাজিক মানসম্মানের বিবরণ মেলে লেখকের এই উক্তির মধ্য দিয়ে- "পুকুরে পুকুরে, মাছ মহলে ভারী হুটহুট, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্মে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে মাগীদের হাটাহাটিতে জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল।"[৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর গল্প - উপন্যাসের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো তিনি কখনো বাগদিদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছেন তো কখনো মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে বাগদি জাতিকে একটি অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে দেখিয়েছেন। ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে মাছ চুরির জন্য রুপলাল বাগদিকে শাস্তির বিধান দিতে দেখা যায়। ছোটগল্প আখড়াইয়ের দীঘি (১৩৪০), -তে বাগদিদের একটি দুর্দমনীয় ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচয় দিয়েছেন কালি বাগদি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। লেখক বাগদিদের কাহিনি বর্ণনায় বলেছেন- "নিকষ কালো অন্ধকারে বাগদিরা বসে থাকে মদের ভাঁড় সামনে রেখে, খুনের নেশা যাতে কিছুতেই ছুটে না যায়। মানুষ মারে তারা। নবাবের পল্টনে একদা যারা কাজ করত, ব্রিটিশ রাজ্যে যাদের কাছে পরিবর্ত কোন পেশাই উপযুক্ত বোধ হয় নি। মাটির সঙ্গে মিশে চাষ-আবাদ করে জীবনধারণ করাকে মনে হয়েছে পৌরুষের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।"[৫] এই নাটকে তাঁরাশঙ্কর বাগদি সম্প্রদায়ের মর্দানি চরিত্র কালি বাগদিকে শৌর্য, বীর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। যার পেশা ছিল লাঠিয়াল। চরম দারিদ্রের দিনেও সে চাষবাসের মত কাজ করতে চাননি কারণ সেখানে দৈহিক শক্তির প্রদর্শন তুলনামূলকভাবে কম, যাকে তিনি বলেছেন মেয়েছেলেদের কাজ। লেখকের ভাষায়, "আজও আমাদের কুলের ঘাম লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল তখন থেকে এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর চাষ আমাদের জাতের কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।"[৬] অন্যদিকে তিনিই আবার অন্ত্যজ, অবহেলিত মানুষগুলিকে বিভিন্ন সংকট থেকে বেরিয়ে আসার এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। যেমনটা আমরা দেখতে পাই, পাষাণপুরী- র (১৯৩৩) কালী কর্মকার চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। যেখানে কালি তার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং প্রতিশোধের নেশায় ব্রাহ্মণ বন্ধুকে হিংসাত্মক আঘাত করলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও তার উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের কেউ খবর জানতে চায়নি। দীপান্তর নাটকে কালি বাগদি চরিত্র, যে বার বার প্রতিবাদ জানায় তার অত্যাচারী মহাজন, জমিদার ও অবশেষে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তার কথায়- "পেটের দায়ে হুজুর রায়বাবুদের জন্য দাঙ্গাবাজি, ঘর জ্বালানো ছিল আমার পেশা ... যে ভগবানের বিধানে আমার বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায় আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমরা মানিনা।"[৭] কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এক প্রভাবশালী চরিত্র মি. মুখার্জিকে যিনি বাগদিদের মত বৃন্তচ্যুত ভূমিহীন কৃষকদের জীবন আরো দুর্বিষহ করে তুলেছেন তার শোষণ ও বঞ্চনার দ্বারা। তাঁরাশঙ্করের উপন্যাস প্রান্তিক জীবন নামক লেখনীর দ্বারা তৎকালীন সময়ে নিম্নজাতিদের অবস্থার বিবরণ করেছেন এইরূপ- "বিমল মাঝির লোভাতুর নেশার করাঘাত নেমে আসে লাবণ্যময়ী সারীর জীবনে। রাতের অন্ধকারে উচ্চবর্ণের কাছে নিম্নবর্গের নারীরা যেন ক্ষুধানিবৃত্তির সহজলভ্য কাঁচামাংস। আর সকালের আলোয় উচ্চ সমাজপতিরা নিজেদের রাত্রির কদর্যতায় হাতমুখ মুছে পরিষ্কার করে নেয়। এই উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে জাতে ওঠার প্রচেষ্টা নিজেদের উচ্চবর্গের কাছে মাথা নত করে বশ্যতা মেনে নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।"[৮]

একই সুরের প্রতিফলন দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি (১৯২৮) উপন্যাসে। লেখক লিখেছেন: "ব্রিটিশ শাসন তখনও এদেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙারে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগদি, বাউরী শ্রেণীর লোক।" বেশিরভাগ সময়ই উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যকদের উপন্যাসের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ পরিবারের কাহিনি থাকলেও প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নিম্নবিত্ত শ্রেণির সংসারের করুণ ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই উপন্যাসেরই সর্বজয়া তার রুক্ষচুল, মলিনমুখবেশী মেয়ে দুর্গার উদ্দ্যেশে বলেন, "এসো, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো, তারপর আবার কোনদিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাঝের দিন সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করছে, শিবপুজো করছে, আর অতবড় ধাড়ি মেয়ে- দিন রাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েছে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী- মাথাটার ছিরি দ্যাখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো-- কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগদিদের কেউ— বিয়েও হবে ঐ দুলে-বাগদিদের বাড়িতেই।"[৯] আবার এই বিভূতিভূষণই অনার্য শাসিত ভারতবর্ষের উপর আর্যদের আধিপত্য বিস্তার ও অনার্যদের করুন দুর্দশায় করুণা প্রকাশ করেছেন তার লেখা আরণ্যক (১৯৩৯) উপন্যাসে- "দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন- ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস-এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস- বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই- কিমবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চুর্ণায়মান অস্থি কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।"[১০]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী - তে (১৯৫০) লেখক ইছামতী নদীর তীরের প্রান্তিক মানুষগুলি যেমন, হাড়ি, মুচি, বাগদি, সাঁওতাল জীবনসংগ্রাম তুলে ধরেছেন। অপরাধপ্রবণ দস্যু, ডাকাত জাতি বলে পরিচিত হাওয়া সত্বেও একজন বাগদি মহিলা গয়া-র চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন প্রান্তিক মানুষ গুলোর মায়া-মমতা ভরা ব্যক্তিসত্বাকে। তিনি লিখেছেন- "গয়া বরদা বাগদিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এই জন্যই ওর নাম এ অঞ্চলে গয়া মেম। গয়া খারাপ লোক নয়, ধরে পড়লে সাহেবকে অনুরোধ করে অনেকের ছোট বড় বিপদ সে কাটিয়ে দিয়েছে। মেয়েমানুষ কিনা, পাপ পথে নামলেও ওর হৃদয়ের ধর্ম বজায় আছে ঠিক।"[১১]

আবার অন্যদিকে পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬) উপন্যাসে দরিদ্র মানুষগুলির প্রকৃতির সাথে টান অর্থাৎ মাঝি হিসেবে দিনযাপন। লেখকের সৃষ্ট চরিত্র কুবেরের মতই বাগদি সমাজের মানুষেরা গরিবের মধ্যে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এসবের মধ্যে দিয়েই লেখক তুলে ধরেছেন দারিদ্রতা কিভাবে শিশুর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে - "জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয়না। ক্ষুধার

দেবতা হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পীড়া কোনদিন সাঙ্গ হয় না।..... ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ঐ ভদ্রপল্লীতে, তাহাকে এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"[১২] সাহিত্যের মাধ্যমে এইসমস্ত লেখকরা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই সময়ের সমাজে বাগদি জাতির সাথে উচুঁ জাতের মানুষের ভেদাভেদ ও তাদের আলাপ-ব্যবহারের ছবি। যা আমরা দেখতে পাই, বাগদি পাড়া দিয়ে নামক ছোট গল্পে। যেখানে এক দিনমজুরের বেদনার কথা লেখক তুলে ধরেছেন, - "খাটুনি, খিদে আর মনের কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। অর্ধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, একবেলার বেশি বেগার খাটাল, এক মুঠো গুড়মুড়ি পর্যন্ত জল খেতে দেয়নি! এত বেলায় এসে তাকে বসিয়ে রেখে নিজে আরামে নাইতে খেতে গেল। ...বেল গাছের মতই এরা নিষ্ঠুর"।[১৩] বাগদি পাড়ার খেটে খাওয়া মানুষগুলি ছাড়াও লেখক এইসমস্ত এলাকার পরিবেশ নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। বাগদি পাড়ার বিভিন্ন ঘর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে ভেসে আসে অভুক্ত শিশুদের ঘুম পাড়ানি গান- "আয়রে ঘুম যায় রে /বাগদি পাড়া দিয়ে, বাগদিদের ছেলে ঘুমাল জাল মুড়ি দিয়ে"।[১৪] শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে (১৯২০) উপন্যাসে অচ্ছুৎ দুলে-বাগদিদের প্রতি সীমাহীন অবহেলা আমাদের একাধিক প্রশ্নের মুখে দাড় করিয়ে দেয়। বাগদিদের নিয়ে সমাজে যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মনোভাব তা এই উক্তির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে- "তোর দাদামশাই রামতনু বাড়ুয্যে একটা- ডাকসাইটে কুলীন, তার ভিটে-বাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগদী-দুলে! কি ঘেন্নার কথা মা!" এবং "কোন ভদ্দরলোকটা ভিটে-বাড়িতে ছোট-জাত ঢোকায় শুনি? লোকে কথায় বলে, দুলে! সেই দুলে এনে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়েছে?" "আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে ত আমাদেরই পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের জল মাড়া মাড়ি করে আমাদেরই ত হাঁটতে হবে। তা হলে কি আর জাত জন্ম থাকবে?"[১৫] লেখকের অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬) গল্পের অন্যতম চরিত্র অভাগীর মৃত্যুর পর তার ছেলে কাঙালী পরিচিত হয় সমাজের বর্ণীয় স্বৈরাচারিতার সাথে। যেখানে নিজের উঠোনের গাছে কুড়ুল বসাবার অধিকার নেই কাঙালীর। মায়ের সৎকারের জন্য হতভাগ্য দুলে বালককে একখণ্ড কাঠও সেই সমাজ দেয়নি। সে ভাবতে পারেনি সমাজ এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর হয়ে যায় তাদের মত নিচু জাতির জন্য! যার প্রমাণ মেলে গল্পের কথোপকথনে - "ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?
অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?
কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে!"

ভট্টাচার্য মহাশয় অদুরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন- "তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।" ব্যঙ্গ করে বলেন- "দেখেছেন ভট্টাচার্য মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়"।[১৬] অন্যদিকে আবার এই গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক দেখান, অভাগী তার স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুশয্যায় সেই স্বামীরই চরণধুলি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন। সংসারিক জীবনে স্বামীর থেকে শত লাঞ্ছনা বঞ্চনা পেলেও অভাগী নামক মহিলা চরিত্রটিকে লেখক স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় ভরপুর হিসেবেই তুলে ধরেছেন। সমাজ, সংসারের থেকে বিতৃষ্ণা পেলেও তার প্রতিবাদী সত্ত্বার উন্মেষণ করেননি।

গ্রাম্য বাংলার সহজসরল খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাপনের কাহিনী সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে বারংবার। তিনি বলেছেন- "সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনেরই কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়ো, এ সত্যের জন্য, সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।"[১৭] বাঘিনী (১৯৬০) উপন্যাসে দুর্গা বাগদি নামক নায়িকার চরিত্রকে দেখানো হয়েছে, যিনি চোলাই মদ বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। বাগদি-র মত নিচুজাতিতে দিনযাপন করার জন্যেই তার এমন পেশাতে কোনো বাধা আসেনি। সমাজ তাদের এমনিতেই সভ্য মানুষের পরিধিতে ধরে না, সুতরাং তাদের পেশাও যে তার ই পরিচয়বাহক হবে তা বলাইবাহুল্য। বাঘিনী উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন- "এ উপন্যাস এমন একটি দর্পণ, যে ধার আমিই তরল করেছি, ছাঁচে ঢেলেছি, তবু যদি কেউ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন সেটা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। তার জন্য এ দর্পণের কোন দোষ নেই।"[১৮] দুলে বাড়ির ভাত গল্পে ব্রাহ্মণ হয়েও বৃন্দাবনের স্ত্রী শিবানী যখন ক্ষুধার তাড়নায় গোবরা দুলের বাড়িতে ভাত খায় এবং তা জানা মাত্রই এলাকায় ঢি-ঢি পরে যায়। "বৃন্দাবনের স্ত্রী, গোবরা দুলের বাড়িতে পরশুদিন ভাত খেয়েছে। দুলে বাড়ির ভাত, বামুনের বউয়ের পেটে। ছি ছি ছি, তার আগে, অমন বেটার বউ কেন শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ননদ স্বামী পুত্রের মুখে বিষ তুলে দিয়ে যায়নি। গাঁয়ে আর টেকা যাবে না।"[১৯] এইসমস্ত সাহিত্য কর্মের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তৎকালীন সমাজ। যেখানে ধরা পড়ে প্রান্তিক সমাজের শৌর্য, বীর্য আর ধীর স্থিরতা। আদিবাসীদের সব আছে, পাহাড়ের ধৈর্য, নদীর শান্তি। প্রতিটি আদিবাসী যেন এক মহাদেশ। কিন্তু আমরা তো জানতে চাইনি। ওদের শ্রদ্ধা করতে শিখিনি"।[২০] ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের বান এবং গঙ্গার তীরের কোনো এক গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাকৃতিক দূর্যোগ বান যখন মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার কাহিনী মহাশ্বেতা দেবী বান, (১৯৬৮) নামক গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেখানে আমরা দেখি রূপসী নামক এক বাগদি মহিলার রূপে আকৃষ্ট হয়ে, বলা যেতে পারে একপ্রকার তার রূপের ছটাকে স্তিমিত করে দিতে বড় আচার্য্য নামক এক ধনী ব্যক্তির সাথে গড়ে ওঠে রূপসীর অবৈধ সম্পর্ক। নদীর পাড়ের সমস্ত বাগদি, চাড়াল, মালো, বেদে জাতির মানুষদের আশ্রয়দাতা হিসেবে নিজের উঠোনে ঠাঁই দিয়েছিলেন যিনি, সেই রক্ষককেই দেখা গেছে ভক্ষকের ভূমিকায়। "গঙ্গার কোনও এক ভয়ঙ্কর বানের ধাক্কা সাময়িকভাবে হলেও জাতপাতের বিভাজনকে আড়াল করেছিল, উঁচু জাতের ক্ষমতাবান প্রতিভূরা অন্ত্যজ দরিদ্রদের তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য পরিবেশন করেছিল। সেই একবারই অন্তেবাসীদের হৃদয় ও পেটের ক্ষুধা শান্তি পেয়েছিল। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই অনাহার অর্ধাহারে থাকা মানুষগুলি স্বপ্ন দেখে পেট ভরে খাওয়ার।"[২১] ছোট্ট বালক চিনিবাস যে বোঝেনা জাতপাত, তার কাছে এই বান-ই আনন্দের। কারণ, দুবেলা দু মুঠো পেট ভরে সে খেতে পারছে। বড় আচার্য্যর বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছে। আলোচ্য গল্পে দুই মহিলা চরিত্রের আলোচনায় উঠে আসে সেই প্রতিচ্ছবি- "হ্যাঁ গো বামুন- মা, সোনার গৌরাঙ্গ এলে আমরা নাকি একসঙ্গে দাওয়ায় বসে প্রসাদ পাব?' কি বললি ?....আ গো, তিনি চাঁড়াল-বাগদী নিয়ে নাচতেছে, নাচুক গা!। মনিষ্য না দেবতা না তিনি কি বস্তু তা কি আমরা জানি? তিনি বান আনছেন, বানের সঙ্গে ভেসে চলে যাব গো!"[২২]

গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই রূপসী তার ছেলে চিনিবাসের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন- "তা হলে সবাই জানবে চিনিবাসও মানুষ; রূপসীও মানুষ... রূপসীর খুব ইচ্ছে করে গৌরাঙ্গকে জিগ্যেস করে, কাউকে দিয়ে জিগ্যেস করায়, একটি অহংকারী পুরুষের এক সন্তান বাগদি বলে চিরদিন গরীব হয়ে থাকবে, ঘরের ছেলেটির শত ভাগের এক ভাগও পাবে না, এ কেমন বিচার?"[২৩] বড় আচার্য্য পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেও বাগদি পরিবারে জন্ম নেয়ার অপরাধে রূপসীর আর তার অবৈধ সন্তানকে (ছেলে) জাতে তোলা গেলো না। চৈতন্যর ভক্তিআন্দোলন সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বানে ভাসিয়ে দিলেও সেই বান কিন্তু আদতেই মানুষের মধ্যে থেকে উচুনিচুর ভেদাভেদ নির্মূল করতে পারেনি। সাময়িক হলেও যা পেরেছিল গঙ্গার বান।

একজন সাহিত্যিকের খ্যাতি পরিচিতি পায় তাঁর সাহিত্যকর্মের দ্বারা। যা আসে শিক্ষার হাত ধরে। নিম্নবর্ণ হিসেবে পরিচিত এরকম এক একটি জাতিগোষ্ঠী মিলে জন্ম দেয় বৃহৎ দলিত পরিবারের। দলিত শব্দের আভিধানিক অর্থ (দ+ত(স্ম)-বিন) যাকে দলন করা হয়েছে, অর্থাৎ 'মর্দিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত এবং বিভক্ত'। 'দলিত' কোনও একটি জাতি নয় বরং একটি উপলব্ধি, যা ভারতীয় হিন্দু সমাজদেহের নিম্নস্তরের মানুষের অভিজ্ঞতা, আনন্দ, বেদনা ও সংগ্রামের সাথে যুক্ত।"[২৪] অন্যদিকে মনোহর মৌলী বিশ্বাস 'দলিত' এর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'দলিত' শব্দটির সাধারনীকরন এর মাধ্যমে। তিনি বলেন, সমাজস্থিত যে কোনো মানুষ যে কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে, সেই ব্যক্তিকে দলিত বলা যেতে পারে। সুতরাং বাগদি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর চরিত্র ও জীবনযাপনের রূপরেখা দেখে আমরা বলতে পারি যে তারা প্রকৃতই প্রান্তিক ও দলিত।

আনারুল হকের লেখা বাংলাদেশে হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠী - তে সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণির সংগ্রাম বর্ণনায় দলিত জনগোষ্ঠীর মুখবন্ধ তে উল্লেখ করেন, কেউ গ্রহণ না করলে প্রতিধ্বনি ফিরে এসে কথাগুলো শুধু আমারই হতে পারে। তাঁর এই কথাটির সাথে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বাগদি সহ অন্যান্য নিম্নবর্ণীয়দের আত্মকথা সমাজের কাছে পৌঁছে দেয়ার মধ্যে। এই ধরনের কথার অর্থ হল দীর্ঘদিন কুসংস্কার ও অশিক্ষার আবহে থাকার ফলে তেমন কোনো সাহিত্যকর্ম ও বাগদি সমাজের ঝুলিতে জমা পড়েনি। এমনকি তাদের নিয়ে কথা বলা বেশিরভাগ উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকই তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে কার্পণ্য দেখিয়েছেন। উইলিয়াম হান্টার (বাগদিদের নিয়ে সবথেকে বেশি গবেষণা করেছেন), জেমস ওয়াইজ ও রিজলের মত ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও বাগদিদের যথাযথ মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসেননি। তবে সাম্প্রতিক কালে বহু সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে বাগদি সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছেন। একাধিক সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক বাগদি সম্প্রদায়কে নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করছেন। এই সমস্ত লেখকের বিভিন্ন রচনা বাগদি সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শ্যামচাঁদ বাগদি রামপুরহাটের ইতিহাস গ্রন্থে রামপুরহাট অঞ্চলের ইতিহাসকে এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। ড. বিকাশ বাগদি বাংলা সাহিত্যে বাগদি সমাজ গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে বাগদি জাতির জীবনধারার বিভিন্ন তথ্য সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। জন্মসূত্রে বাগদি না হয়েও বাগদিদের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরেছেন মিলন রায়

তাঁর বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন - এ। যা ভবিষ্যতে এই জাতির মানুষদের নিয়ে গবেষণায় এক নতুন গতি আনবে। যদিও এই সমাজে হাতে গোনা গুটিকয়েক পুরুষ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলেও কোনো মহিলা সাহিত্যিকের দেখা মেলেনি এখন পর্যন্ত। তার পিছনে রয়েছে বাগদি সমাজের চরম প্রান্তিকতা। তবে কল্যানী ঠাকুরের চণ্ডালিনীর বিবৃতি (২০১২), আমি কেন চাঁড়াল লিখি (২০১৬), মঞ্জু বালার চতুর্থ বিশ্বের চিত্রলেখা, (২০১৭), লিলি হালদার এর ভাঙ্গা বেড়ার পাঁচালি (২০১১) ও অথ লীলাবতী কথা, (২০২০), তৃষ্ণা করাতির দলিত নারীর আত্মকথা (২০২১), প্রমুখ মহিলা দলিত সাহিত্যিকদের থেকে প্রেরণা নিয়ে উঠে আসবে বহুসংখ্যক বাগদি নারী সাহিত্যিকগণ। সাহিত্যের পাশাপাশি বেশকিছু বাংলা চলচ্চিত্রেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাগদি জনগোষ্ঠীর সমাজসংকটের নানান চালচিত্র। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত সুবর্ণরেখা (১৯৬৫)। সাহিত্যে বাগদি সমাজের পেশাগুলি দেখলেও তাদের সামাজিক অবস্থান অনুমান করা যায়। এযাবৎ লিখিত সাহিত্যে সমস্ত চরিত্রই হয়ে উঠেছে খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের প্রতীক। মিলন রায়ের করা ক্ষেত্র সমীক্ষায় এইসব পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে লেখক, বিধায়ক, গ্রামীণ ডাক্তার, শিক্ষক, গবেষক ও করণিকের মত পেশার উদ্ভব যে ঘটেছে তা লক্ষ্যনীয়।

তথ্যসূচী :

১. বর্মণ, রূপ কুমার, সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি - রাজনীতি তপশিলি সমাজ, প্রথম সং., কলকাতা: গাঙচিল, ২০২২, পৃ. ৭৮

২. রায়, মিলন, বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন, প্রথম সং., কলকাতা:গাঙচিল, ২০২১, পৃ.২০১

৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবী চৌধুরানী, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১৭, পৃ. ১৩ - ১৭

৪. তদেব

৫. বিশ্বাস, অচিন্ত, বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখান. কলকাতা: পুর্বালোক, মিলন রায় (সম্পাদিত), বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন, কলকাতা, পৃ. ৯

৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪

৭. সরকার, প্রণব, বাগদি পাড়া দিয়ে. প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি, শারদ সংখ্যা, সোনারপুর, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৮

৮. রায়, মিলন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৯. বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষন, পথের পাঁচালী-বিভূতি রচনাবলী, কলিকাতা: মিত্র অ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৩ - ২০৪

১০. বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষন, আরণ্যক. কলিকাতা: মিত্র অ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭৬, পৃ. ১০৭

১১. বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষন, ইছামতী, বিস্তৃতি উপন্যাস সমগ্র (২য় খন্ড), উপন্যাস সময়, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ১১৭

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মা নদীর মাঝি, কলকাতা: পত্রভারতী, ২০১৭, পৃ.২৬৫

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, বাগদিপাড়া দিয়ে: উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ২৬৭

১৪. তদেব
১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বামুনের মেয়ে, কলিকাতা: অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৮৮৭, পৃ. ৩ - ৯
১৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, অভাগীর স্বর্গ, শরৎ রচনাবলী, কলিকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩
১৭. বসু, সমরেশ, সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ১৯৬১, পৃ. ১৪-১
১৮. বসু, সমরেশ, বাঘিনী, কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৭, পৃ. ভূমিকা পৃষ্ঠা
১৯. বসু, সমরেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
২০. দেবী, মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৫৮
২১. মিলন, রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
২২. দেবী, মহাশ্বেতা, বান: মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, পৃ. ৪
২৩. তদেব
২৪. বিশ্বাস, মনোশান্ত, বাংলার মতো আন্দোলন সমান সংস্কৃতি রাজনীতি, কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ১৯৫

উত্তরবঙ্গে গান্ধিজি এবং সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ড. সমিত ঘোষ,
শিক্ষক ও ইতিহাস গবেষক

সারসংক্ষেপ :

গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণময়। দক্ষিণ আফ্রিকা গমন এবং চম্পারন সত্যাগ্রহ ছিল তার সাফল্যের মাইলফলক। সত্যাগ্রহ ছিল তার সাফল্যের চাবিকাঠি। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন সাধারণ মানুষকে আন্দোলিত করেছিল এবং গান্ধিজি সেই আন্দোলনের উত্থল তরঙ্গ ছিলেন।তিনি বৈচিত্র্যময় ভারতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা রূপরেখা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন তা নিয়ে তর্ক হতেই পারে। তবে অহিংস এবং সত্যাগ্রহ এই দুইয়ের মেলবন্ধনে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। যদিও অনেকে দেশভাগের দায় গান্ধিজির উপর চাপিয়ে দেন। কিন্তু এর সত্যতা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে তিনি এমন এক মানুষ যে গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি আন্দোলিত করেছিলেন। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে মাউন্টব্যাটেন -গান্ধি, চিত্তরঞ্জন -সুভাষ এরকম নানা সমীকরণ ভেসে ওঠে। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির ভূমিকা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। সেজন্যই হয়তো গুজরাট থেকে উত্তরবঙ্গ সর্বত্রই তিনি ছিলেন প্রাসঙ্গিক।

সূচক শব্দ : উত্তরবঙ্গ, সত্যাগ্রহ, উপনিবেশিক, জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ।

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে একটা সমন্বয় রয়েছে। গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবন মোটামুটিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের (Apartheid) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়ে শুরু হয়েছিল। আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা গান্ধিজির এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে এলেন। গান্ধীজি এরপর চম্পারনে নীল চাষীদের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের পক্ষ হয়ে করমুক্তির কথা বলেন। এর পরের বছর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নানা ঘটনাকে সংযুক্ত করেছিল। ইতিহাসের পরতে পরতে সে ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের তুরস্কের খলিফা বিরোধী মত মুসলিম সমাজকে রুষ্ট করেছিল। আলি

ভ্রাতৃদ্বয় সৌকত আলি ও মহম্মদ আলির নেতৃত্ব শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধিজি এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের রাশ টানা। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার সিডনি রাউলাট কুখ্যাত রাউলাট আইন পাশ করেন। এই আইনে সন্দেহের বশে যে কোন কাউকে গ্রেপ্তার করা যেত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার যে বর্বরতা দেখায় রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পদত্যাগ করে তার প্রতিবাদ করেন।[২]

যাইহোক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬-২৭ ডিসেম্বর, মহারাষ্ট্রের বেলগাঁওতে ৩৯ কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধিজি সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধিজি স্বরাজ অর্জনের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন- (ক) চরকা, (খ) হিন্দু- মুসলিম ঐক্য ও (গ) অস্পৃশ্যতা বর্জন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে গান্ধিজি দিনাজপুর এলেন। তিনি ময়মনসিংহ হয়ে অখন্ড উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে দিনাজপুর আসেন। গান্ধিজি ট্রেনে মহিলাদের বলেন 'রুপয়া দো'।[৩] মহিলারা তাদের অলঙ্কার গান্ধিজিকে অর্পণ করেন। গান্ধিজি দিনাজপুরে সভা করেন।[৪] সেখানে ছিলেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। গান্ধিজির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই সেই সভার বর্ণনা দিয়েছেন।[৫] গান্ধিজি অস্পৃশ্যতা নিয়ে ভাষণ দেন। Young India পত্রিকাতে ০৪/০৬/১৯২৫ তে সেটি প্রকাশিত হয়।[৬] তিনি একটি মন্দিরের উদ্বোধন করেন। গান্ধিজির সঙ্গে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নিশীথনাথ কুণ্ডুর সাক্ষাৎ হয়। রাতে গান্ধিজি যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাড়িতে ছিলেন।

গান্ধিজি এরপর দার্জিলিংয়ে যান। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩-৯ জুন গান্ধিজির উত্তরবঙ্গ যাত্রার সঙ্গী ছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত, মহাদেশ দেশাই প্রমুখ। চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে গান্ধিজির সাক্ষাৎ হয়। গান্ধিজি হিন্দুপাবলিক হলে একটি মহিলা সভাতে অংশগ্রহণ নেন। চরকা নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। রতনলাল ব্রাহ্মণ বাপুকে প্রধান করেন। এই রতনলাল ব্রাহ্মণই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এদিকে ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাস মারা যান।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন গান্ধিজি শিলিগুড়ি আসেন। তিনি রাতে শিউমঙ্গল সিং (শর্মা) এর বাড়িতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে পাহাড় ও সমতলের জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। দার্জিলিং এর জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। তবে এস. এন. ব্যানার্জি যখন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন তখন দার্জিলিঙে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। সুতরাং দার্জিলিংয়ের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল। কালিম্পং শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। দার্জিলিঙে এরপর জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় পাহাড়ে দলবাহাদুর গিরি যেমন কংগ্রেসের মূল মুখ, তেমনি সমতলে (শিলিগুড়ি) শিউমঙ্গল সিং। শিউমঙ্গল সিং ছিলেন বিহারী এবং পড়াশোনা জানতেন না, ফলে গুরুত্ব পেতেন না কিন্তু বরিশালের হিরো সতীন সেন যখন শিলিগুড়ি এলেন তখন শিউমঙ্গল গুরুত্ব পেলেন। গান্ধিজি শিলিগুড়িতে সভা করেন। সেই সভায় প্রচুর রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। মহাদেব দেশাই লিখেছেন যে শিউমঙ্গল ৪৫০ টাকা গান্ধিজির হাতে তুলে দেন।[৭]

১৯২৫ সালের ১৪ জুন গান্ধিজি জলপাইগুড়ি আসেন। গান্ধিজির সঙ্গে ছিলেন

মহাদেব দেশাই, প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ দাশগুপ্ত, পাটনা থেকে আসেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। জলপাইগুড়িতে গান্ধিজির সঙ্গে চারুচন্দ্র সান্যাল, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, অন্নদাচরণ সেন, মধুসূদন দাশগুপ্ত দেখা করেন। স্টেশনে গান্ধিজিকে দেখার জন্য প্রচন্ড ভিড়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার বয়স ৫৬ বছর। আবার গান্ধিজির বয়সও ৫৬ বছর। গান্ধিজি জলপাইগুড়ি ইনস্টিটিউট এ বিকেলে জনসভা করেন। জগদিন্দ্রদেব রায়কত নিজে ছিলেন। প্রায় ২০-৩০ হাজার মানুষের জমায়েত ছিল।[৮] গান্ধিজি ১৫ জুন সতীশ কবিরাজের হরিজন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এছাড়া গান্ধিজি ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমিতির নেতা মধুসূদন রায়ের কন্যা বিমলা রায়ের প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দির বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কার্পাসের তুলো চরকার কেটে মালা তৈরী করে গান্ধিজিকে স্বাগত জানানো হয়।[৯]

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ১০০১ টাকা চাঁদা তুলে দেন গান্ধিজির হাতে। আমবাগানের সভায় ছেলে মেয়েদের সঙ্গে চরকা নিয়ে কথা হয়। যাইহোক ১৫ জুন গান্ধিজির আসাম যাওয়ার কথা কিন্তু পাহাড়ের ধস। প্রায় তিন ঘন্টা পর ট্রেন এলো। পার্বতীপুরে (রংপুর বিভাগ) স্পেশাল ট্রেন নিয়ে যায়। গান্ধিজি আসামে একদিন থেকে কলকাতায় যান। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মে ও জুন মাসে গান্ধিজির উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে উত্তরবঙ্গের জনমানসে বেশ বড় প্রভাব পড়েছিল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটে। খদ্দর ভান্ডার, দেশলাই কারখানা, সরষের তেলের কল গড়ে উঠতে শুরু করে।[১০] এসব দেশীয় শিল্প মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে।

এবার সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রাঙ্গনে গান্ধিজির ভূমিকা কি ছিল তা দেখা যাক। ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহেরু বিদেশে এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ অসুস্থ। এই সময় বল্লভভাই প্যাটেল রাজেন্দ্র প্রসাদকে চিঠি লিখলেন যে এমন একজনকে আপনারা কংগ্রেসের সভাপতি (সুভাষ চন্দ্র বোস) করেছেন যে তিনি জানেনই না সভাপতির কাজটা ঠিক কি? এবার ঘটনার ভিতরে ঢোকা যাক। সুভাষ চন্দ্রের মধ্যে যে এক একক শক্তির ক্ষমতা ছিল তা প্যাটেলকে অস্বস্তি দিত, এই তিক্ততা চরমে ওঠে যখন ১৯৩৩ সালে।[১১] প্যাটেলের দাদা বিঠলভাই প্যাটেল যখন জেনিভাতে দীর্ঘ অসুস্থতার পর যখন মারা যান।

তিনি মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির একাংশ ট্রাস্টের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র কে দিয়ে যান। মূলতঃ বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে এই অর্থব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে বিঠলভাই প্যাটেল মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ জেনিভা থেকে জাহাজে পার বম্বে বন্দরে আসে। পাটেল সেই সময় নাসিক জেলে। সমস্ত অন্তষ্টিক্রিয়াটির দায়িত্ব পড়ে সরোজিনী নাইডু-এর ওপর। পরে প্যাটেল উইলের বিষয়টি জানতে পারলে তিনি সরাসরি বলেন ঐ উইলের বৈধতা নেই। প্যাটেল বোম্বে হাইকোর্টে মামলাও করেন, পাল্টা সুভাষচন্দ্রও প্রবেট ফাইল করেন।[১২] সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি, তখনও সেই মামলা চলছে।

প্যাটেল ও সুভাষের মধ্যে একটা শীতল সম্পর্ক চলছে। ইতিমধ্যে কথা উঠলো পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাজকর্ম বোঝার জন্য সুভাষ চন্দ্র আবার সভাপতি হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু প্যাটেল গোষ্ঠী ও গান্ধিজি

বিরোধিতা শুরু করেন। গান্ধিজি প্রাথমিকভাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সমর্থন করলেন। এই সময়ে দেশজুড়ে আচমকা মুসলিম লীগের উত্থান হয়। জিন্নাহর আগ্রাসী দাবী ছিল যে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগ। এইরকম অবস্থায় গান্ধিজি চাইছিলেন আজাদকে সভাপতি করে মুসলিমদের মধ্যে একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে। এদিকে বরদৌলি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি পদের প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হয়। কিন্তু সুভাষ যখন জানালেন যে তিনি প্রার্থী হবেনই তখন আজাদ বিধায় পড়লেন কারণ তিনি জানেন সুভাষের জনপ্রিয়তা। সুতরাং আজাদ সরে দাঁড়ালেন।

গান্ধিজি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তিনি পট্টভি সীতারামাইয়াকে পছন্দসই প্রার্থী নির্বাচন করলেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজিকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, সুভাষকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক। গান্ধিজি উল্টে কবিগুরুকে বললেন আমার ব্যক্তিগত মত সুভাষ সভাপতি পদ থেকে অব্যহতি নিয়ে বাংলায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে মনোনিবেশ করুক। যাইহোক সুভাষ চন্দ্র বোস তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। শেষমেষ সুভাষচন্দ্র প্রতিপক্ষ হলেন গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া। কিন্তু সুভাষের জনপ্রিয়তার কাছে সীতারামাইয়া পরাজিত হন। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট পড়েছে ১৫৮০ ভোট এবং সীতারামাইয়া ভোট পেয়েছিলেন ১৩৭৭ ভোট। সুভাষ ২০৩ ভোটে জয়লাভ করেন।[১৩] সুভাষের সভাপতি পদে জয়লাভ গান্ধিজিকে ব্যথিত করে। তিনি বলেন পট্টভির পরাজয় হল আমার পরাজয়। গান্ধিজির এই প্রতিক্রিয়া সুভাষকে পীড়িত করে।

সভাপতি নির্বাচনের পর সুভাষকে নানা চাপ সহ্য করতে হয়। শেষে একরকম বাধ্য হয়েই তিনি পদত্যাগ করলেন। সুভাষ চন্দ্র নতুন দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল জওহরলাল নেহেরু গান্ধিজিকে দোসর করে একটি চিঠি লিখলেন - "সুভাষের এভাবে সরে যাওয়ার প্রতিরোধ করতে আপনার যা করা উচিত ছিল, সেটা আপনি করেননি, সুভাষকে আমরা যদি ধরে রাখতে না পারি সেটা চরম ক্ষতি"।[১৪] দূরত্ব আগেই তৈরি হয়েছিল, এবার সম্পর্কে তিক্ততা চলে আসে। যাইহোক ১৯৪৬ গান্ধিজির সামনে একটি ধর্ম সংকট আসে। এদিকে আগস্ট আন্দোলনের পর অনেক নেতা নেত্রী (কংগ্রেসের) কারাবন্দী। অতএব কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন কিভাবে হবে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন আবুল কালাম আজাদ। তাহলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন সভাপতি কে হবেন, প্যাটেল ও কৃপালীনি দুজনে আগ্রহী, সকলে তাকিয়ে গান্ধিজির দিকে। তিনি কি বলেন? গান্ধিজি বেছে নিলেন জহরলাল নেহেরুকে, প্যাটেল সরে দাঁড়ালেন। বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আগামী দিনে জওহরলাল নেহেরুকে গান্ধিজি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু সরকার চালানোর সময় নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে এত মতান্তর হয়েছিল যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দুজনেই গান্ধিজির কাছে এসে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গান্ধিজির শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন কে অসহায় ভাবে বলেছিলেন আপনি দুজনের সঙ্গে কথা বলে বোঝান।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি বিকাল

৫:১৭ মিনিটে নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হলেন গান্ধিজি। দেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন। এরপর নেহেরু ও প্যাটেল ঠিক করলেন যে বাপুর স্বপ্নের ভারত তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে একটি বিষয় সামনে এলো সেটি হল কে হবেন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি। ভারত এতদিন অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মধ্যে ছিল, সাধারণতন্ত্র হিসাব আত্মপ্রকাশ করার পর সেই স্থলাভিসিক্ত হবেন রাষ্ট্রপতি।[১৫]

নেহেরুর পছন্দের প্রার্থী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। প্যাটেল সমর্থন করেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে। কিন্তু কংগ্রেসের অন্তরে প্যাটেলের প্রভাব বেশি থাকায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। এবার বিরোধ শুরু হলো। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে। এক্ষেত্রে প্যাটেলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন কিন্তু টেন্ডনের অতিরিক্ত হিন্দি প্রীতি নেহেরুর পছন্দ ছিল না। হিন্দি ভাষাকে সর্বোচ্চ চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন নেহেরু। নেহেরুর পছন্দের প্রার্থী ছিলেন জে. বি. কৃপালনী।[১৬] সভাপতি নির্বাচনে লড়াই হল জোরদার, আবার প্যাটেলের জয় হলো, কিন্তু ট্যান্ডন সভাপতি নির্বাচিত হয়েও বেশি দিন কাজ করতে পারেননি। তিনি অচিরেই পদত্যাগ করলেন। এদিকে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যাটেল মারা গেলে নেহেরুর সঙ্গে মতান্তর হওয়ার মতো আর কোনো বড় নেতা ছিল না।

সে যুগেও মতান্তর ছিল, তিক্ততা ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার আসন থেকে কেউ কাউকে কখনো সরিয়ে দেননি। রাজনৈতিক সৌজন্যেতার বন্ধন অটুট ছিল।[১৭] নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, গান্ধি বিগ্রেড এসব নাম সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে রেখেছিলেন। ১৯৫০ সালে ২ অক্টোবর ইন্দোরে একটি অনুষ্ঠানে প্যাটেল বলেছিলেন মহত্মা গান্ধি নেই। আমাদের এখন নেতা জহরলাল নেহেরু। বাপু তাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছেন, বাপুর সব সৈনিকের তাই কর্তব্য তাকে মান্য করা আমিও সেরকম সৈনিক, আনুগত্যহীন হতে পারবো না।

গান্ধিজি দেশভাগ চাননি কিন্তু তিনি তার বিরোধিতা কতটা তীব্রভাবে করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে দেশভাগের কথা এলে রাডক্লিফ, মাউন্টব্যাটেন, ভি পি মেনন, প্যাটেল, নেহেরু, জিন্নার সঙ্গে গান্ধিজির নামও উচ্চারিত হয়।[১৮] ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তি, তবে তাঁকে নিয়ে যত বিতর্কই থাক না কেন তাঁর সত্যাগ্রহ, অহিংস আন্দোলন সমগ্র বিশ্বে আজও সমাদৃত। ভারতের কত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কে গান্ধি নামে অভিহিত করা হতো। দল বাহাদুর গিরি (পার্বত্য গান্ধি), শিউ মঙ্গল (শিলিগুড়ির গান্ধি), যগে হররায় (উত্তরবঙ্গের গান্ধি), আব্দুল গফফার খান (সীমান্ত গান্ধি), নগেন্দ্রনাথ রায় (তারবান্দার গান্ধি), পবিত্র দে (কালিয়াগঞ্জের গান্ধি), পুতুল চন্দ্র ঝা (মালদহের গান্ধি), জিতু সাঁওতাল (সেনাপতি গান্ধি), নলিনী পাকরাশি (ডুয়ার্স গান্ধি, তাঁরকাটা গান্ধি, (ভুটান গান্ধি)[১৯] ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় রাজনীতির অনেকটা অংশ গান্ধিজিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল। তবে একথা বলা যেতে পারে যে সহিংস ও অহিংস উভয় আন্দোলনকে তীক্ষ্ণভাবে মেলবন্ধন করে গান্ধিজি ব্রিটিশ বিরোধী রূপ দিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১.ঘোষ, সমিত, দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস, অমর ভারতী, কলকাতা ৯, ২০২২, পৃঃ ১৯৯

২.ঘোষ, সমিত, 'উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন', সরকার, শংকর, সূত্রধর, কালীকৃষ্ণ, সরকার, চন্দন (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, কুনাল বুকস, নিউ দিল্লী,২০২২ পৃঃ ১২

৩. Sutradhar, Kartik Chandra, Mondal, Bipul, Bhowmick, Ramendra Nath and Bhawal, Poulami (ed.),History of Dinajpur, Sopan,Kolkata, 2023 pp. 422-423

৪. গান্ধিজির আত্মকথা: An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth

৫. Desai,H, Mahadev, To Day With Gandhi, Sarva Seva Sangha Prakashan,Rajghat, Varanasi, January, 1972, p.319

৬. Ibid

৭. Ibid

৮. ঘোষ, সমিত, জলপাইগুড়িতে গান্ধিজি, চক্রবর্তী, শীতল (সম্পাদিত) গঙ্গাঁরামপুর সংবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ,পৃঃ ২৭

৯. ঐ, পৃঃ ২৭-২৮

১০. Sutradhar, Kartik Chandra, Mondal, Bipul, Bhowmick, Ramendra Nath and Bhawal, Poulami (ed.),History of Dinajpur, opcit, pp. 423-424

১১. ঘোষ, আনন্দ গোপাল, জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক জীবন (১৮৬৯ - ১৯৬৯), জনমত, জলপাইগুড়ি।

১২. Mahatma Gandhi Collected Works, The Publication Division, Ministry of Information and Broadcusting. Govt. of India, Patiala House : New Delhi, March, 1968

১৩. রবিবার, বর্তমান, কাঁটার মুকুট, ২৬/১০/২০২২

১৪. ঐ

১৫.রায়, দেবপ্রসাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধী, গান্ধি ১৫০, উত্তর প্রসঙ্গ, চাকি, দেবব্রত, (সম্পাদক) কোচবিহার,২০২০, পৃঃ ৪২-৪৫

১৬. রবিবার, বর্তমান, তদেব

১৭.গান্ধি ১৫০, উত্তর প্রসঙ্গ, চাকি, দেবব্রত, (সম্পাদক) কোচবিহার,২০২০, পৃঃ ৬২-৬৩

১৮.ঘোষ, আনন্দ গোপাল, স্বাধীনতার তিন কুড়ি ১৫ প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা পৈতৃক গ্রাম, সোপান, কলকাতা, ২০২২, পৃঃ ২২৭-২২৯

১৯.চাকি,দেবব্রত, (সম্পাদক),উত্তর-প্রসঙ্গ, তদেব,পৃঃ ২২৮-২২৯

পুস্তক পর্যালোচনা

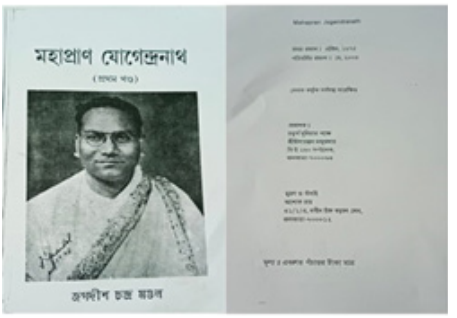

জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড)'
প্রকাশকঃ চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৩,
মূল্য - ১৭৫ টাকা

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল অবিভক্ত বাংলার তপশিলি জাতির জনগণের সার্বিক স্বার্থের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের কৃতী পুত্র জগদীশচন্দ্র মন্ডল এই গ্রন্থে তাঁর পিতার জীবনী ইতিহাস তুলে ধরার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন যা মূলধারার ইতিহাসবিদদের কাছে বরাবরই থেকেছে উপেক্ষিত হয়ে। এই গ্রন্থে অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতি রাজনীতি কেন্দ্রিক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট প্রাথমিক সূত্রের উপর নির্ভর করে আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে উঠে আসে সমসাময়িক সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর এক অনআলোচিত ইতিহাস। ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সমান্তরালভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিপথের অভিমুখ ও একই সাথে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়ার দিক স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে এই গ্রন্থে । বাংলায় আঞ্চলিক জাতি আন্দোলন থেকে বৃহত্তর তপশিলি আন্দোলনের উত্থান হয়েছিলো। যার ফলে বাংলায় এক কাস্ট কোশ্চেনের জন্ম হয়েছিল এই দিকগুলো এই গ্রন্থ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ডঃ বি.আর আম্বেদকরের সর্বভারতীয় তপশিলি রাজনীতির ধাঁচে বাংলা থেকে তপশিলি রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই তপশিলি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল । প্রকৃতপক্ষে, বাংলার অস্পৃশ্য সমাজের পথপ্রদর্শক এক কৃতি সন্তানের জীবনী লিখে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন লেখক জগদীশচন্দ্র মন্ডল। মানুষ আজ এই স্মরণীয় ইতিহাস প্রায় ভুলে গেছে।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বরিশালের এক সাধারণ গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। [পৃ-১] সামাজিক বৈষম্য এবং নিপীড়ন সত্ত্বেও, তিনি নিজেকে একজন আইনজীবী

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। [পৃ-২০] পরে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নির্বাচিত হয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান। তিনি একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সরল দত্তকে পরাজিত করে আইনসভার সদস্য হন।[পৃ-২৯] সুভাষ চন্দ্র বসুর সমর্থনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। [পৃ-৭২] মূলত তপশিলি জাতির জন্য চাকরি,শিক্ষা ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তপশিলি জাতির জন্য বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি শিক্ষা, চাকরি, নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ সব ক্ষেত্রে তপশিলি জাতির জন্য সংগ্রাম করেছেন। [পৃ-৯০] তিনি স্কুল নির্মাণ, কৃষি জমি বন্টন এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের সাথে জড়িত ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মূলত হক মন্ত্রিসভা তপশিলি জাতির বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সংরক্ষণ নীতি মেনে না চলায় তিনি হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন [পৃ-৫৫] তিনি তপশিলি জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য নাজিম উদ্দিনের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন, তিনজন তপশিলি জাতির নেতা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন। [পৃ-১০৩] তপশিলি জাতির মুক্তিদাতা ড. আম্বেদকর 'অল ইন্ডিয়া শিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠা করলে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল আম্বেদকরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন'-এর বঙ্গীয় শাখা স্থাপন করে বাংলার সমগ্র তফসিলি জাতিকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসেন। [পৃ-১৩৫] প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল তপশিলি জাতির কল্যান তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মূলত তপশিলি জাতির সামাজিক বঞ্চনার হ্রাস ও অধিকার আদায়ের জন্য। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য তপশিলি জাতিকে কাজে লাগাননি তিনি তপশিলি জাতির মঙ্গল বিধানের জন্যই ক্ষমতায় শীর্ষে উঠতে চেয়েছিলেন। তা না হলে নিম্নবর্নের মানুষের দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনা প্রতিবাদের প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক জগদীশচন্দ্র মণ্ডল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের শৈশব ও কৈশোর জীবন তুলে ধরেছেন। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ও বর্ণহিন্দু ছাত্রদের নির্যাতনের প্রতিবাদে। স্কুলে পাঠ্যকালীন সময়ে এক বর্ণ হিন্দু ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে বলে 'নমঃশূদ্রদের অবার স্পর্ধা দেখো! ও কিনা আমার পাসে এসে বসে প্রত্যুত্তরে যোগেন্দ্রনাথ বলেন স্কুল সবার জন্য, তোমার একার নয়। আমি যেখানে খুশি সেখানে বসব [পৃ-৫] কলেজে পড়ার সময়, তিনি অশ্বিনী কুমার দত্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'লিটল ব্রাদার অফ দ্য পুওর' নামে একটি সেবা সংস্থায় সক্রিয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[পৃ-১১] উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সামাজিক ঘৃণা হেতু তিনি তপশিলি ছাত্রদের নিয়ে কলেজে পৃথকভাবে সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় উচ্চবর্ণের দ্বারা দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনার প্রাচীর ভাঙ্গার প্রয়াস যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের মধ্যে ছাত্র জীবন থেকেই দেখা দিয়েছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৩০ সালে কলকাতায় এসে শ্রী পরিমোহন দাসের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আর্থিক সংকটের জন্য

তার পড়াশোনা সহজ ছিল না তাকে অর্থ উপার্জন করে পড়াশোনা করতে হতো। নানান সমস্যা অতিক্রম করে তিনি ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৬ জানুয়ারী ১৯৩৬ তারিখে তিনি ২৫ টাকা বেতনে কলকাতার ছোট আদালতে আইন অনুশীলন শুরু করেন। বিখ্যাত আইনজীবী হিসেবে বরিশাল জেলাসহ সারা বাংলায় তার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সালে তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার স্থানীয় সদস্য এবং বরিশাল জেলা বোর্ডের (১৯৩৭) সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসে যোগদান না করলেও বরিশালের উত্তর অঞ্চলের সাধারণ আসন থেকে জয়ী হন। একজন তপশিলি জাতির সন্তান যুবক বয়সে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অনুমোদন ছাড়াই শক্তিশালী কংগ্রেসকে পরাজিত করে, তা সত্যিই আমাদের অবাক করে। যোগেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় বেঘায় হালদার পাবলিক একাডেমি একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং তিনি অনেক প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরেজি, মধ্য ইংরেজি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার তপশিলি জাতির শিক্ষা বিষয় নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রথম থেকেই ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। [পৃ-৩৫]

পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে বাংলার তপশিলি জাতি রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কারে মণ্ডলের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার তপশিলি বিধায়কদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ 'Independent Schedule Caste Party' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন বিষয়ক এবং দলের মধ্যে সদস্যদের আসন বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো । যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন এই দলের সম্পাদক। [পৃ-৪৯] এই সময়ে শরৎচন্দ্র বসুর সহায়তায় যোগেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২শে আগস্ট, ১৯৩৮ এ হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশনে বলেন, 'এখন প্রশ্ন উঠেছে কেন তপশিলি জাতির প্রতিনিধিরা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করল।, যারা গত আঠারো মাস ধরে মন্ত্রণালয়কে সমর্থন করেছে, এখন মন্ত্রীদের পদক্ষেপে ব্যাপক হতাশ এবং তাই তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে।[পৃ-৫৩]

কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন ২৮ মার্চ ১৯৪০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসনের জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মনোনীত করেন। মণ্ডল কলকাতা কর্পোরেশনের ৭০জন নির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে ভোটের হারে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। সেই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় তপশিলি জাতির জন্য সরকারি চাকরিতেও ৫% আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তাঁর মন্ত্রিত্বের সময় কলকাতা কর্পোরেশনের চারটি আসন তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয় [পৃ.৭৪- ৯৯] ১৯৪১ সালের নভেম্বরে, ফজলুল হক সাহেবের প্রথম মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয় কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে তিনি শ্যামা হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত একটি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিল। এই সময়কালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তপশিলি জাতিদের বৈধ দাবিগুলির ঠিকমতো পূরণ হয়নি। সাম্প্রদায়িক

অনুপাত অনুসারে তপশিলি বর্ণের লোকদের চাকরি দেওয়া হয়নি, শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৫লক্ষ টাকা রেকারিং অনুদান দেওয়া হয়নি। তাই 'Independent Scheduled Caste Party' সেক্রেটারি যোগেন্দ্রনাথ এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। অবশেষে ২৮ মার্চ সোমবার রাত ১০টায় ফজলুল হক পদত্যাগপত্র জমা দিলে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়। [পৃ.৮৯- ৯৪]

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ও ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষ ত্রাণে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের অবদান এবং নাজিম উদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভা গঠন ও এই মন্ত্রিসভা থেকে তপশিলি জাতির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অর্জন ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য, কলকাতার 'সেভয়া হোটেল'-এ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তপশিলি জাতির বিধায়করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে তপশিলি জাতির স্বার্থ রক্ষা করবে তাকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মনোনীত করা হবে। এ সময় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে তপশিলি জাতি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একপ্রকার কিং মেকারের ভূমিকা পালন করেছিল।

নাজিম উদ্দিন সাহেবের কাছে তপশিলি স্বার্থ রক্ষায় যে দাবিগুলো করা হয়েছিল

i তপশিলি জাতি থেকে তিনজন মন্ত্রী ও তিনজন সংসদীয় সচিব নিয়োগ করতে হবে।

ii. তপশিলি জাতিদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার অনুদান মঞ্জুর করা উচিত।

iii. সাম্প্রদায়িক অনুপাত অনুসারে সমস্ত পদে তপশিলি জাতির প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে হবে।

স্যার খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন এবং হোসেন সুরাবর্দী নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর তপশিলি জাতির বিধায়কদের দাবি মেনে নেন। অবশেষে, ১৯ এপ্রিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, ২১ জন তপশিলি জাতির বিধায়ক একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শনিবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খাজা নাজিম উদ্দিন মন্ত্রিসভায় তিনজন তপশিলি জাতি থেকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন

i.মাননীয় শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড রুরাল ডিবেট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন।

ii.মাননীয় পুলিন বিহারী মল্লিক প্রচার বিভাগের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন।

iii. বন ও আবগারি বিভাগের মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন মাননীয় শ্রী প্রেমহারি বর্মন। [পৃ-১০৬]

যোগেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বের সময়, তপশিলি বর্ণের লোকেরা সাম্প্রদায়িক আনুপাতিক হারে চাকরি পেয়েছিল। তপশিলি জাতি থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, অডিটর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল স্কুলে তপশিলি জাতির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা

হয়েছিল । তপশিলি জাতির শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বাংলা সরকার খান বাহাদুর আবদুর রহমান খানকে সদস্য করে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। আরো বলা হয় একজন বিশেষ আধিকারিক তপশিলি জাতির শিক্ষা কমিটির সচিব হবেন। মন্ত্রিসভায় যোগেন্দ্রনাথের ক্রমাগত সতর্কতা এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের ফলে, তাঁর মন্ত্রিত্বকালে তপশিলি জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়েছিল। (পৃ.১০৭-১৩৪)

শেষ অধ্যায়ে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল কিভাবে'অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন'-এর বেঙ্গল শাখা স্থাপন করে বাংলার সমগ্র তপশিলি জাতিকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসেন সে দিকটা তুলে তুলে ধরা হয়েছে। বেঙ্গল সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সাথে জড়িত একাধিক আঞ্চলিক সংগঠনের মেলবন্ধনের ফলে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের 'বেঙ্গল শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' বাংলায় তার নিজস্ব একটি পৃথক রাজনৈতিক ঘরানার জন্ম দিতে পেরেছিল। ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহের মতো জেলায় 'বেঙ্গল সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের' সক্রিয় জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পর্যায়ে বেঙ্গল শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের পৃথক পত্রিকা ছিল 'জাগরণ'। এই পত্রিকায় তপশিলি জাতির দাবি-দাওয়া ও কোন পথে তাদের সর্বাধিক উন্নয়ন সম্ভব সে বিষয়ে বিশদ তথ্য প্রচারিত হতো। তপশিলি জাতি ফেডারেশনের উদ্দেশ্যমূলক আদর্শের বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্ডল বলেন- এর মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের জাতীয় জীবনে একটি পৃথক সত্তা প্রতিষ্ঠা করা ও তপশিলি জাতির সার্বিক উন্নয়ন। (পৃ.১৪০- ১৮৪)

লেখক জগদীশচন্দ্র মন্ডল সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, আর্কাইভাল সোর্স ও তার পিতার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও অটোবায়োগ্রাফি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের উপর লেখা এই গ্রন্থটি মূলত একটি প্রাথমিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের জীবনী মূলক ইতিহাস রচনা করা হলেও সমকালীন সময়ের তপশিলি জাতির এক বিস্তৃত অজানা ইতিহাস উঠে এসেছে। অনেক সমালোচক লেখক জগদীশচন্দ্র মন্ডলের এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন তিনি কোনো মতামত বিশ্লেষণ ছাড়াই সমসাময়িক সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে এই বইটি লিখেছেন তাই এই গ্রন্থকে জীবনমূলক ইতিহাস না বলে একটি সংকলন বলে অভিহিত করা যায় । তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, জগদীশচন্দ্র মন্ডল কোন পেশাদার ঐতিহাসিক নন। একজন সত্যসন্ধানী অনুসন্ধিৎসু স্বাধীন গবেষক। বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের প্রবক্তা লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কের মতে 'History seeks' ''Merely to Show how it Actually was''তথ্য বিশ্লেষণের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ । ইতিহাসের যথাযোগ্য মান ক্রমপর্যায় সঠিকভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলেও বইটি সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ।

পর্যালোচক: ইন্দ্রজিৎ মন্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া